পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ

তারাপদ সাঁতরা

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক

সচিব

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

মধুসূদন মঞ্চ ␣ ঢাকুরিয়া

কলকাতা-৭০০ ০৬৮

মুদ্রক

সরকার এন্টারপ্রাইজ

৫০৭/৪, যশোহর রোড

কলকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রস্তাবনা

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগেও ব্যাপক নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকে নাগরিক সভ্যতা যেভাবে গ্রামীণ শিল্প ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করে চলেছে তার নজির আগে পাওয়া যায়নি। এই ধ্বংস-প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ছিল উপেক্ষা ও অবমাননা। বাংলার গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীসমাজ একদিকে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় বিপর্যস্ত হয়েছেন, অন্যদিকে নাগরিক পরিমণ্ডলের প্রাজ্ঞজনের সীমাহীন উপেক্ষা সহ্য করেছেন। কিন্তু এই শতকের তিরিশের দশক থেকেই জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রামীণ শিল্পের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়,—যদিও বড়ই সীমিত ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। অসংখ্য সমবায় সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, কুটির শিল্পের উদ্‌যোগী সংগঠন সকলেই গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। উপেক্ষার আঁধার থেকে মুক্তি পেয়ে শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন গ্রামীণ লোকশিল্পীর দল। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শিল্পের উৎকর্ষ বিষয়ে শিল্পীদের অনন্য কাজের স্বীকৃতি মিললেও অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থান থেকে তাঁরা মুক্তি পাননি। বীভৎস দারিদ্র আজও শিল্পীদের নিত্যসঙ্গী। এর একটি বড় কারণ, শিল্পীরা তাঁদের শিল্পবস্তু সরাসরি বাজারজাত করতে এখনও সক্ষম হননি,—মাঝখানে রয়ে গিয়েছে ফড়ে জাতীয় এক ধরনের সুচতুর লোভী ব্যবসায়ীর দল। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ফড়েদের আধিপত্য গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। গ্রামীণ লোকশিল্পীদের মর্যাদা-দানের পাশাপাশি শিল্পবস্তু সরাসরি বাজারজাত করার পদ্ধতি নির্ণয় করা জরুরি।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের নিদর্শনগুলির শিল্পসুষমা আমাদের বিস্মিত করে। কত স্বল্প ও তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে কী অসাধারণ শিল্পবস্তুই না তাঁরা গড়ে তুলছেন। এমন কি বিমূর্ত ভাবকল্পনার উজ্জ্বলতম প্রকাশও এইসব শিল্পবস্তুর মধ্যে ধরা পড়েছে। ডোকরা, মাটির

ঘোড়া-হাতি, কাঠের পেঁচা, মাটির লৌকিক দেবদেবী প্রভৃতির মধ্যে বিমূর্ত শিল্পের চরম উৎকর্ষ রয়েছে। আর কত রকম মাধ্যম ও কত সুন্দর শিল্পকলা! দেওয়াল চিত্র, পটচিত্র, চালচিত্র, মাটি-কাঠ-সোলার পুতুল, দশাবতার তাস, পুথির পাটা, আলপনা, লক্ষ্মীসরা, শীতলপাটি, নকশি কাঁথা, মুখোশ—অন্তহীন শিল্পকর্ম। আবার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে এসবের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ সামাজিক তাৎপর্যের এক গভীর ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি।

গ্রামীণ লোকশিল্পের বিশাল ভাণ্ডারের সামগ্রিক পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত রয়েছে এই গ্রন্থে। সমস্ত শিল্পবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এ কাজ পুরোটাই করা হয়েছে নিছক ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে। তত্ত্বগত আলোচনা নয়, তথ্যের ভিত্তিতেই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল শ্রীতারাপদ সাঁতরার এই গ্রন্থ। তাঁর এই দীর্ঘ পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের জীবন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিষয়ে এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠককে সমৃদ্ধ এবং শিল্পীসমাজকে উদ্দীপিত করবে।

প্রদীপ ঘোষ

সচিব

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষে আহূত 'অরুণ কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা' (১৯৯৯) হিসাবে আমার প্রদত্ত 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ' প্রসঙ্গে আলোচনাটি বর্তমানে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পুস্তক আকারে প্রকাশিত হ'ল। বলাবাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প বিষয়ক যাবতীয় বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়নি—এক্ষেত্রে এটি একটি প্রাথমিক পরিচয় মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য একদা কবি-শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে লোকান্তরিত এই বন্ধুবরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। চিত্রকলা রসিক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য যেভাবে উৎসাহিত করেন—তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থটি; সেজন্য তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া, গৌতম সেনগুপ্ত এবং দীপকরঞ্জন দাস বহুবিধ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে একান্তই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

গ্রন্থটি রচনায় আমাকে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, দেবাশিস বসু, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, শিবেন্দু মান্না, দীপঙ্কর ঘোষ, শ্যামল বেরা প্রমুখের নাম।

গ্রন্থে পরিবেশিত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে স্বর্গত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহীত বেশ কয়েকটি আলোকচিত্র তাঁর কন্যা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এছাড়া শ্যামল বেরা, রঘুনাথ গোস্বামী এসোসিয়েটস্-এর দিলীপ ভৌমিক, অশোককুমার কুণ্ডু প্রমুখ অন্যান্য আলোকচিত্র সরবরাহ করায় তাদের কাছেও আমি গভীরভাবে ঋণী।

এ গ্রন্থে মুদ্রিত পাঁচমুড়োর শিল্পদ্রব্যগুলির স্কেচ-এর শিল্পী তারক পাত্র এবং অন্যান্য স্কেচগুলি অঙ্কনের জন্য শিল্পী গোপী দে সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে এ গ্রন্থটি সুচারুরূপে প্রকাশের জন্য কেন্দ্রের সচিব প্রদীপ ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

তারাপদ সাঁতরা

বাংলার খ্যাত অখ্যাত লোকশিল্পীদের উদ্দেশে

সূচিপত্র

লোকশিল্পের নানাবিধ উপকরণ হ'ল, বাংলার লোকায়ত জীবনের বর্ণময় এক দর্পণ। এই লোকশিল্পের মধ্যেই আমরা গ্রাম্য-সমাজের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে শুধু রূপ ও রীতির সন্ধানই পাই না, তার মধ্যে সামাজিক তাৎপর্যের এক গভীর ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ দেখি। বাংলার লোকশিল্পের উপকরণের ক্ষেত্রে যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তা হল, সুলভতম দ্রব্যের ব্যবহার — সেখানে শিল্পের উপকরণ হয়েছে মাটি, ছেঁড়া পুরানো কাপড় আর কাপড়ের সুতো। সেইসঙ্গে দেশীয় প্রথায় উৎপন্ন সস্তা রঙ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল মৃৎভিত্তিক আপামর জনগণের সংস্কৃতি এবং সে সংস্কৃতির জগৎটি ছিল সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, আনন্দবর্ধন ও সুবিন্যস্ত জীবনধারাকে কেন্দ্র করেই।

এই শিল্পধারার যারা ছিলেন স্রষ্টা-কারিগর, নিজেদের মেহনত দিয়ে, বুভুক্ষার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে, পুরুষানুক্রমে প্রথাগত শিল্পের গতিকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস চালিয়েছেন — যার অবিরাম অনুবৃত্তি আজও আমরা প্রত্যক্ষ করি গ্রাম-বাংলার নানান প্রান্তরে পল্লীর কৃষিকুটিরে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের কৃতিত্ব ও শিল্প সৌন্দর্যের দিকে এক সময়ে অভিমানী চারুকলা সংস্কৃতির পণ্ডিতবর্গের তেমন দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি। কিন্তু বাংলার এই লোকশিল্প জগৎটির দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়গণ। তাঁদের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই নগণ্য ও অবহেলিত মাধ্যমটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মূল্যায়নের ফলে, বাংলার লোকশিল্প তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন যা ছিল ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রচেষ্টা, পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আশুতোষ মিউজিয়ামই সর্বপ্রথম সমাদরে সংগৃহীত লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শনকে সর্বসাধারণের দর্শনযোগ্য করে তোলে। তাই আজ লোকশিল্প হয়ে ওঠে দেশজ কৃষ্টির অন্যতম এক বাহক।

একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ দেশ মানুষের সৃষ্টি, দেশ মৃন্ময় নয় চিন্ময়, মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।

তাই একথা যথার্থ যে, দেশ প্রকাশিত হয় মানুষের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে। সে কারণে চিন্ময় বঙ্গের পল্লীজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা মানুষের এই প্রকাশমান সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। দীর্ঘদিনের জীবন সাধনার মধ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ পরিবেশন করেছে অনেক নূতনত্ব, অনেক সৌন্দর্য ও ভাবকল্পনা। এবং সে ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে গ্রামগ্রামান্তরের গ্রামীণ শিল্পকলায়, সাহিত্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের অপরূপ সৃষ্টির বৈচিত্র্যে। আর এ বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটেছে, খড়ের ঘরের বাস্তুশিল্পে, পোড়া মাটির পুতুলে, পট ও দেওয়াল চিত্রে, গৃহশিল্প সামগ্রীতে, লৌকিক পাল পার্বণে, মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানে, ব্রত-আলপনায় আর নাচে গানে। তবে বঙ্গসংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণের বর্ণনা এতই বিশাল যে স্বল্প পরিসরে তার সামগ্রিক বর্ণনা সম্ভব না হলেও, এ গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পের প্রাথমিক পরিচয়টি কেবলমাত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাস্তুশিল্প

ক. মাটির ঘর

বাংলার লৌকিক শিল্পচেতনার প্রকাশ ঘটেছে একদিকে তার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এবং অন্যদিকে উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেদিক থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের এক নিদর্শন হল, খড়ো মাটির ঘরের বাস্তুশিল্প। পল্লীবাংলার যে গৃহকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল
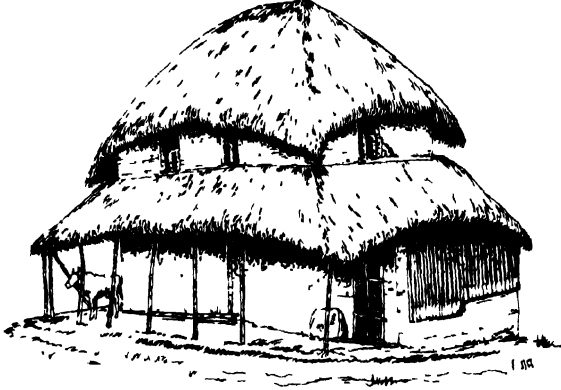
চারচালা কুটির স্থাপত্য ঃ মেদিনীপুর

বাঙালির জীবনযাত্রা, সে গৃহের আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে তার রূপবৈভব কম ছিল না। খড়ে ছাওয়া বাঁকানো চালের এই রূপটি কখনো হয়েছে দোচালা বা আটচালা আবার কোথাও বা বারোচালা। আবার এই খড়ো চালাঘরের মটকার দু'প্রান্তে খড়কে নিপুণভাবে বেঁধে দুটি ময়ূরের রূপ দেওয়া হয়। খড়ের বদলে টিনের ঘরের ছাউনির উপরও এই প্রথাগত অলংকরণ করা হয় টিনকে খোদাই করে। অন্যদিকে বসতবাড়ি ছাড়াও, দোচালা বা চারচালা রীতির চণ্ডীমণ্ডপ এবং চারচালা বা আটচালা রীতির নাটমণ্ডপ নির্মাণে বাঙালি বাস্তুশিল্পীরা অসামান্য কুশলতার নিদর্শন রেখে গেছেন। একদা গৌড় বাংলার স্বাধীন সুলতানরা এই খড়ো ঘরের রূপসৌষ্ঠবে মোহিত হয়েছিলেন, তাই প্রথাগত ইসলামি স্থাপত্য ধারা গ্রহণ না করে তারা তাদের ধর্মীয় স্থাপত্যে এই খড়ো কুটিরের আদল এনেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত এই কুঁড়ে ঘরের অনুকরণেই এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল বাংলার নানা রীতির মন্দির। এছাড়া এই

গৃহশৈলী বিদেশি ইংরেজ শাসকদেরও একদা আকৃষ্ট করেছিল। সেজন্য তাদের বিশ্রামগৃহ নির্মাণকালে বাংলার এই কুটির শৈলীর অনুকরণ করার জন্য তাদের বিশ্রামের জন্য নির্মিত বাড়িগুলিরও নামকরণ করা হয় 'বাংলো' বা 'ডাক-বাংলো'।

শুধু গৃহ নির্মাণই নয়, বাঙালি শিল্পীরা সেই গৃহটি সুষমামণ্ডিত করার জন্য দেওয়ালের গায়ে উলুটি, তুষুটি, পাটুটি প্রভৃতি পর্যায়ের পলস্তারা দিয়ে গোটা দেওয়াল মসৃণ করে তার উপর 'বা-রিলিফ' পর্যায়ে বেশ কিছু মাটির অলংকরণ করে দিতেন। সে অলংকরণ-সজ্জার মধ্যে থাকতো ফুল-লতাপাতা ও পশু-পাখির নকশা ইত্যাদি। কোথাও বা সেসব নকশাগুলিকে সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্য এই 'বা-রিলিফ'-এর কাজের উপর রঙের প্রয়োগও ঘটতো। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট-২' দ্রষ্টব্য।)

খ. ধানের গোলা

শুধু গৃহগত বৈচিত্র্যই নয়, গ্রাম বাংলায় একদা শস্যসংরক্ষণ বিষয়ে নির্মিত নানান ধরনের গোলা-মরাই-কড়ুইয়ের স্থাপত্য একান্তই মনোমুগ্ধকর। গোলাকার খড়ো চালসহ বাঁশ-বাখারি দিয়ে গোল অবয়ব বা লাট্টুর আকার সদৃশ অথবা ডমুরুর অনুরূপ আকারে নির্মিত হয় এইসব গোলা বা কড়ুই, যার ভিতর দিকটিতে মাটি লেপন করে দেওয়া হয়।

ধানের গোলা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর

যদিও বাইরের দিকে এইসব গোলার গায়ে তেমন মাটি লেপা হয় না, তবুও বহুক্ষেত্রে বাহিরেও মাটির পলস্তারা দেওয়া হয়। কখনও এইসব বাইরে মাটি লেপা গোলার গায়ে অলংকরণ করা হয় পিটুলি গোলার ফুল-লতাপাতার আলপনা দিয়ে, আবার কখনও বা রঙ দিয়ে নানান নকশা, সব মিলিয়ে বাংলার লোকশিল্পের এটিও এক অনন্য নিদর্শন। শস্যভাণ্ডার ও ধানের গোলা সম্পর্কিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট- ৩' দ্রষ্টব্য)

লোক-চিত্রকলা

ক. দেওয়াল-চিত্র

মাটির দেওয়ালে বা-রিলিফে তৈরি নানাবিধ অলংকরণ ছাড়া, মাটির ঘরের দেওয়ালেও চিত্র শোভিত করার এক প্রচলিত প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামাঞ্চলে অনুসৃত হয়ে আসছে। নিছক গ্রাম্য চিত্রকলা হিসেবে প্রধানত পল্লীবাসীরাই এই লোকশিল্পটির স্রষ্টা ও পরিবেশক। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার বহু স্থানে মাটির ঘরের দেওয়ালে এই লোকচিত্রের প্রকাশ। এসব চিত্রগুলি দেখে মনে হয়, আর পাঁচটা লোকচিত্রের মতই পল্লীরমণীরা তাদের হাতের আঙুলের দক্ষতায় এই দেওয়াল চিত্রণের পদ্ধতিকে প্রায় আদিযুগের সরলতা ও সততার সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। উপরি-উক্ত জেলাগুলিতে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের বিশেষ করে সাঁওতাল গোষ্ঠীর বসতবাড়িতে এই দেওয়াল চিত্র পরিলক্ষিত হলেও, আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য সরাক, মাহাতো, ভূমিজ, কামার, কুমোর, লোহার, ডোম ও বাউরি থেকে নিম্নবর্ণের সব জাতিগোষ্ঠীর রমণীরাই এই দেওয়াল চিত্রণের কাজ করে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তপশিলী বা বর্ণহিন্দু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত এই দেওয়াল চিত্রণের কাজ শুরু করা হয় প্রতি বছর দুর্গাপূজার অথবা কোথাও বা কালীপূজার প্রাক্কালে। দেওয়াল চিত্রণে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় সেগুলি সংগৃহীত হয় স্থানীয়ভাবেই। অর্থাৎ গিরিমাটি, সাদা খড়িমাটি, হলদে বনক, ভুষোকালি এবং দোকান থেকে কেনা নীল ও লাল রঙ এই চিত্রণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গেরুয়া ও নীল রঙের সমন্বয়ে পছন্দমত সবুজ রঙও তৈরি করে নেওয়া হয়।

দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে রঙ লাগাবার জন্য ব্যবহৃত হয় পাট দিয়ে তৈরি তুলি এবং হাতের আঙুলের ডগায় জড়ানো ন্যাকড়া। সাদা খড়িমাটি দিয়ে দেওয়ালে প্রথম 'অস্তর' দিয়ে তার উপর পরিকল্পনামত নকশা চিত্রণ করা হয় বিভিন্ন রঙের প্রয়োগে। সে সব চিত্রের বিষয়বস্তু মূলত লতাপাতা, ফুল, গাছ ও পাখি। ফুলের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের চিত্রটিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এছাড়া নানান জ্যামিতিক নকশাও এই দেওয়াল চিত্রের আর এক বড় আকর্ষণ।

মাটির ঘরের দেওয়ালগাত্রে চিত্র-বিচিত্র অলংকরণে আদিবাসী সমাজের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কালীপূজার সময় বাঁধনা পরব

উপলক্ষ করেই এই সম্প্রদায় নতুন করে দেওয়াল চিত্রণের কাজ করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে বহু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাস। পাহাড়-অরণ্যের নিভৃত এলাকা ছেড়ে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন ঘটলেও, অতীতকাল থেকে অনুশীলিত দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে তাদের শিল্পসাধনায় কোন ছেদ পড়েনি। এ বিষয়ে সাঁওতাল রমণীদের আঁকা দেওয়াল চিত্রে দেখা যায়, রঙের প্রয়োগে সামান্য ভিন্নতা থাকলেও চিত্রের বিষয়বস্তু বহু ক্ষেত্রেই হয় জ্যামিতিকধর্মী অর্থাৎ ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, সমান্তরিক, ট্রাপিজিয়ামের ব্যবহার। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ফুল-লতাপাতা শোভিত বৃক্ষ এবং রঙীন ফুল বা প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের অবয়ব।
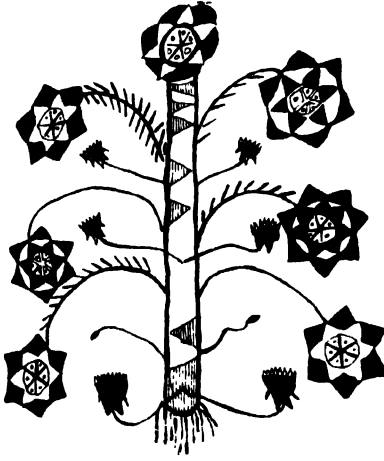
লোহার জাতিগোষ্ঠীর রমণীদের আঁকা দেওয়াল চিত্র, হুমগড়, মেদিনীপুর

সাঁওতাল সমাজে লোকচিত্রের এই অনাড়ম্বর অলংকরণগুলিতে প্রধানত চার রকমের রঙ ব্যবহৃত হয়। যথা সাদা, কালো, গেরুয়া ও নীল। সাদা রঙ পাওয়া যায় কলিচুন থেকে। খড়কুটো পুড়িয়ে সেই ছাই জলে গুলে ফিকে কালো রঙ পাওয়া যায়। গেরুয়া রঙটি সংগ্রহ করা হয় গিরিমাটি থেকে, যা জলের সঙ্গে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিতে হয়। সবশেষে নীল রঙটি কিনে আনা হয় দোকান থেকে।

এবার দেওয়ালে রঙ ধরাবার পালা। প্রথমে পরিকল্পনামত দেওয়ালে সাদা রঙের প্রলেপ লাগানো হয়। এবার তার উপর আঙুলের ডগা দিয়ে অভিলষিত নকশাটি প্রাথমিকভাবে সম্পাদনের পর সেই বরাবর ন্যাকড়া বা আঙ্গুলের সাহায্যে প্রার্থিত রঙগুলি লাগানো হয়।

অন্যদিকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে সম্পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে রঙ চিত্রণযুক্ত কোন অলংকরণ নেই, অথচ সে কুটিরের ভিত্তিবেদী অবধি গাঢ় ছাই রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। আবার শুধু ভিত্তিবেদীই নয়, বাইরের গোটা দেওয়াল জুড়েই এই ছাই-গোলা গাঢ় কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে এই কুঁড়েঘরগুলি যে সাঁওতাল গোষ্ঠীর তা দেওয়াল চিত্রের এই ধরন দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

সাঁওতাল পল্লীতে আর এক বিশেষ ধরনের দেওয়াল চিত্র দেখা যায়, যেখানে রঙের কোন বালাই নেই। সেখানে দেওয়ালের উপর নেতার সাহায্যে কাদা গোলা জলের ঘন করে লেপন দেওয়া হয়। এবার সেই ভিজে দেওয়ালের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে অভীষ্ট নকশাটি করে নেওয়া হয়। পরে দেওয়াল শুকিয়ে গেলে নকশাটি আঙুলের দাগ বরাবর ফুটে ওঠে যা রঙবিহীন নয়নাভিরাম এক অপূর্ব অলংকরণ চিত্রে পরিণত হয়।

অঙ্কন বিদ্যায় হয়ত এসব দেওয়াল চিত্রশিল্পীরা তেমন পারদর্শী নয়, তবে চিত্রের মধ্যে তাদের জীবন দর্শনের সরলতাটিকে তারা যেভাবে রূপায়িত করেছেন, তা লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

দুঃখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে দেওয়াল চিত্রগুলির গ্রাম্য বলিষ্ঠতা ও সারল্য যেভাবে বাংলার লোকচিত্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছে, তার কোন উল্লেখযোগ্য সন্ধান ও সংগ্রহ হয়নি। অথচ অনুরূপ দেওয়ালে অঙ্কিত বিহারের মধুবনী চিত্রকলা নিয়ে অনেক সচিত্র প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে এবং সেসব দেওয়াল চিত্রগুলির উপর নকশা ও অলংকরণ কাগজের উপর রূপান্তরিত করে মধুবনী চিত্রকলার রূপশৈলীটিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যে, কুটির দেওয়াল না হলেও মন্দির দেওয়ালে অঙ্কিত দুটি ফ্রেসকোজাতীয় রঙীন দেওয়াল চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি হল, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার বহড়ু গ্রামেব শ্যামসুন্দর মন্দির দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র এবং অন্যটি হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির দেওয়ালে উৎকীর্ণ ফুললতাপাতা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্রমালা। তবে চিত্রগুলি লৌকিক ধারার অনুসারী কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেদিক থেকে বলা যায় এগুলি লৌকিক উপাদানের প্রভাবযুক্ত প্রথাগত শিল্পধারা—যা বাংলার চিত্রশিল্পের এক বৈশিষ্ট্য।

খ. পটচিত্র

জড়ানো পট

আলোচ্য লোকচিত্রের বেশ কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি জড়ানো পটে। এই চিত্রকর-পটুয়া সম্প্রদায়ের জাতিগত চরিত্রটি বড় বিচিত্র। এঁরা জাতিতে না হিন্দু, না মুসলমান। নাম রাখা হয় হিন্দুদের মত নামেই কিন্তু সেইসঙ্গে একটি মুসলমানি নামও থেকে যায়। অবশ্য পদবী হিসাবে সবাই চিত্রকর কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। একদা চিত্রকর সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে শুদ্ধি করে একেবারে পুরোপুরি হিন্দু হয়েছেন আবার কেউ শুদ্ধির পরে সেই পুরাতন অবস্থায় ফিরে গেছেন। আর যারা শুদ্ধি করেননি তারা সেইভাবেই থেকে গেছেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট-৪' ও 'পরিশিষ্ট-৫' অধ্যায়।)

জড়ানো পটচিত্র : বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে এই পটুয়া-চিত্রকর গোষ্ঠীর বসবাস। তবে মেদিনীপুর ও বীরভূম ছাড়া অন্যান্য জেলার পটুয়া গোষ্ঠীদের অনেকেই পট আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। বদলে ছেলে ভোলানো পুতুল ও বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণ করা ছাড়াও অনেকে কায়িক পরিশ্রমজনিত কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন।

পটুয়া-চিত্রকর সম্প্রদায় সাধারণত তিন ধরনের পট তৈরি করে থাকেন। এর মধ্যে একটি হল, দেবমাহাত্ম্য বা সামাজিক নানান কাহিনী নিয়ে তৈরি লম্বাটেভাবে জড়ানো পট; দ্বিতীয়টি হল, আড়াআড়িভাবে তৈরি জড়ানো পট এবং সবশেষেরটি হল চৌকো পট যা যাদুপট বা চক্ষুদান পট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জড়ানো পট সাধারণত চওড়ায় হয় এক থেকে দেড় হাত এবং লম্বায় হয় প্রায় চার হাত থেকে দশ-বারো হাত। এক্ষেত্রে পটের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবার জন্য পট দেখানোর সুবিধার্থে পটের দু'প্রান্ত আড়াআড়িভাবে কোন কঞ্চির সঙ্গে জোড়ার সময় খানিকটা অংশে কাপড় যুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে কাঠি নাড়াচাড়া করার সময় কাগজের পটের অংশ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। উল্লেখ্য যে, আড়াআড়ি পটের বেলাতেও ঐ একই পদ্ধতিতে দু'দিকে কঞ্চির কাঠি জুড়ে দেওয়ার নিয়ম।

প্রবীণ পটুয়ারা বলেন, প্রথমদিকে পট আঁকা হ'ত তালপাতায়, তারপর কাপড়ের উপর পট আঁকা শুরু হয়, যাকে সে সময় বলা হ'ত 'কাঁথাপট'। শেষে হাতে তৈরি তুলট কাগজের ওপর এবং পরবর্তী হালফিল কাগজের ওপর আঁকার রেওয়াজ শুরু হয়।

আকৃতি অনুযায়ী কাগজ পরপর জুড়ে পটের ক্ষেত্র প্রস্তত করে তার উপর কাঙ্ক্ষিত পটচিত্র অঙ্কন করা হয়। এবার পটের কাহিনী চিত্রটি একটার নিচে আর একটা অংশে ফুললতা-পাতার বর্ডার দিয়ে ভাগ করা থাকে। পটুয়ারা যখন পট দেখান তখন এক হাতে ধরে থাকা কাঠি গান সহযোগে বর্ণনার সঙ্গে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে নিতে থাকেন এবং সেইসঙ্গে অপর হাতে কাঠিতে ধরা পটের জড়ানো অংশ ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকে। সঙ্গীতের মাধ্যমে পটের এই কাহিনী ধীরে ধীরে এক একটা খোপ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়।

পট যেহেতু লোকচিত্রকলা, তাই তার আঁকার সরঞ্জাম এবং রঙ তৈরি করা হয় দেশজ পদ্ধতিতে। পট আঁকার জন্যে মোটা বা সরু ধরনের তুলি করা হয় বাচ্চা ছাগলের ঘাড়ের বা পেটের লোম এবং বিশেষ করে সরু তুলির জন্য কাঠবেড়ালীর লোম বা বেজির লেজের চুল ব্যবহার করা হয়। তুলি রেখে দেওয়া হয় বাঁশের খাঁচিতে অর্থাৎ গোল বাঁশের একটা পাবে। পট আঁকার রঙ গোলা হয় মাটির টাটি বা খুরিতে অথবা নারকোল মালায়। অন্যদিকে রঙের উপকরণও দেশজ; অর্থাৎ হলদে রঙ সংগৃহীত হয় হলুদ বা এলামাটি থেকে। সবুজ রঙ পাওয়া যায় সিমপাতা বা হিঞ্চে শাকের রস থেকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে এজন্য বেলপাতা শুকনো করে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। বেগুনি রঙ তৈরি করা হয় জাম বা পুঁই মেচুড়ির রস থেকে। সাদা রঙের জন্য যেমন খড়িমাটি, তেমনি খয়েরি রঙ করা হয় চুন বা এলামাটির সঙ্গে সামান্য খয়েরের টুকরো মিশিয়ে। লালচে রঙ তৈরি করা হয় উনানের গায়ে পোড়ামাটির

অংশ দিয়ে বা লাল গিরিমাটি দিয়ে। কালো রঙের জন্য হাঁড়ির গা চেঁছে বের করা ভুষো কালি অথবা গাব গাছের শিকড় পুড়িয়ে পাওয়া কালো রঙ। কখনও লাল রঙের জন্য দোকান থেকে কেনা হয় আলতা বা মেটে সিঁদুর এবং নীল রঙের জন্য নীল বড়ি বা তুঁতে। রঙ গোলা হয় নারকোল মালা বা খুরিতে । এবার রঙ ভালভাবে ধরাবার বা উজ্জ্বলতা আনার জন্য রঙের সঙ্গে মেশানো হয় বেলের বা নিমগাছের আঠা এবং অনেক সময় তেঁতুল বিচি সেদ্ধ করে তার কাই বা ডিমের কুসুম। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই চিত্রকর-পটুয়ারা বাজার থেকে কেনা রাসায়নিক রঙই বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

পট আঁকার কাগজটি জোড়া দিয়ে লম্বা আকৃতি করার পর পটুয়া শিল্পী লাল রঙের বলিষ্ঠ রেখার টান দিয়ে পরিকল্পিত বিষয়ের একটা খসড়া এঁকে নেন । তারপর চিত্রানুপাতের দৃশ্যগুলিকে নানান রঙ দিয়ে ভরাট করা হয়। আসলে চিত্রের মধ্যে বিন্যস্ত আকৃতি ও তার অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য পটুয়া শিল্পী যথাযথ সংযোজন করেন বিভিন্ন রঙ ও রেখা দিয়ে। ফলে প্রস্তুত পটচিত্রটি উজ্জ্বল লাল, হলদে, সাদা, নীল ও সবুজ রঙ প্রয়োগে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠে।

উল্লেখ্য যে, লোকচিত্রের ধর্ম অনুযায়ী গতির দৃশ্যে অবশ্য হাত-পা অনেক সময় মাত্রাছাড়া এলোমেলো করে দেখানো হয়। তাই এদের অঙ্কিত চিত্রগুলি গতিশীল হয়ে উঠতে পারেনি বা বহু বৈচিত্র্যে তেমন সমৃদ্ধ নয়। বলা যেতে পাবে, এদের চিত্র একেবারেই সহজ সরল ও বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু তা হলেও অনাড়ম্বর রঙ ও রেখায় বংশানুক্রমিকভাবে অনুসৃত এই চিত্রশিল্প বরাবরই উন্নত ও মার্জিত রসবোধের পরিচয় প্রদান করেছে।

জড়ানো পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে রামায়ণ-মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, মনসা-চণ্ডী-মঙ্গল আখ্যান নিয়ে চিত্রিত নানাবিধ পট। রামায়ণ পটের মধ্যে তাড়কাবধ, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, তরণীসেন বধ প্রভৃতি। এছাড়া নরমেধ যজ্ঞ, হরিশচন্দ্র, দাতাকর্ণ ও সাবিত্রী-সত্যবান, শিবপার্বতী, গঙ্গা-দুর্গার বিবাদ, দুর্গার শাঁখা পরা, চৈতন্য বা গৌরাঙ্গ লীলা বা নিমাই সন্ন্যাস, জগন্নাথ লীলা, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রভৃতি পটও আঁকা হয়েছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের নিয়ে রচিত 'গোঁসাইপট' এবং অন্যদিকে মুসলিম পির-ফকিরদের নিয়ে রচিত গাজির পট, মসনদ-ই-আলা পট ও সত্যপির পটও উল্লেখযোগ্য। পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে আর একটি দর্শনীয় পট হল যমপট, যেখানে পাপীদের যম-যন্ত্রণা ও পুণ্যাত্মাদের আরামপ্রদ জীবনের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সাবেকি পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত এইসব পট ছাড়া রূপকথাশ্রয়ী আর একটি পট হল মনোহর ফাঁসুড়ের বা মনোহর ফাঁসিরার পট, যা একসময় মেদিনীপুর জেলায় ছিল বহুল প্রচলিত। (এ পটের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'পরিশিষ্ট-৬' অধ্যায়ে।) এবাদেও ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ে বেশ কিছু পটও রচিত হয়েছে। ইতিহাসাশ্রয়ী পটের মধ্যে উল্লেখ্য হল সাহেব পট, যা সে সময়ের চুয়াড় বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল এবং সে পটের মধ্যে দর্শিত হয়েছিল কিভাবে শাসক ইংরেজরা নৃশংসভাবে প্রজাবিদ্রোহ দমন করেছিলেন গাছের ডালে বিদ্রোহীদের ঝুলিয়ে দিয়ে তার কাহিনী।

সামাজিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে পটুয়ারা যেসব পট এঁকেছিলেন তার মধ্যে আছে তারকেশ্বরের মোহন্ত-এলাকেশী ও কাকদ্বীপের জাহাজ ডুবির ঘটনা। এছাড়া দুর্ভিক্ষের ঘটনা, পণপ্রথার বলি, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, ১৫ই অগাস্টের স্বাধীনতার পটিগান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত জয় বাংলা পট প্রভৃতিও পটের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য এই জড়ানো পটের আদর্শ পাশাপাশি আদিবাসী সমাজকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে জড়ানো পটও প্রচলিত ছিল। এই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, আদিবাসী সমাজে যমপটও প্রচলিত ছিল। তবে যম এখানে মারাং বুরু এবং এই মারাং বুরুর আদেশ মত শাস্তির চিত্রও বেশ ভয়াবহ।

এইসব নানাবিধ পট নিয়ে চিত্রকর পটুয়ারা গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ান এবং যথাযথ গানের সহযোগে এইসব পট দেখিয়ে বেড়ান তাদেব গ্রাসাচ্ছাদনের উদ্দেশ্যে। এ ক্ষেত্রে তাদের গীত সঙ্গীতের ভাষার সারল্যে এবং হৃদয়গ্রাহীতায় পটুয়াদের বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি পটে উৎকীর্ণ বলিষ্ঠ রেখায় ও উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত সে ছবির অঙ্কনসজ্জার তুলনা হয় না। বলা যেতে পারে, পটে অঙ্কিত রঙের সামঞ্জস্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছবির গঠন-সজ্জাতেও পটুয়ার কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে বেহুলার কলার মান্দাসে ভ্রমণ এবং গঙ্গা-যমুনার ঝগড়া বিষয়ক পটের মধ্যে বিন্যস্ত আঁকাবাঁকা নদীরেখায় ও খোপে খোপে নানা ধরনের দৃশ্য সৃষ্টিতে এই গ্রাম্য পটুয়া চিত্রকর সম্প্রদায় যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তা লৌকিক চিত্রকলার এক অনন্য উদাহরণ। এখনও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার বেশ কিছু গ্রামে পট এঁকে এবং পট দেখিয়ে এই পটুয়া সম্প্রদায় তাদের আবহমান কালের পেশাগত বৃত্তিকে সচল রেখেছেন।

চৌকো পট

জড়ানো পটের মতই আর একটি পট হল চৌকো পট, যেটি আকারে বর্গাকার বা সামান্য আয়তাকার। বীরভূম জেলায় চৌকো আকারের পটগুলিকে বলা হত চৌকোশ পট। বীরভূম জেলার আয়াসপুর ও আহমদপুর গ্রাম থেকে একদা যথাক্রমে মটরু ও অক্ষয় চিত্রকরের আঁকা এমন ধরনের চৌকো পট সংগ্রহ করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। আলোচিত সেসব পটগুলি সংগৃহীত রয়েছে ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় মিউজিয়মে। তাঁদের কৃত পটগুলির অঙ্কনশৈলী সম্পর্কে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ সুধাংশুকুমার রায় লিখেছেন যে, "....দেখলে মনে হবে সেসব যেন দেবশিল্পীদের অঙ্কিত। ইণ্ডিয়ান রেডের জমির উপর নীল-সবুজের কাজই হল প্রাণ। মাঝে মাঝে সাদা রঙের কাজ নীল-সবুজের আনুপাতিক মূল্য বাড়িয়েছে বহুগুণ। অঙ্কিত মূর্তিগুলির সাবলীল গতিভঙ্গী জোরদার ড্রেপায়ির ললিত লীলায় বিধৃত। বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ। পশ্চাৎপটে কোন গাছপালা, ঘরবাড়ির আয়োজন নেই, তার আবশ্যকও নেই। কম্পোজিশন সম্পূর্ণ, নির্ভুল ও বাহুল্যবর্জিত। ধ্রুপদী সঙ্গীতের মত বাংলা পটশিল্পে আহমদপুর-আয়াস ঘরানার ছবি হল ক্লাসিক, তার তুলনা নেই।"

মেদিনীপুর জেলার চিত্রকর-পটুয়ারাও চৌকো আকারের পট তৈরি করে থাকেন। তাদের কৃত সে সব চৌকো পটের মধ্যে হল যাদুপট বা পারলৌকিক পট অথবা চক্ষুদান পট। এই পটগুলির আবার প্রচলন বিশেষ করে ভূমিজ ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে। বস্তুত

জড়ানো পট ও আলোচ্য এই চৌকো পটের মধ্যে চিত্রধর্মের কোন পার্থক্য নেই, শুধু আকৃতিতে একটি লম্বা এবং অন্যটি চৌকো ধরনের।

এ পটের ব্যবহারিক দিকটিও বেশ কৌতুকাবহ। আদিবাসী ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের কারুর মৃত্যু হলে পটুয়ারা মৃত লোকটির একটি অবয়ব আঁকেন, যার মধ্যে চোখ আঁকাটা বাকি থেকে যায়। এবার পটুয়া ঐ অঙ্কিত চিত্রটি মৃতের পরিবারবর্গকে দেখাতেন যে, স্বর্গে ঐ মৃত ব্যক্তিটি চোখের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। পরলোকগত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন চিত্রকর-শিল্পীকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার আঁকা ঐ মানুষটির চিত্রে চোখ এঁকে দিতেন, যা ছিল এই চক্ষুদান পটের বৈশিষ্ট্য। আসলে ঐসব পটে আঁকা হত, স্বর্গে বসবাসরত ঐ মৃত ব্যক্তি উপবিষ্ট অবস্থায় পরমানন্দে মালা জপছেন এবং বহুক্ষেত্রে ছবির উপর দিকে 'হরিবলমন' কথাটাও লিখে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে এই ধরনের কিছু কিছু চৌকো পটে দেখানো হয় পুনর্জন্মের ফল। উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে পটুয়ারা এমন পট এঁকে আনেন, যাতে প্রদর্শিত হয় মৃত ব্যক্তি পুণ্যের ফলে স্বর্গে আরামে আছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের অঙ্কিত ঐসব চিত্রে দেখান, পাপ করার দরুন কিভাবে মৃত ব্যক্তিরা শূকর বা মোরগ হয়ে স্বর্গে জীবনধারন করছেন।

এছাড়া আদিবাসী সমাজে আরও বিভিন্ন ধরনের পট প্রচলিত আছে। পটুয়া শিল্পীদের আঁকা 'শূলপট' দেখানো হয়, যা দেখলে আদিবাসী সমাজ মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 'বেড়াপট' বা 'জঙ্গলপট' পটুয়ারা দেখান যাতে শিকারে সাফল্য আসে। এই ধরনের আর একটি পট হল 'মরাহাজা পট' যাতে জঙ্গলে কেউ হারিয়ে গেলে মারাং বুরুর নির্দেশে সে পটে দেখা যায় সে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি জীবিত না মৃত। এমনিভাবে আদিবাসী সমাজে পটুয়ারা দেখিয়ে বেড়ান 'পৌরি পট', 'রঙ্গিনী পট' ও 'দগরশিলা পট' প্রভৃতি চৌকো পট।

রজনী চিত্রকর অঙ্কিত কালীঘাটের পট

এইসঙ্গে চৌকো পটের আর একটি উদাহরণ হল বর্তমানে বিলুপ্ত 'কালীঘাটের পট'। কলকাতার কালীঘাটে যাত্রীরা দেবীর কাছে পুজো নিবেদন করে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সংগ্রহ করতেন একখানি করে মা কালীর আঁকা চৌকো পট। ছাপাখানার সৃষ্টি না হওয়ায় এইভাবেই হাতে আঁকা কালীঘাটের পটের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলে। পরে অবশ্য এই চাহিদা কেন্দ্রীভূত হয় নানান সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা পটের দিকে। অনুসন্ধানে জানা যায়, কালীঘাট পট অঙ্কনে গ্রামাঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায় যেহেতু অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাই এইসব চিত্রের রেখাধর্ম ছিল নিতান্তই বাংলার পটচিত্রের অনুসারী। অন্যদিকে এই কালীঘাট পটের বেশ কিছু ছবির বর্ণলেপনে পটচিত্রের প্রভাব পড়ে থাকলেও

চিত্রের বিষয়বস্তু ও বিন্যাসে যে অঙ্কনরীতিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাতে অবশ্য সেগুলি আর পটের অনুগামী হয়ে উঠতে পারেনি। সে যাই হোক্, আলোচ্য এই কালীঘাটের পট বাংলার প্রবহমান লোকচিত্রধারার শেষ নিদর্শন বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

অনুরূপ সূত্রধর শিল্পীদের কৃত এই ধরনের চৌকো পটের বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গদেশে শেষ মধ্যযুগে এই সূত্রধরশিল্পীরাই একাধারে কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃত্তিকা চিত্রের প্রতিভাশালী কারিকর ছিলেন। তাঁদের তৈরি কাঠের রথ ও কাঠের মূর্তি, পাথরের মূর্তি, মন্দির দেওয়ালে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলক এবং নানাবিধ পটচিত্র এখনও প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পদবীধারী সূত্রধর শিল্পীরা দশাবতার ও নকশ নামের গোলাকার তাস তৈরি করা ছাড়াও আঁকতেন চৌকো পট। সেসব পটগুলির মূল বিষয়বস্তু হল দুর্গা ও রামরাজা পট। দুর্গা পটের একটিতে আঁকা হত শিবদুর্গা ও তার পুত্রকন্যা এবং অন্য একটি পটে আঁকা হত দুর্গার মহিষমর্দিনী রূপের সঙ্গে তার পুত্র কন্যারা। এদের আঁকা চিত্রে রঙের বিন্যাস, অঙ্কনপদ্ধতি ও রচনাশৈলীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয় যেন বঙ্গীয় পুঁথির পাটাচিত্রের এক সম্প্রসারিত সংস্করণ। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন থেকে প্রকাশিত এক পরিচিতি পুস্তকে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, "..... বিচিত্র রঙয়ের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়নলোভন ব্যবহার খুব কমই চোখে পড়ে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার বা (স্থানীয় সূত্রধর শিল্পী) 'রামরাজা' 'দুর্গা' ইত্যাদির চৌকোপট তাদের নিজস্ব শৈলীতে আজও এঁকে চলেছেন।" পটের প্রচলন বহুল পরিমাণে এই সেদিন পর্যন্ত মল্লরাজধানীতে ছিল — আজও রাজাদের দুর্গাপূজায় পটের প্রচলন উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুরের সূত্রধর শিল্পীদের মত একসময়ে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী মেরতলা গ্রামেও সেখানকার সূত্রধর শিল্পীরা অঙ্কন করতেন চৌকো পট। এখানের দু'ভাই সূত্রধর শিল্পীদের কাছ থেকে গুরুসদয় দত্ত একসময়ে সংগ্রহ করেছিলেন চার-পাঁচখানা ছবি। এদের কৃত ছবির অঙ্কনশৈলী সম্পর্কে সুধাংশুকুমার রায় লিখেছেন, '.... ইউরোপীয় কিউবিজমের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু তার অনেক আগেই, কালো এক রঙা কিউবিজম ছবির মধ্যে ধরে দিলেন বাঙলার এক অখ্যাত পল্লীর মেরতলার দু'জন সূত্রধর। সে কি অপূর্ব ছবি! অভূতপূর্ব এই পটের প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই।' পরবর্তী সময়ে সুধাংশুবাবু পূর্বস্থলীর এই ঘরানার আর এক শিল্পী শশধর সূত্রধরের আঁকা আট-ন'খানি ছবি সংগ্রহ করেছিলেন, যা আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত।

এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার কর্মকার সমাজও বেশ কিছু চৌকো পট অঙ্কন করেছিলেন, যার নিদর্শন ঐ জেলার বিনপুর থানার রামগড়ের ভূস্বামীদের বাড়িতে দেখা যেত। স্পষ্টতই বোঝা যায়, কর্মকার সম্প্রদায়ের এক চিত্রশিল্পী ঘরানা সেসময় ঐ জেলায় পটচিত্র অঙ্কনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপ নদিয়া জেলার শান্তিপুরের কুম্ভকার সমাজও দীর্ঘদিনের প্রথাগত শৈলী অনুসরণপূর্বক এঁকে থাকেন 'পটেশ্বরী' নামে পটে আঁকা কালীমূর্তির চিত্র। শিল্পতত্ত্বের দিক

থেকে পূর্ব-বর্ণিত পটচিত্র প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও অভিরুচির ক্ষেত্রে এগুলিও যে লোকচিত্রের পর্যায়ে শামিল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চালচিত্র

এ ছাড়া পটের আর একটি ধারা হল দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র। সাবেকি এক চালার দুর্গা প্রতিমার উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতিভাবে স্থাপন করা হয় বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত চালচিত্র। প্রাচীন কালের পাথরের মূর্তির উপরিভাগে অর্ধবৃত্তাকারভাবে নানা ধরনের যে 'মোটিফ'
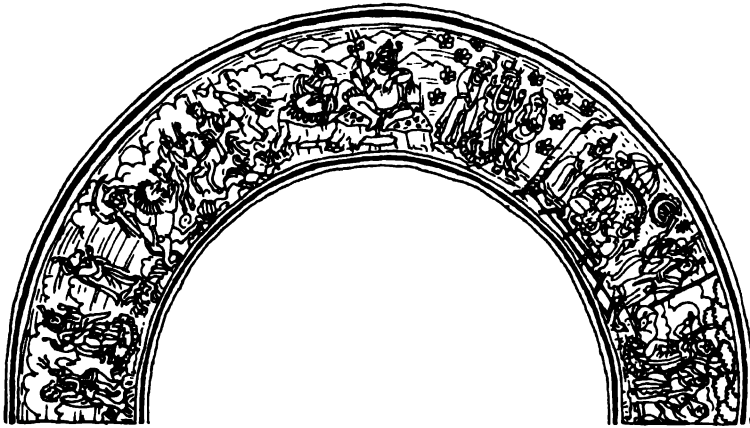
চালচিত্র

উৎকীর্ণ হত, অনুরূপভাবে দুর্গামূর্তির উপরিভাগেও অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে এই চালচিত্র অঙ্কনের রেওয়াজ দেখা যায়। সে চালচিত্রের মূল বিষয়বস্তু হল, শিবদুর্গা, কৈলাস, শিব অনুচর নন্দীভৃঙ্গী, মহিষাসুর যুদ্ধ বা দশাবতার ইত্যাদি। একসময়ে প্রতিমার মেড়ের উপরিভাগে অর্ধগোলাকারভাবে একটি বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তার উপর কাদালেপা এক প্রস্থ মোটা কাপড় টানটান করে লাগিয়ে কাপড়ের বাড়তি অংশ ফ্রেমের পিছন দিকে মুড়ে দেওয়া হয়। এবার কাদা লেপা ন্যাকড়াটি শুকিয়ে গেলে তার উপর খড়ি গোলার অস্তর দিয়ে চিত্রটি আঁকার জমি তৈরি করা হয় ও তার উপর পরিকল্পিত চিত্রটিকে নানান রঙের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিমার রঙের পর অর্ধগোলাকার ফ্রেমের আকৃতিতে আলাদাভাবে কাগজের উপর আঁকা চালচিত্র প্রতিমার রঙের পর সেই ফ্রেমে সেঁটে দেওয়া হয়। এই ধরনের কাগজে আঁকা কয়েকটি চালচিত্রের নিদর্শন দেখা যেতে পারে আশুতোষ মিউজিয়াম বা গুরুসদয় মিউজিয়ামের সংগ্রহে। এইসব চালচিত্রে সাধারণত নীল, খয়েরি, হলদে, কালো, সবুজ ও লাল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। আসলে এই চিত্রশিল্পটির আঁকবার রীতি, রঙের ঔজ্জ্বল্য ও বিন্যাস এবং চিত্রের আঙ্গিক সেই প্রথাগত পটচিত্রের ধারাটিকেই যেন অনুকরণ করেছে।

কাদাগোলা ন্যাকড়ার উপর আঁকা আর একটি চিত্রসম্ভার হল বীরভূম জেলার হাটসেরান্দির সূত্রধর সমাজের আঁকা দুর্গা পট। উল্লেখ্য যে এখানে দুর্গা প্রতিমার বদলে এই দুর্গা পটেই পূজার্চনা সমাধা করা হয়। দুর্গা পটটি সংস্থাপনের জন্য আলাদা একটি মেড়ও তৈরি করা হয় এবং যার উপরিভাগে থাকে অর্ধবৃত্তাকার এক চালচিত্র। সে চালচিত্রেও থাকে রাম, সীতা, শিব, নন্দীভৃঙ্গী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শুম্ভ-নিশুম্ভ মূর্তি প্রভৃতি। এই দুর্গাপটচিত্র বা তার চালচিত্রে ব্যবহার হয় নীল, হলদে, খয়েরি, কালো ও লাল রঙ প্রভৃতি।

রথচিত্র

চালচিত্রের মতই কাঠের রথের গায়েও বেশ কিছু চিত্রসম্ভার লক্ষ করা যায়। আসলে এই রঙীন চিত্রগুলি মূলত মোটা কাপড়ের উপর এঁকে নিয়ে রথের গায়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দেওয়া হত। স্থানীয় সূত্রধর শিল্পীরা রথের কাঠামো ও রথের সজ্জায় যেমন কাঠের মূর্তি তৈরি করতেন তেমনি রথের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই চিত্রকলার আশ্রয় নিতেন।

পল্লী কবি জসীমুদ্দিন তাঁর বিখ্যাত 'চৌধুরীদের রথ' কবিতায় রথের গায়ে চিত্রাঙ্কনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

'তারপর এল নিপুণ পটুয়া সুক্ষ্ম তুলির ঘায়,
স্বর্গ হতে কত দেবদেবী আনিয়া রথের গায়,
রঙের রেখার গড়িয়া মায়ায় বাঁধিয়া চির জনমের তরে
মহাসান্ত্বনা গড়িয়া রেখেছে ভঙ্গুর ধরা পরে।'

বর্ণিত এই কবিতাটিতে গ্রাম্য শিল্পীদের প্রতি যে যথেষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্রধরদের আঁকা রথচিত্রগুলিও ফ্রেসকো চিত্রাঙ্কনের ধারাটির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে এইসব চিত্রগুলির অঙ্কনশৈলী বাংলার পটশিল্পের ধারাটিকেই আড়ষ্টতাবিহীন অতি সহজ ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যা লোকশিল্পের অনুসারী সার্থক লোকচিত্র হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানের রথে আমরা বেশ কিছু চিত্রসম্ভার দেখতে পাই। এই ধরনের রঙিন রথচিত্রের একটি নিদর্শন রয়েছে হাওড়ার আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায়। হুগলি জেলার রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালায় সংগৃহীত এ বিষয়ের কয়েকটি পটচিত্র সম্পর্কে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একদা 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে লিখেছিলেন, '..... অমূল্য প্রত্নশালায় রক্ষিত এ জাতীয় ছ সাতটি বড় বড় প্যানেলের অঙ্কনপটুত্ব এতই উচ্চশ্রেণীর যে শুধু সেগুলি দেখবার জন্যই রাজবলহাট পরিদর্শন নিরর্থক নয়। তাদের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, বীণাবাদিকা, বেহালাবাদিকা প্রভৃতি। রাজবলহাটের সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, দামোদর তীরবর্তী পালিয়াড়া গ্রামের ছত্রেশ্বরী দেবীর প্রাচীন রথ থেকে এগুলি সংগৃহীত। রঙের ঔজ্জ্বল্য এখন ম্লান হলেও এ নিদর্শনগুলি এক বিশিষ্ট শিল্পকর্মে বিগত যুগের বাঙালী কারিগরদের প্রভূত নৈপুণ্যের

স্বাক্ষর বহন করে।' এ ছাড়া, হাওড়া জেলার অমরাগড়ির (থানা ঃ জয়পুর) রথের গায়ে চিত্রিত জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও অন্যান্য বাদিকা মূর্তি এবং কানুপাটের (থানা ঃ উদয়নারায়ণপুর) রথের গায়ে অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য রথচিত্রের নিদর্শন।

দশাবতার তাস

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ফৌজদার রাজ উপাধি প্রাপ্ত সূত্রধর শিল্পীরা পূর্ব-বর্ণিত পটচিত্র, চালচিত্র ও রথচিত্র প্রভৃতি অঙ্কন ছাড়াও তৈরি করতেন দশাবতার তাস। দশাবতার তাসের একশ কুড়িটার নমুনা যদি একজায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়, তাহলে তা রঙে ও রূপে এবং তার অঙ্কন সৌন্দর্যে একান্তই বিমোহিত হতে হয়।

বিষ্ণুপুরের এই দশাবতার তাস সম্পর্কে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক প্রবন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন যে, তাস খেলার রেওয়াজ বাংলায় আনুমানিক পাল যুগের প্রথম দিকেই শুরু হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য দাবা-পাশা খেলার কথা উল্লিখিত হলেও তাসের কোন কথা নেই। অথচ পণ্ডিতদের মতে, তাস খেলার ঐতিহ্য যে সুপ্রাচীন এবং প্রাচ্যদেশ সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকেই আনুমানিক তেরশো খ্রিস্টাব্দের পর যে তাস খেলার পদ্ধতি আরব বণিক কিংবা ক্রুসেডারদের মারফৎ সিসিলি ও স্পেন হয়ে প্রতীচ্যে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া গেছে। বাদশাহ আক ্য যে গোলাকার গঞ্জিফা তাসের এক গুণগ্রাহী ছিলেন সে সম্পর্কে আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায়। এর মধ্যে ওড়িশায়, পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাস এবং ভারতের অন্যসব স্থানে মোগল পদ্ধতিতে গঞ্জিফা তাসের প্রচলন ছিল।

দশাবতার তাস ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের আকৃতি গোলাকার। ব্যাস চার থেকে সাড়ে চার ইঞ্চির মতো। দশাবতার তাসের নাম থেকেই বোঝা যায় এই খেলার প্রচলন হিন্দুযুগ থেকে। তবে বাংলায় বিষ্ণুপুর ছাড়া অন্য কোথাও দশাবতার তাস তৈরি হয় না। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দশরথ রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ স্থানে জগন্নাথ ও কল্কি এই দশ অবতারের রূপ ও তাদের প্রতীকই হল এ তাসের শ্রেণী বা রঙের বিন্যাস। প্রত্যেক শ্রেণীতে বারোটি তাস ধরে মোট তাসের সংখ্যা দাঁড়ায় একশ কুড়ি। এ তাসের দশটি রঙ ও একশো কুড়িটি তাসের সমবায়ে বিবিধ নিয়মকানুন অনুযায়ী তাসের খেলাটি বেশ জটিল। এ ক্ষেত্রে সে খেলার বিস্তৃত পদ্ধতির আলোচনা করা সম্ভব নয়। বরং দশাবতার তাস তৈরি পদ্ধতি সম্পর্কে

আলোকপাত করা যেতে পারে। এ তাস তৈরির পদ্ধতিটি সরল। পুরানো কাপড় তেঁতুল বিচির আঠা দিয়ে কয়েক ভাঁজ পুরু করে জুড়ে নেওয়া হয়। এবার তা শুকিয়ে গেলে তার দু'পিঠে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়। তারপর মসৃণ পাথর দিয়ে ঘসে দু পিঠ সমতল করা হয়। এবার জমিন তৈরি হয়ে গেলে নির্ধারিত মাপের গোল চাকতি করে কেটে নেওয়া হয় এবং রঙতুলি দিয়ে তার উপর অবতারদের ছবি ও প্রতীকগুলি নানান রঙ দিয়ে আঁকা হয়। আঁকা শেষ হলে উল্টো পিঠে গালা ও মেটে সিঁদুরের প্রলেপ লাগানো হয়। তাসের উপরে রঙ ও রূপরেখার এই সম্মিলিত প্রয়োগে প্রথাগত তাসগুলি বাংলার লোকচিত্রের এক আশ্চর্য নমুনা।

চিত্রিত পুঁথির পাটা

বাংলার লোকচিত্রের আর এক নিদর্শন হ'ল পুঁথির মলাট হিসাবে ব্যবহৃত চিত্রিত পাটা। পুঁথির আকার অনুযায়ী উপর-নিচে দেওয়া হত কাঠের পাটা। বহুক্ষেত্রে এসব কাঠের পাটার

পুঁথির পাটা ঃ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা

উপর অংশে নানাবিধ চিত্রণ করা হত। এই ধরনের পাটাচিত্র আশুতোষ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার মিউজিয়াম, গুরুসদয় মিউজিয়ম, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন ও আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা প্রভৃতি মিউজিয়মে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বহু পারিবারিক সংগ্রহেও দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এইসব পুঁথির পাটার অঙ্কনশৈলীকে শিল্প-সমালোচকরা তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে একটি ধারা হল, রাজস্থানি ও পাহাড়ি শিল্পশৈলীর আঙ্গিক অনুসরণে চিত্রিত, দ্বিতীয় এক ধারা হল, ওড়িশা শিল্পরীতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং সবশেষেরটি হ'ল, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের লোকশিল্পরীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক ধারা। এক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রথমশ্রেণীর পাটাচিত্রগুলিকে মাগরীতি ধারা বলে চিহ্নিত করলেও, শেষ দুটি শ্রেণীর পাটায় উৎকীর্ণ

চিত্রের আঙ্গিক, রঙ, রেখা ও প্রকাশভঙ্গি কিন্তু ওড়িশা শিল্পশৈলী এবং বাংলার প্রচলিত লোকচিত্রের সংমিশ্রণে যে রচিত তেমন ধারণা করা যেতে পারে।

এসব পাটার অধিকাংশের বিষয়বস্তু হ'ল কৃষ্ণ, রাম ও চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। ছবির উজ্জ্বল বর্ণ ও আঙ্গিক বিচার করে দেখা যায় এই পাটাশিল্পীরা ছিলেন লোকশিল্পী, বংশপরম্পরায় জীবিকার টানে এই চিত্রশিল্পের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। সেদিক থেকে তাদের সৃষ্ট এই পাটাচিত্রগুলি রূপবিন্যাসের সঙ্গে ভাবাবেশের যেভাবে সার্থক সম্মিলন ঘটিয়েছে তা শিল্পতত্ত্ব বিচারে এক মহৎ সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। (বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'পরিশিষ্ট-৭' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

একটি রামায়ণ পুঁথিচিত্র

লোকচিত্র শিল্পের নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত চিত্রবিচিত্রিত অলংকরণযুক্ত পুঁথি বাংলায় তেমন বহুলসংখ্যক পাওয়া না গেলেও এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থেকে প্রাপ্ত একটি

রামচরিত মানস পুঁথিচিত্র ঃ মহিষাদল, মেদিনীপুব

চিত্রিত পুঁথির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পুঁথিটির বিষয়বস্তু রামচরিত মানস এবং সে পুঁথির পাতায় লেখার সঙ্গে আয়তক্ষেত্রাকৃতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোটা পাতা জুড়ে ছবি চিত্রিত করা হয়েছে। পুঁথিটি বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়মের সংগ্রহে আছে। মহিষাদলের রানী জানকীর পঠনপাঠনের জন্য খ্রিস্টীয় অঠার শতকের শেষদিকে এই পুঁথিটি রচিত হয়। পুঁথিটির চিত্রগুলিতে রঙের প্রয়োগ ও রেখার টান বেশ স্বচ্ছন্দ গতিশীলতার পরিচয় দেয়। সেজন্য পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির অঙ্কনশৈলী যে ওড়িশা শিল্পশৈলী প্রভাবিত বঙ্গীয় লোকশিল্পাশ্রয়ী তেমন ধারণা করেন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচকগণ। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের মতে, এ পুঁথিতে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি হ'ল আধুনিক বাংলার পটশৈলীর প্রাচীনতম প্রকাশ, অন্যদিকে। প্রখ্যাত শিল্পরসিক অশোককুমার দাস এ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছেন তা প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, "..... মহিষাদলের স্থানীয় শিল্পরীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

যে কি রকম ছিল তা জানবার কোন উপায় নেই, তবে পরবর্তীকালে মেদিনীপুরের মহিষাদল, সুতাহাটা, আমদাবাদ, নরঘাট ইত্যাদি জায়গায় ওড়িয়া-শৈলীর প্রভাবান্বিত শিল্পরীতির প্রচলন দেখা যায়। আলোচ্য রামায়ণ গ্রন্থে ও রামায়ণ পটে ওড়িশার শিল্প-শৈলীর রঙ, রেখা, আঙ্গিক, কেশবিন্যাস ও পোশাক পবিচ্ছদের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।" (পুঁথিটির প্রাপ্তিস্থান ও শিল্পরীতির বিতর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাব জন্য দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট-৮'।)

সরাচিত্র

চিত্রিত লক্ষ্মীসরা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ছোটবড় নানান আকারে তৈরি হয় এবং মোটামুটি যার ব্যাস পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সে.মি. অবধি। বিশেষভাবে এই লক্ষ্মী সরার প্রচলন ছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায়। দেশবিভাগের পর সরা-শিল্পীরা নদিয়া আর চব্বিশ পরগনা জেলায় চলে আসায় কলকাতা সহ তার চারপাশে বহু এলাকায় লক্ষ্মীপুজোয় এই চিত্রিত সরা পাওয়া যায়।

এই লক্ষ্মীসরা তৈরি করেন কুম্ভকার সম্প্রদায়। এ সরাগুলি কিন্তু বাজার চলতি অর্ধগোলাকৃতি আকাবের নয়, এর একপিঠটা হয় সামান্য উত্তল কচ্ছপের পিঠের মত। সরার উপর দিকে পাশাপাশি দুটো ফুটো রাখা হয়, যাতে পূর্জাচনার পর সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যায় সে উদ্দেশ্যে।

লক্ষ্মীসরা চিত্র

কুম্ভকারদের কাছ থেকে এই ধরনের গোলাকার পোড়ামাটির সরা সংগ্রহের পর শিল্পীরা লক্ষ্মীপুজোর তিন-চার মাস পূর্ব থেকেই সরা চিত্রণের কাজ শুরু করেন। একদা সরা চিত্রণের কাজে নিয়োজিত শিল্পী সম্প্রদায় ছিলেন আচার্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কুম্ভকার, সূত্রধর ও পটুয়ারা সবাই এই আঁকার কাজ করেন।

সরা চিত্রণের কাজে প্রথমত সরার উত্তল আকৃতির অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু পিঠটি ঘসে মসৃণ করা হয়। তারপর তার উপর দেওয়া হয় খড়িমাটির প্রলেপ। এবার অভিজ্ঞ শিল্পী বলিষ্ঠ কালো রেখা টেনে কয়েকভাগে বিভক্ত করে তার মধ্যে মধ্যে নকশার রেখাচিত্র এঁকে দেন। সে রঙ শুকিয়ে গেলে আঁকা হয় লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর পেঁচা, ধানের শিষ, কড়ি ইত্যাদি। এবার প্রতিমার দেহ মায় কাপড়, চুল, চোখ ও গয়নার উপর নির্দিষ্ট রঙ লাগানো হয়। প্রধান শিল্পী ছাড়া পরিবারের মহিলারা সকলেই কর্মবিভাজন অনুসারে এই চিত্রণের

কাজ করে থাকেন। ছবি আঁকার কাজ শেষ হলে রঙের স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য সাবুর আঠার বা তেঁতুল বিচির গাদের প্রলেপ দিয়ে তার উপর প্রয়োগ করা হয় গর্জন বা ঘাম তেল, যা কিনা রজন গোলা তার্পিন তেল।

সরা চিত্রের বিষয়বস্তু মূলত দেবী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ছাড়া দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আঁকা সরাও উল্লেখযোগ্য। তবে এইসব দেবীমূর্তির সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণ, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ এবং সীতা সহ রাম। অন্যত্র লক্ষ্মী সরায় দুপাশে থাকে দেবীর দুই সহচরী এবং দুর্গা সরার দুপাশে উৎকীর্ণ হয় তার পুত্রকন্যাদের মূর্তি। উল্লেখ্য যে, ছবিটি যদি লক্ষ্মীর না হয়ে অন্য কোন দেবীর হয় তাহলে নিচের দিকে অবশ্যই থাকবে লক্ষ্মীর ছবি। এছাড়া মূল দেবীমূর্তির দুপাশে দুজন বা চারজন সহচরী অঙ্কিত হলে সেগুলিকে যথাক্রমে তিন পুতুলের সরা বা পাঁচ পুতুলের সরা বলে চিহ্নিত করা হয়। সব মিলিয়ে বর্ণবিন্যাসে ও রেখাঙ্কনে সৃষ্ট সরায় উৎকীর্ণ চিত্রগুলি ছিল গ্রাম্য সরলতার প্রতিমূর্তি।

অন্যদিকে স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় যে চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল, সেগুলি আলাদা আলাদা নামকরণেও ভূষিত ছিল। যেহেতু আচার্যরা এই সরা চিত্রিত করতেন সেজন্য তাদের সৃষ্ট এই সরাকে অনেক সময় বলা হয় আচার্যি সরা। একসময়ে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার সুরেশ্বর গ্রামে যে বিখ্যাত সরা প্রস্তুত হ'ত তার নাম ছিল সুরেশ্বরী সরা। সে সরাগুলির উপরের অংশে মহিষমর্দিনী দুর্গা ও তার পুত্রকন্যাদের চিত্র এঁকে নিচের অংশে লক্ষ্মী ও পেঁচার ছবি অঙ্কন করা হত। অন্যদিকে ঢাকায় প্রস্তুত সরাকে বলা হ'ত ঢাকাই সরা, যার অঙ্কনশৈলী মোটামুটি সুরেশ্বরী সরার মতই। তবে সেখানে দেবী লক্ষ্মীকে ময়ূরপঙ্খীতে অবস্থানরত হিসাবে দেখানো হত এবং ঐ ময়ূরপঙ্খীর ময়ূরটিকে উৎকীর্ণ করা হত আবহমান কালের প্রথাগত মোটিফ অনুযায়ী শিখি চঞ্চু দ্বারা ধৃত সর্প।

সরার ছবিগুলি আঁকা হয় মোটা তুলির পোঁচে অতি দ্রুততার সঙ্গে। লাল বা কালো রঙ-এর বর্ডার এঁকে মধ্যেকার জায়গায় লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ রঙ দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। সেজন্য গোটা চিত্রটির মধ্যে চালচিত্র অঙ্কনের শিল্পরীতির আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সরাতে দেবদেবীর মুখের অবয়বটি শুধু বিশেষভাবে তুলে ধরা হলেও বাকি হাত-পা ও চুল ইত্যাদি অতি দ্রুত টানা রেখা দিয়ে রূপায়িত করা হয়। ঠিক সেইভাবেই কয়েকটি রেখার টানে দেহের গঠন, কাপড়ের ভাঁজ ও শাড়ির আঁচলের আভাস দেওয়া হয়। অতি দ্রুত আঁকতে হয় বলেই সরাচিত্রে অলংকৃত নকশার তেমন বাহুল্য চোখে পড়ে না। আবহমানকাল ধরে অঙ্কিত লক্ষ্মীসরা চিত্রণের মধ্যে যে সারল্য ও সজীবতা লক্ষ্য করা যায় তা বাংলার লোকচিত্রের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলপনা

বাংলার লোকচিত্রের এক বড় উদাহরণ হ'ল মেয়েলি আলপনা। গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচলিত নানান ধরনের ব্রত পালনের মধ্যে প্রকাশ পায় নারীমনের বিচিত্র সব কামনা-বাসনা। পরিবার পরিজন সকলের সুখ শান্তি ও মঙ্গল কামনার মধ্যে বাংলার নারীসমাজ যে মানসিক সংস্কৃতি

রচনা করেছিল, ব্রত হ'ল তারই এক অভিব্যক্তি। তাই ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন রচিত হয়েছে নানাবিধ ছড়া, যার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে নারী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ব্রতের প্রধান এক অঙ্গ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে আলপনা চিত্রণ, যা লৌকিক শিল্পকলা বিকাশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
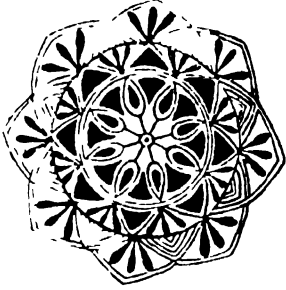
পদ্মসহ দুটি লতাযুক্ত আলপনা

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্রতকথা ও আলপনার গুরুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্রত পালনে বা কোন উৎসবে সামান্য এক টুকরো ন্যাকড়ার সাহায্যে পিটুলিগোলার জলে একটিমাত্র আঙুলের স্পর্শে দু'চারটি টান দিয়ে যেসব আলপনার নকশাগুলি ফুটিয়ে তোলা হয় তার মধ্যে গ্রাম্যনারীর শিল্পসত্তার যে প্রকাশ ঘটে, তা বঙ্গসংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ বলা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ সেজন্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

'... ব্রতের মূলে কতখানি ধর্মপ্রেরণা, কতখানি বা শিল্পকলা সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত। .... পূর্বকালে মানুষ যে কোন কারণে হোক মনে করত, যে জিনিস সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিংবা তার প্রতিমূর্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ করবে। সে-হিসেবে আলপনায় জিনিসটির প্রতিরূপ তো দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখনি, মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না যতক্ষণ না শিল্প-সৌন্দর্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে।'

আলপনার বিষয় প্রকারও বেশ বিচিত্র। কামনা বাসনার এই অভীপ্সায় তাই অঙ্কিত হয় বহুদলে বিকশিত পদ্ম, ফুল লতাপাতা, কখনও বা কল্পনাভিত্তিক শঙ্খলতা, চালতালতা, খুন্তিলতা। এছাড়া অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখা যায়, কত ভিন্ন ভিন্ন নকশার সমাবেশ, যার মধ্যে রয়েছে হাতি-ঘোড়া, মাছ, পাখি, কাঁকুই, আর্শি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, হাতে পো কাঁখে পো; আবার কোথাও আঁকা হয় নৌকো, পালকি, আবার কোনটাতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পূর্ণকুম্ভ ও নানান অলঙ্কার। সেদিক থেকে বঙ্গজননীদের কৃত এই আলপনা চিত্রাঙ্কনের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ গতি ও রেখা সাবলীলভাবে যেভাবে নারীসমাজের মনের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তা বাংলার লোকচিত্র তথা লোকশিল্পের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (আলপনার 'সোটিক' ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্পআলোচনার জন্য পরিশিষ্ট-১' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

পিঁড়ি-কুলো চিত্র

সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ নারীসমাজ কিভাবে তার প্রয়োজনীয় বস্তুকে শিল্পায়িত করে তোলেন তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, বিবাহ সভায় বর-কনের বসার জন্য বহুবর্ণ চিত্রিত পিঁড়ির সজ্জা। আলপনায় পটুত্ব অল্প বিস্তর সকল রমণীরই ছিল। কিন্তু বিয়ের পিঁড়ির

এই বিশেষ চিত্রায়িত কাজটির জন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যার কিছুমাত্র অঙ্কনপটুত্ব থাকতো তিনিই এর অঙ্কনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এইভাবেই পিঁড়ি, কুলো, বরণডালা, এয়োসরা প্রভৃতিতেও অনুরূপ কারুকৃতির ছোঁয়া লাগতো। এর মধ্যে বাঁশের তৈরি কুলো চিত্রায়নের কথাই ধরা যাক। উৎসব প্রয়োজনে সুপটু রচনাকৌশলের দ্বারা চিত্রিত করা হত এইসব কুলো। আলোচ্য পিঁড়ি বা কুলোয় চিত্রায়িত এইসব নকশায় থাকে আলপনা সদৃশ ফুল-লতাপাতা, বহুদল পদ্ম, শঙ্খলতা এবং নানান জ্যামিতিক রেখার প্রাধান্য আর তার সঙ্গে উজ্জ্বল রঙিন বর্ণের প্রলেপ। উৎসবকে রঙ ও রেখার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করা ছাড়াও এইসব নকশার মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ আবেদন ছিল যা আলপনা ও নকশিকাঁথার নকশার ইঙ্গিতের মতই ছিল সহজবোধ্য। এইভাবেই এই ইঙ্গিত প্রবণতার সঙ্গে নিছক রূপসৃষ্টির পরিচয় সন্নিবেশিত হয়েছিল এইসব সরা-কুলো চিত্রণের মধ্যে।

চিত্র উৎকীর্ণ মৃৎপাত্র

ক মনসা ঘট

উৎসব উপলক্ষে দেবীমূর্তিব বিকল্পে যে ঘট পূজিত হয তাব গাযে বেশ কিছু চিত্রণেব নিদর্শন পাওযা যায। এই ধবনেব এক দেবী হল মনসা ঘট। পূর্ববাংলায বিশেষ কবে ববিশালে এই চিত্রিত ঘটকে কেন্দ্র কবে মনসা পূজাব আযোজন কবা হয। দেশ বিভাগেব পব ঘটশিল্পীদেব অনেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায উত্তব চব্বিশ পবগনা জেলাব নানাস্থানে এই চিত্রিত মনসা ঘট পাওযা যায। এ ঘটেব আকৃতি বেশ একটু লম্বাটে ধবনেব এবং ঘটেব গাযে উৎকীর্ণ চিত্রও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুম্ভকাবদেব কৃত এই ঘটেব উপব শিল্পীবা মনসা মূর্তি চিত্রণ কবেন গঠনভঙ্গিমাব সঙ্গে তাল বেখে এবং উপবেব ঘটেব মুখেব প্রসাবিত কানা অংশটি হযে উঠে যেন দেবীব এক শিবোভূষণ। মনসাব দুটি হাতেব মুঠিতে ধবা থাকে একটি কবে সাপ। একটানে দ্রুত বেখা টেনে আঁকা হয ঠোঁট ও চিবুকেব ভাজ, নাকে নথ, চোখেব ভ্রু, ত্রিনযন এবং হাতেব আঙুল। দেবীব গযনা হিসাবে উৎকীর্ণ কবা হয সাপ ও সাপেব ফণাযুক্ত নকশা। দেবীব গাযেব বঙ হিসাবে প্রযোগ কবা হয হলুদ এবং ঠোঁটেব প্রান্তটি হয সিঁদুবে বর্ণ। তবে দেবীব পবিধান বস্ত্রেব বঙ কোন কোন ঘটে দেখা যায সবুজ, কোথাও বা লাল। অক্ষিগোলকসহ দেবীব চোখদুটি বিস্ফাবিত দৃষ্টিতে দৃশ্যমান এবং হাতেব উপব কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায বৃশ্চিক সদৃশ উল্কি বেখা। ঘটেব নিচেব ফাঁদালো অংশে অনেক সময চিত্রিত হয পদ্মফুলেব অলংকবণ, যাব উপব দেবীব অধিষ্ঠান। আবাব কখনো কখনো দেবীব দুপাশে থাকে বাজহাঁসেব প্রতিকৃতি। সব মিলিযে দেবী মনসাব ঘটটি বেশ অর্থবহ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক লোকচিত্রেব উদাহবণ।

চিত্রিত মনসা ঘট

খ. চিত্রিত হাঁড়ি

বিযেব তত্ত্বেও মিষ্টান্ন পাঠাবাব উদ্দেশ্যে একদা ব্যবহৃত হত নানান চিত্র-বিচিত্রিত হাঁড়ি। এবং সেসব হাঁড়িব ঢাকনা হিসাবে ব্যবহৃত হত উপুড় কবে বাখা খুবো দেওযা সবা। হাঁড়ির

গাযে চিত্রিত কবা হয ফুললতাপাতা সহ পদ্মফুল, মাছ, প্রজাপতি ও পান পাতাব নকশা এবং সেই সঙ্গে সবাব গাযেও থাকতো নকশা-চিত্রণ। এইসব হাঁডিব গাযে আকর্ষণীযভাবে লাল, নীল, হলুদ আব সবুজ বঙেব প্রলেপ দেওযা হত, যা লোকচিত্রেব নিদর্শন বলে গণ্য হতে পাবে।

চিত্রিত হাঁডি

বীবভূম জেলাব বাজনগব ও সিউডি প্রভৃতি এলাকায বিযেব সময ছাদনাতলায এই ধবনেব ছয বা আটটি চিত্রিত হাঁডি বাখাব প্রথা আছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলাব কাঁদি এলাকাতেও বিযেব তত্ত্ব পাঠাবাব প্রযোজনে অনুরূপ চিত্রিত হাঁডিব প্রচলন দেখা যায। এখনও হাওডা ও মেদিনীপুব জেলায মুসলিম সমাজেব বিযেব তত্ত্বে পাঠানো হাঁড়িব গাযে লাল-সাদা বঙেব নানাবিধ অলংকবণ দেখা যায। উল্লেখ্য যে, মেদিনীপুব জেলাব পটুযা-চিত্রকব সম্প্রদায এখনও কুম্ভকাবদেব প্রস্তুত হাঁডিব গাযে নানান নকশা এঁকে বিভিন্ন মেলায বিক্রিব জন্য আনেন।

গ. কলসি ও হাঁড়ির গায়ে খোদাই অলঙ্করণ

পাঁচমুডোব (বাঁকুডা) হাঁডিব গায়েব অলঙ্কবণ

হাঁডিব গাযে বঙীন চিত্রণ ছাডা, বাঁকুডা জেলাব সোনামুখি, বাজগ্রাম ও পাঁচমুডোব কুম্ভকাবগণ হাঁডি বা কলসিব গাযে কাঁচা অবস্থায কাঠি দিযে স্বল্পগভীবে সরু দাগ টেনে নানান অলংকবণ কবে থাকেন। এইসব উৎকীর্ণ নকশা অলংকবণেব মধ্যে দেখা যায, জ্যামিতিক নকশা সহ মাছেব প্রতিকৃতি। এবাব যথাযথ বঙেব প্রযোগ ও পোডানোব পদ্ধতিতে সে সব হাঁডি-কলসিগুলিব বঙ হযে দাঁডায লাল এবং কালো। কোন কোন মৃৎপাত্রেব গাযে আবাব সাদা বঙেব প্রলেপও থাকে। উজ্জ্বল ও অলংকৃত এইসব মৃৎপাত্রগুলিব নকশা যে একান্তই লোকচিত্রেব অনুসাবী সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই।

ঘ. এয়ো সরা

বিবাহ অনুষ্ঠানেব প্রযোজনে নির্মিত আব একটি চিত্রিত মৃৎপাত্র হল 'এয়োসবা'। যদিও নামে সবা, কিন্তু এটিব আকৃতি খুবোযুক্ত ক্ষুদ্রাকাব হাঁড়িব সমগোত্রীয়। এই হাঁড়ি বা ঘটের উপর থাকে ঢাকনা দেওযা একটি সবা, যাব উপবের দিকটা তৈবি করা হয় মন্দিরের চূড়ার মত আকাবে এবং সর্বোপবি এই চূড়ার উপরিভাগে নিবদ্ধ হয় ডানা মেলা ও পেখম তোলা এক ময়ূবেব প্রতিকৃতি। অন্যদিকে হাঁড়ির নিচের অংশে চারদিক ঘিরে সংযোজিত হয় সারিবদ্ধভাবে চোদ্দটি ঘাগরা পবিহিত মেয়ে পুতুল। এছাড়া এই জাতীয় সরার গা জুড়ে চিত্রিত হয় নানা

রঙের ফোঁটা সহ ফুললতাপাতার নকশা। সেদিক থেকে চিত্রণ ও পুতুলের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক অভিনব লোকশিল্পের উপকরণ এই এয়োসবা। বর্তমানে এই ধরনের এয়োসরার তেমন
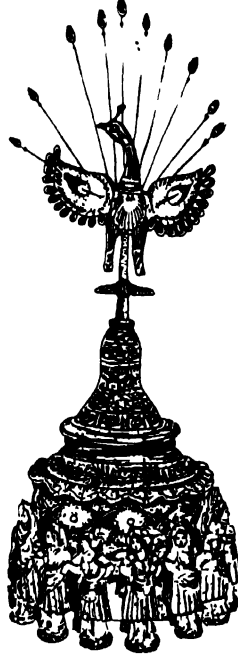
এয়ো সবা : আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ

প্রচলন না থাকলেও এর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রদর্শন কক্ষে।

গৃহশিল্প সামগ্রী

বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহারেব নানান টুকিটাকি গৃহশিল্পসামগ্রীর মধ্যে যে চিন্তা ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তার পরিচয় হ'ল, হাঁড়ি, সরা, শিকে, কাঁথা, মাদুর, আসন, হাতপাখা, শীতলপাটি, বাক্স-তোরঙ্গ, প্যাঁটরা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি প্রভৃতি গৃহস্থালির নানান উপকরণ। আব এইসব সামগ্রীই ছিল জীবনের গভীরে অবস্থিত বঙ্গললনাদের সংস্কৃতি ভাণ্ডাব।

ক. কাঁথা

নাবীসমাজের রূপকল্পনার এই বিস্তৃতি ও চিরাচরিত সংস্কৃতি ধাবার সঙ্গে যোগসূত্রের নিদর্শন খুব নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় তার গৃহসজ্জায় কাঁথা শিল্পেব মধ্যে। অতি পবিচিত আলপনাব নকশাগুলির সঙ্গে কাঁথার নকশাগুলির যে যোগাযোগ রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। জীর্ণ শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতোয় বোনা এই অসামান্য নকশি-কাঁথা শুধু শয্যার আবরণ সজ্জাতেই নয়, বাক্স-প্যাঁটরা ঢাকা দেবার জন্য বা আয়না-চিরুনি প্রভৃতি কেশচর্চার দ্রব্য জড়িয়ে বাখার জন্যে বা পান-সুপুরি-জাঁতি প্রভৃতি রাখার জন্য থলি তৈরিতেও ব্যবহার করা হত, যার শিল্পকৃতি পল্লীললনাদের সবল চিত্তাকাশের এক অপূর্ব দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নকশী কাঁথা : যশোহর (বাংলাদেশ)

সাবেকি এইসব নকশি কাঁথা মূলত পশ্চিমবঙ্গেব আশুতোষ মিউজিযম, গুরুসদয মিউজিযম, ইণ্ডিযান মিউজিযম, আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায সংগৃহীত হযেছে এবং এব মধ্যে গুরুসদয মিউজিযমেব সংগ্রহটি হল বৃহত্তম, সংখ্যায দু'শো বা তাবও বেশি হবে। এইসব সংগ্রহশালাব কাঁথাগুলি সংগৃহীত হযেছে অবিভক্ত বাংলাব যশোহব, খুলনা, ফবিদপুব, মযমনসিংহ ও ববিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে। এছাড়া বাঁকুড়া, হাওড়া, বীবভূম ও উত্তব চব্বিশ পবগনা জেলা থেকেও ভিন্নবীতিব বেশ কিছু নকশি কাঁথাব নিদর্শন পাওযা গেছে।

এইসব নকশি কাঁথাব বেশ প্রকাবভেদ ছিল। শয্যাব আববণে যে কাঁথা ব্যবহৃত হ'ত তাব নাম ছিল সুজনি কাঁথা, যাব আযতন ছিল কমপক্ষে এক মি x একশো কুড়ি সে মি। আবাব শীতেব দিনে গাযে দেবাব জন্য যে কাথা, তাব নাম লেপ কাঁথা। এগুলিব আকাব ছিল অপেক্ষাকৃত বড এবং তুলোব লেপেব মত এগুলিও গোটা দেহ আবৃত কবাব জন্য ব্যবহৃত হত। এগুলিও দৈর্ঘ্যে হত কমবেশি সাড়ে সাত ফুট ও প্রস্থে চাব থেকে সাড়ে চাব ফুট। সুজনি বা লেপ কাঁথা ছাড়াও 'বেতন' নামে ছোট চৌকো আকাবেব যে কাঁথাটি তৈবি কবা হত, সেটিব প্রযোজন ছিল বাক্‌সো-প্যাঁটবা ঢেকে বাখাব বা পুঁথিপুস্তক মুড়ে বাখাব জন্যে। এছাড়া আযনা-চিরুনি জড়িযে বাখাব জন্য লম্বা আকাবেব যে কাঁথাটি প্রস্তুত কবা হত, তাব নাম ছিল 'আবশিলতা'। পান সুপাবি-জাঁতি বাখাব জন্য নকশি কাঁথাব যে থলিটি তৈবি হত তাকে বলা হত 'দুর্জনী'। অন্যদিকে আব একটি ছিল পাতলা ধবনেব 'রুমাল' কাঁথা যাব ব্যবহাব ছিল রুমালেব মতই।

বিভিন্ন বঙিন সুতোব ফোঁড দিযে অপরূপ সব নকশা তোলা হত সেসব নকশি কাঁথায। কি ছিল না সে সব নকশায। কাঁথাব মধ্যিখানে থাকতো শতদল পদ্মেব নকশা, কলকাব বন্ধনী তাব চতুর্দিকে, কখনও বা কলস ও শঙ্খেব চিত্র সেসব বন্ধনীতে। নাবীজীবনেব কামনা-বাসনাব আভিলাযে সৃষ্ট সে সব নক্‌শায প্রতিফলিত হযেছিল ফুললতাপাতা, নৌকা, বথ, ঘব-বাড়ি, হুঁকো, ঢেঁকি, ছাতা, সেইসঙ্গে বঙ্গবালাদেব গৃহশিল্প সামগ্রীব চিত্র হাঁড়ি-সবা, কুনকে-গাড়ু, থালা-বাসন, জাঁতি, কাঁচি, আযনা-চিরুনি, কাজললতা, পিলসুজ, সিঁদুব কৌটো, লক্ষ্মীব ঝাঁপি, গলাব হাব, বাজু প্রভৃতি। অন্যদিকে ছিল কত মানুষজন, ববববধূ, ফিবিঙ্গি সাহেব, ঘোড়সওযাব, গযলানি, মেছুনি, পাইক, জমিদাব প্রভৃতিব প্রতিকৃতি। এছাড়াও ছিল পশুপক্ষী জগতেব বিষযবস্তু বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, কুকুব, বিড়াল, গরু, হবিণ মায মযূব, টিযা, কাকাতুযা, চিল প্রভৃতিব সমাবোহ। ঠাকুব দেবতাদেব দৃশ্যাবলিব চিত্রও ছিল কাঁথাব এক বড আকর্ষণ। কৃষ্ণলীলাব নানান দৃশ্যসহ বামাযণ কাহিনীব বাম, বাবণ আব হনুমানেব প্রতিকৃতি।

নকশিকাঁথাব বৃহত্তম যে সংগ্রহ আমবা ঠাকুবপুকুবেব গুরুসদয মিউজিযমে দেখি তাব মধ্যে যশোহব থেকে প্রাপ্ত একটি সুজনি কাঁথা একান্তই দৃষ্টি আকর্ষক। সেখানেব সে কাঁথায উৎকীর্ণ অষ্টদল পদ্মেব চতুর্দিকে কলকাগুলিকে বেষ্টন কবে সেলাইযেব ফোঁড়ে অক্ষব তুলে বেশ কিছু কথা লেখা হয়েছে। সে লিপিব বযানটি হল হুবহু এইবকম : 'এই সজনী জঙ্গলবাধান নিবাসী শ্রীযুক্ত ববদাকান্ত বসুব কন্যা আমি শ্রীমতি মানদাসুন্দবী দাস্যা মোম হস্তে

প্রস্তুত পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত পীতাঠাকুর মহাশয়কে এই সজনী প্রণামপূর্ব্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা যে ত্রীটী হয় মাপ করিবেন'। 'মমহস্তে প্রস্তুত' পিতাঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত এই কাঁথায় শিল্পী মানদাসুন্দরীর কৃত সুচের টানের রেখায় সেকালের ভক্তিনম্র সমাজজীবনের এক চিত্র সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভেসে ওঠে। বঙ্গললনাদের একদা সুগভীর স্নেহ ভালবাসার প্রতীক প্রীতি-উপহার হিসেবে এই কাঁথা রচনার জন্যে যে নিষ্ঠা ও শ্রম ব্যয় করা হয়েছে, তা দেখে শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে প্রতিটি বাঙালির মন।

কাঁথা তৈরির উপাদান ছিল ধুতি বা শাড়ি ও তার সঙ্গে থাকা পাড়ের নানান রঙের সুতো। গ্রাম্যনারীর কুশলী আঙুলের সহজাত কুশলতায় সেই সামান্য উপকরণও রূপায়িত হত অসামান্য এক শিল্পকৃতিতে। তৈরির পদ্ধতিও ছিল সহজ সরল। কাঁথার কাপড় ভালভাবে কেচে পরিষ্কার করে নেওয়া হত। তারপরে মেঝেতে কোন শীতলপাটি বা মাদুর বিছিয়ে তার উপর মাপমত বস্ত্রগুলিকে পাতা হত, একটির উপর একটি করে, প্রয়োজনবিশেষে চার থেকে ছ'খানা দেওয়া হত। বেশ টান করে পাতা এই কাপড়গুলির চারদিকের প্রান্তভাগ ভিতর দিকে মুড়ে নিয়ে সাদা সুতোর হেম বা মুড়ি সেলাই করে নেওয়া হত। এবার চারধার মুড়ি সেলাই করে নেওয়ার পর, সমান্তরালভাবে কখনও উপর নিচ করে কয়েক ক্ষেপ 'রান' বা দাঁড়া সেলাই করে কাঁথাটিকে টানটান করে খাপী করে নেওয়া হত। এরপর শুরু হত নকশা তোলার কাজ। এবার শিল্পীর পরিকল্পনামত গোটা সাদা কাপড়ের উপর ছুঁচ দিয়ে পরিকল্পিত নকশার আকার-ইঙ্গিত সম্পর্কে একটা খসড়া দাগ টেনে নেওয়া হত। এরপর শুরু হত রঙিন সুতোর ফোঁড়ে নকশা উৎকীর্ণের কাজ। সেদিক থেকে এইসব ফোঁড়ও ছিল নানান ধরনের। নকশায় পশুপাখি, দেবতা মানুষজনের প্রতিকৃতিগুলির প্রান্তীয় রেখাগুলি একটানা ফোঁড়ের সাহায্যে দুবার দাঁড়া সেলাই চালানো হত। এবার ভেতরের অংশগুলি ভরাট করা হত আড়াআড়ি ফোঁড়ের সেলাই দিয়ে, যার ফলে কাঁথাটি হয়ে উঠতো ভিত্তিচিত্রের পটভূমির মত মসৃণ ও জমাট। এইভাবে নকাশি কাজ শেষ হলে, জমির ফাঁকা অংশগুলিতে সাদা সুতোর অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি ফোঁড় চালিয়ে কাঁথাটিকে মজবুত করে তোলা হত। এছাড়া ছিল দোরোখা ফোঁড়ের সেলাই, যার দুপিঠেই ফুটে উঠতো একইরকম নকশার এক বিস্ময়কর রূপ।

অন্যদিকে নকশা বৈচিত্র্যের সঙ্গে দেখা যায় সুতোর নানাবিধ রঙ নির্বাচন। মোটামুটি দেখা যায় কালো, লাল আর হলদে এই তিন রঙেরই বেশি ব্যবহার হয়েছে। তাহলেও কিন্তু খয়েরি, গোলাপি, নীল ও সবুজ সুতোর রঙ যে ব্যবহৃত হয়নি এমন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর যে চলতি রঙ সে রঙের সুতোয় দিতে হবে এমন নয়, সেক্ষেত্রে শিল্পী তার খেয়ালি মনের রঙিন সুতো প্রয়োগ করে সে নকশা তুলেছেন, যার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূরের রঙ হয়েছে লাল বা পদ্মের রঙ সবুজ এবং হাতির রঙ নীল। পল্লীবধূদের অবাধ কল্পনার কাছে রঙের নিয়ম অনুসৃত না হলেও সেগুলি মোটেই দৃষ্টিকটু ঠেকতো না।

নকশি-কাঁথা তাই নারী জীবনের এক কর্মযজ্ঞ। একদা সীমাহীন ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সেলাই কুশলী আঙুল চালিয়ে যে রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করেছিল বঙ্গীয় ললনারা তা আজ বিগত দিনের বাংলার লোকশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ ও তুলনাহীন শিল্পকৃতির

পরিচয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন, 'সামান্য শাড়ি ও ছেঁড়া কাপড়ের উপর চিত্র বিচিত্রিত কারুকার্য করা কাঁথার পসরা নিয়ে বাংলার কলালক্ষ্মীদের শয্যাগৃহ ছিল যেন এক চিত্রশালা'।

খ. কুনকে, পানের বাটা, জাঁতি, কাজললতা, চিরুনি, সিঁদুর কৌটো

জীবনযাত্রার তালে তালে ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্যে শুধু সাধারণ জীবন কাটানোতেই বাঙালির মন ভরেনি, সামান্য পরিশ্রম ও সামান্যতর ব্যয়ে বাঙালির সাধারণ গৃহকোণ অসাধারণ হয়ে উঠেছে তার রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। ধান-চাল-মাপার জন্য সাদাসিধে মাটির বা বেত-বাঁশের পাত্রে কাজ চলে গেলেও নানা নকশায় অলংকৃত কাঁসা-পিতলের কুনকে ছাড়া বঙ্গললনাদের কাজ চলেনি।

তাই ঢোকরা আর মাল কামারদের তৈরি একসেরি থেকে একছটাকি পর্যন্ত নানান আকারের মোমগলানো পিতলের পাইকোনা গৃহস্থের ঘরে শোভা পেত। আর সে পাইকোনার গায়ে থাকতো কি সুন্দর সব লতাপাতার নকশা। অন্যদিকে বীরভূম জেলার লোকপুরে তৈরি এমন কাঠের কুনকের উপর পিতলের নকশা করা পাত লাগানো সাত থাক কুনকেও যে থাকতো না ঘর গৃহস্থালিতে এমন নয়। লোকশিল্পের এমন সব উপকরণেই প্রতিভাত হয়ে উঠতো ঘরগৃহস্থালির সৌন্দর্য।
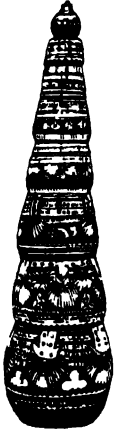
লোকপুরের (বীরভূম) পাই-কুনকে

ঠিক এমনিভাবেই পান-সুপারি রাখা পাত্র, ক্ষেত্রবিশেষে পানের ডাবর, পানের বাটা, পানদান, পানের ডিবে, চুনের কৌটো আর তার সঙ্গে লোহা বা নকশাদার পিতলের জাঁতিও শোভা পেত ঘর গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হিসেবে। পিতলের পানের বাটার গায়েও একসময়ে খোদাই করা হত নানান কারুকার্য। আর পানের ডিবের আকার করা হত দু'খোল তৈরি কোন মেয়ের গোটা মুখের আদলে। আর ঘর সংসারে ব্যবহৃত পিতলের জাঁতির কারুকার্যতার কোন তুলনাই হয় না। সেগুলির আকৃতি ছিল ময়ূর, মাছ বা কুমিরের ধরনে অথবা জাঁতির এক খোলে রাধা অন্য খোলে কৃষ্ণের মূর্তিও থাকতো।

আবার ছেলের চোখে কাজল লাগাবার জন্যে অবশ্যই ঘর-গৃহস্থালিতে রাখতে হ'ত কাজললতা, তা সে অবস্থা বিশেষে লোহার বা পিতলের যাই হোক না কেন। পিতলের সেসব কাজলতার গায়ে ছিল ফুল লতাপাতার নকশা, যার আংটায় উৎকীর্ণ হত একটি ছোট ময়ূরের মূর্তি।

তারপর গৃহস্থবধূদের কেশ পরিচর্যার জন্য ছিল চিরুনি। বিশেষ করে সেটি তৈরি হত মোষের শিং থেকে। আবার সেটির বাঁটের প্রান্তভাগে থাকতো ময়ূর বা হরিণের নকশা-প্রতিকৃতি। চিরুনি কারিগরদের তৈরি সাধারণ চিরুনি ছাড়াও আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিরুনি গৃহস্থ বাড়িতে শোভা পেত, যাকে বলা হত 'তেলকম' চিরুনি। গৃহবধূর অতি আদরণীয় এই
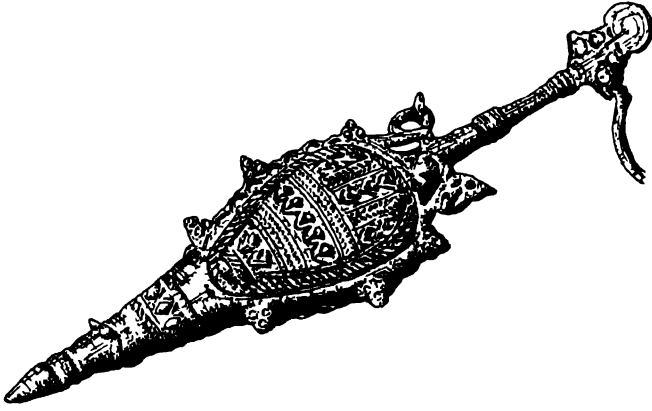
পিতলেব কাজললতা ঃ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পবিষদ মিউজিযাম সংগ্রহ

চিরুনির বৈশিষ্ট্য ছিল চিরুনির উপরের মাথার দিকে লম্বা অংশে একটি ফাঁপা খুপরি রেখে তাতে তেল ভরে দেওয়া হত এবং চিরুনির প্রত্যেক দাঁড়ার ভেতরের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে তেল মাথায় বেরিয়ে আসতে পারতো। এইভাবেই এটির নামকরণ করা হয়েছিল 'তেলকম' চিরুনি।
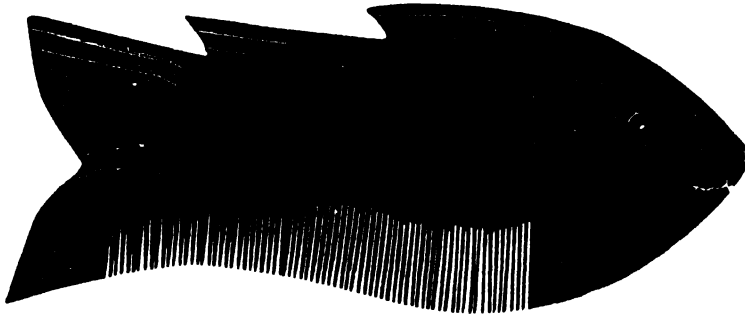
শিংয়ের চিরুনি

কেশ পরিচর্যার অঙ্গ হিসাবে সিঁদুর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত সিঁদুর কৌটো। কাঠ পেতল বা মোষের সিং থেকে তৈরি সিঁদুর কৌটোগুলির মধ্যেও কারুকাজ কম থাকতো না। পিতলের মোমঢালাই দু'খোল খুরো লাগানো ফুললতাপাতার নকশা শোভিত সিঁদুর কৌটোর উপর দিকে নিবদ্ধ হত ময়ূরের প্রতিকৃতি, কখনো বা একটার বদলে থাকতো পাঁচটা ময়ূর। সব মিলিয়ে এইসব খুঁটিনাটি গৃহশিল্প সামগ্রীর মধ্যে বাংলার সেই চিরন্তনী শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যেত।

গ. হাত পাখা

গৃহশিল্প সামগ্রীর আর এক উদাহরণ হল হাত পাখা, যার মধ্যে গৃহবধূর সামান্য পরিশ্রমের এক পরিশীলিত রুচিসম্মত আবেদন রয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন ক্লান্ত কোন অতিথির আগমন ঘটে তখন তাব সামনে যে হাতপাখাটি তুলে দেওয়া হয়, তা মামুলি তালপাতার তৈরি নয়। পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডেব নানান রঙিন পাড়ের সুতো দিয়ে একটা বাঁশের ফ্রেমকে অবলম্বন করে বোনা হয় এই পাখা, যার আকারটা দাঁড়ায় চৌকো, ছ কোণা বা গোলাকার, কখনও বা আদিবাসীদের ব্যবহৃত কুঠারের মত। অধিকাংশ স্থলে ফ্রেমবন্দী এগুলির এক একটি রঙিন সুতো সামান্য চওড়া করে বুনটের ফলে রামধনুর রঙের বাহার দেওয়া হয়ে দাঁড়ায়। বোনার মধ্যেও অবশ্য জামিতিক নকশাই ছিল প্রধান। সেজন্য কখনও কখনও ছোট ছোট চৌকো ঘরকাটা নকশাও তৈরি করা হয়। দু'এক ক্ষেত্রে ফুল ও পাখির বুনোটও যে থাকে না এমন নয়। সবশেষে পাখাটিকে সহজভাবে ঘোরানোর জন্য তার হাতলে সরু বাঁশের নল লাগানো থাকতো। এই শিল্পানুগ চিত্র বিচিত্র পাখা তৈরিতে যে বঙ্গললনারা উদ্যোগী হতেন তা বলাই বাহুল্য। অতিথির তৃপ্তিসাধনে এহেন সুতোর তৈরি বাহারে পাখা ঘর-গৃহস্থালির একটি সম্পদ হিসেবেই গণ্য হত। এইভাবেই বাঙালির ব্যবহারিক জীবনের এই বৈচিত্র্যবিলাসী মনের ছাপ রয়ে গেছে তার ঘর গৃহস্থালির সামগ্রীতে।
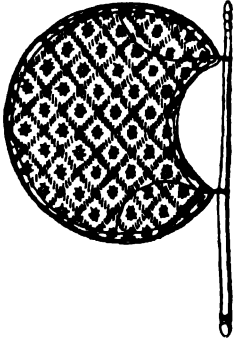
হাতপাখা

ঘ. শিকা-শিল্প

দেখা যায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনায়াসে যা দিয়ে কাজ চলে যেতে পারে তার বদলে সেখানেও কিছু না কিছু শিল্প সুষমার আরোপ বাঙালির স্বভাবে যেন মজ্জাগত। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহতল আলোকিত করা গেলেও দরিদ্র বাঙালি পিতলের পিলসুজ ব্যবহার করে এসেছে বরাবরই।

অনুরূপভাবে আহার্য দ্রব্য নিরাপদে রাখার জন্য বাঙালির ঘরে ঘরে এতদিন যে উপায় অবলম্বিত হয়েছে তার কোন বিকল্পের কথা সে কোনদিনই ভাবতে পারেনি। এরই ফলস্বরূপ ঘর-গৃহস্থালিতে বহু অলংকৃত 'শিকের' ব্যবহার অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হয়েছিল। গৃহস্থালির নানান খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ স্থানে তুলে রাখার জন্য এবং পশুপক্ষীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত রাখার জন্য ভাঁড়ার ঘরের কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত এইসব শিকেগুলিকে। শিকের এই বহুল প্রচলনের জন্যে গ্রাম্যলোকেরা কথায় কথায় 'শিকেয় ওঠা' অথবা 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে'—এসব কথা প্রয়োগ করতেন অবস্থার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে। এইসব শিকেতে রাখা হত নিচের দিকে বড়আকারের হাঁড়িআর তার উপরে উপরে ছোট ছোট হাঁড়ি। হাঁড়িগুলিও আবার বহুবর্ণ নকশায় রঞ্জিত করা হয়। কখনও আবার শিকেয় রাখা এইসব হাঁড়ি ক্রয় করা

হত স্থানীয় চিত্রকর-পটুয়াদের কাছ থেকে, হাঁড়ির গায়ে সুচিত্রিত নয়নাভিরাম নকশার জন্যে। অন্যদিকে এইসব শিকেয় থাকতো কালো রঙের তেলের দোনা।

শুধু শিকেয় রাখা পাত্রগুলিই চিত্র-বিচিত্রিত ছিল না, পাট বা শন দিয়ে তৈরি শিকের রজ্জুগুলিতে মনোমুগ্ধকর রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। তাছাড়া সেসময়ে শিকে তৈরি হত দু' ধরনের, একহারা শিকে ও ঝাড় শিকে। একহারা শিকেতে কেবলমাত্র বড় থেকে ছোট হাঁড়ি কুড়ি রাখা যেত। অন্যদিকে ঝাড় শিকেতে দেখা যায় মূল শিকের চারদিকে নিবদ্ধ হত অনেকগুলি শাখা শিকে যাতেও ছোটখাটো ভাঁড় বা পাত্র স্বচ্ছন্দে রাখা যায়।

একহারা শিকে ঃ আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ

শিকেগুলিও অলংকৃত করা হত বিচিত্র উপায়ে। খোসা ছাড়ানো আস্ত সুপুরি রঙিন সুতোয় জড়িয়ে নেবার পর নিপুণ সূচিকর্মের সাহায্যে আধফোটা ফুলের সৃষ্টি করে, দড়ির প্রত্যেকটি সংযোগস্থালে সেগুলিকে বেঁধে দেওয়া হত। এ ছাড়া ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতো থেকে আহৃত বিভিন্ন রঙিন সুতো দিয়ে শিকেগুলিকে অলংকৃত করা হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই শিল্পকর্মগুলি দৈনন্দিন ঘর-গৃহস্থালির কাজে তার একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই নয়নানন্দ বিধানেরও সহায়তা করেছে। বস্তুতপক্ষে গৃহস্থের কুটিরে এ জাতীয় সরঞ্জামই উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জার কাজ করে এসেছে এতদিন। অবশ্য আজকের গ্রামীণ সমাজ প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত হয়ে পড়ায় এই শিল্পবস্তুটির ব্যবহার লোপ পেয়েছে এবং আধুনিক এই নাগরিক পরিবেশে এহেন শিল্পের সমাদর কষ্ট কল্পনা হিসাবেই যে গণ্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
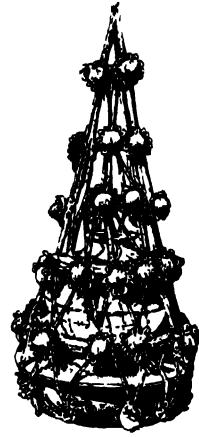
ঙ. চারবাটি

গৃহস্থ ঘরে আর একটি প্রয়োজনীয় গৃহশিল্প সামগ্রী ছিল 'চারবাটি'; অর্থাৎ একত্রে লাগালাগিভাবে তৈরি করা চারটি পোড়ামাটির খুরি ও তার সঙ্গে হাতলযুক্ত এই চারবাটিটি ভাঁড়ার ঘরে টাঙানো থাকতো। এটি রাখার উদ্দেশ্য ছিল, এটিতে নানান শাক-সবজির বীজ বা খুচরো পয়সা-কড়ি যাতে তুলে রাখা যায়।

পোড়ামাটির চারবাটি

চ. নকশি আসন

গৃহশিল্প সামগ্রীর আর একটি হল বসবার আসন। অতিথি আগমন বা আহার্য পরিবেশনের উদ্যোগ পর্বে অতিথির বসবার জন্য যে আসনগুলি বিছিয়ে দেওয়া হত, তার মধ্যে পুরনারীদের

সযত্নরচিত নিপুণ কারুকার্যের শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যেত। অবসর সময়ে গৃহস্থ রমণীরা পরিত্যক্ত কাপড়ের নানান রঙের পাড় থেকে তোলা সুতো দিয়ে এই বসবার আসনটি প্রস্তুত করতেন। অধিকাংশ সময়ে আসনগুলি করা হত সাদামাঠা পাতলা চটের উপর বুনন ও সেলাই দিয়ে, যার মধ্যে ফুল-লতাপাতা, কৃষ্ণরাধা বা পশুপক্ষীর অবয়বের সঙ্গে থাকতো জ্যামিতিক ধর্মী নানান নকশা। অতিথির মনে প্রসন্নতা উদ্রেকে এমন একান্ত সহায়ক আর কি হতে পারে?

ছ. মাদুর-শীতলপাটি

এছাড়া ঘর-গৃহস্থালিতে ছিল মাদুর। সরু কাঠির তৈরি বাহারে নকশাযুক্ত সে সব মাদুর। বাঙালি মাদুর তৈরি শিল্পীর পরশে সে সব বসবার বা শোয়ার আসন হয়ে উঠতো একান্তই শান্তির সুখাসন। এই সঙ্গে শীতলপাটির সূক্ষ্ম কাজের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেকালের গ্রাম-জীবনের অপরিহার্য ও সজীব শিল্পসাধনার এইসব নিদর্শনের মধ্যে আমরা বাংলার হস্তশিল্পের প্রথাগত ধারার সন্ধান পেতে পারি।

জ. কড়ির সাজ

দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে একদা রূপসৃষ্টির যে প্রেরণা বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে তারই একটি বিশেষ নিদর্শন হ'ল 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি'। ছোট ছোট বাঁশ বা বেতের চুপড়িকে লাল সালু ও অগণিত কড়ি দিয়ে অলংকরণ করে এই ঝাঁপিগুলি প্রস্তুত করা হত এবং সেসব কড়ির অলংকরণের মধ্যে অতি সুন্দর নকশা এবং ফুলের আকৃতি রচিত হত। ঝাঁপিগুলির তাই নিছক সৌন্দর্যমূলক আবেদনও সামান্য ছিল না। সিঁদুরের সঙ্গে দেবীর কাছে নিবেদিত রূপোর টাকা বা সোনার মোহর সযত্নে রক্ষিত হত এই ঝাঁপিতে। অন্যদিকে গৃহস্থবউদের সঞ্চয়ের মাধ্যম ছিল এই লক্ষ্মীঝাঁপি, যা তাকে সৌভাগ্যবতী সীমন্তিনীর একটা বড় পরিচয় দান করতো।
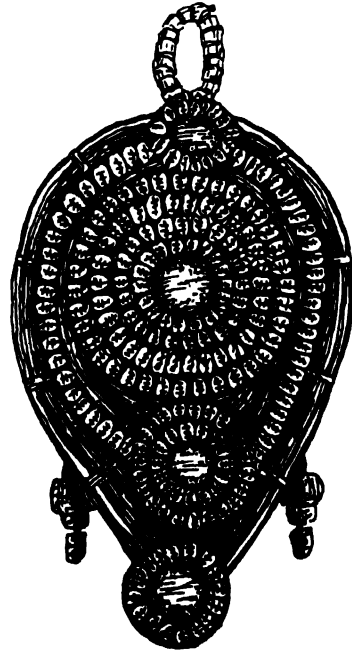
কড়িগাঁথা কৌটো : বীরভূম

এছাড়া একসময়ে ময়ূরের আকারে কড়ি গেঁথে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হত

আয়না, যা এক অপূর্ব শিল্প নিদর্শনে পরিণত হত। এ বাদেও ঘর গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত হত *কড়ি বসানো পানের কৌটো বা কলকাসদৃশ কড়ি গাঁথা কৌটো বা কড়ি বসানো আয়না।* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে একদা এই কড়ি শিল্পের প্রচলন ছিল। এইভাবেই বাংলার পল্লীকুটিরে শোভিত নানান গৃহশিল্প সামগ্রীতে যে রূপসৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল এক অনন্য শিল্পসৌন্দর্যে ভরা।

ঝ. কাগজ কাটাই নকশা

বিবাহ অনুষ্ঠানে যেমন পিঁড়ি, কুলো, এয়োসরা প্রভৃতি চিত্রিত করে আকর্ষণীয় করে তোলা হত, তেমনি বিবাহ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার বঙ্গ ললনারা সে সময়ে গৃহসজ্জার জন্য কাগজের উপর নরুন দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কেটে কেটে নানান নকশা বা ঠাকুর দেবতাদের মূর্তি খোদাই করতেন—যার মধ্যে তাদের শিল্পাভিমুখী মনেরই পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, একসময় গ্রামাঞ্চলে কোন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসর সজ্জার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত রঙ্গীন আয়তাকার পাতলা কাগজ, যেগুলির উপর নানান মূর্তি ও নকশা কাটাই করে দিতেন স্থানীয় সূত্রধর সম্প্রদায়।

কাগজ কাটাই নকশা
আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সংগ্রহ

ঞ. চন্দ্রপুলি ও আমসত্ত্বের ছাঁচ

বাঙালির অতিথি বৎসলতা এবং সম্মানিত অতিথিকে যে আহার্য পরিবেশন করা হবে—তা সে উপাচার যত সামান্যই হোক না কেন, তার মধ্যে কিছু না কিছু শিল্পসুষমা থাকবেই। পঞ্চব্যঞ্জন রন্ধনের মধ্যে যেমন তার রন্ধন কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ভোজনের শেষপর্বে গৃহিণীরা যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করতেন তার মধ্যে যে শিল্পচেতনার পরিচয় থাকতো

তা ছিল একান্তই বাঙালির গর্বের। একালের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের চটকদারি মিষ্টান্ন নয়, সেকালের বঙ্গবালাদের কৃত সে মিষ্টান্ন, যা ছিল স্বাদেন্দ্রিয় তথা দর্শনেন্দ্রিয় এক তৃপ্তিকর সম্ভার। সেজন্য সন্দেশ, ক্ষীরেব স্বস্তি, চন্দ্রপুলি, এমন কি নারকেল নাড়ু প্রভৃতি তৈরিতে সেগুলি সুদৃশ্য ছাঁচে ফেলে মনোমুগ্ধকর আকৃতির মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হত।

এইসব ছাঁচের আকার হত প্রায়ই জ্যামিতিক অর্থাৎ বর্গাকার, বরফি, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্ধচন্দ্র বা ওই ধরনেব। কোন কোনটির আকার ছিল সম্পূর্ণ বস্তুগত যেমন মাছ, লিচু, আতা ও শঙ্খ। আবার এর কোন কোনটি হত বাটির মত, কোনটি বা সমতল। ফলফলারি আর ফুললতাপাতার নকশা ছাঁচ তো ছিলই; এছাড়া ময়ূর, মাছ, পাখি বা ঘোড়া-হাতি এবং ব্রত আলপনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এমন অনেক ছাঁচ তৈরি করা হত। এছাড়াও তৈরি হত বাংলা পদ্যছন্দে বা সংস্কৃত ভাষায় দু'থেকে চার লাইনে উৎকীর্ণ উপদেশ বা সৎবাক্য সমন্বিত ছাঁচ। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছাঁচে বাংলা পদ্যছন্দে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ''মাটি হতে হইয়াছে মানুষের ভাব/সেইত মানুষ যার মাটির স্বভাব।'' আর একটি ছাঁচে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বেশ একটি কৌতুক কবিতা, 'মন ছটপট, মনরঞ্জন, মন রইল বোসে, চোখের জলে পিরিৎ গেল নরদসা দে ভেষে ভোক্ষনেম' ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক পর্বের ছাঁচের মধ্যে 'গাত্রহরিদ্রা', 'শুভবিবাহ', 'ফুলশয্যা', 'মিলনরাত্রি', 'সুখে থাকো' ইত্যাদি প্রতিলিপি উৎকীর্ণ করা ছাঁচের উল্লেখ করতে পারা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘর গৃহস্থালিতে সংগৃহীত হয়েছে কোন নিপুণ খোদাই শিল্পীর কাছ থেকে তৈরি করে আনা এমন শিল্পসৌন্দর্য সমন্বিত ছাঁচ, যাতে উৎকীর্ণ হয়েছে, চেয়ারে উপবিষ্ট সাহেব মেম বা ধূমপায়ী সাহেব প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গ্রাম বাংলার মেয়েরা ছাঁচের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' কথাটিও ব্যবহার করতে ভুলে যাননি। এক একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে সেই ক্রিয়াকর্মেও উপযোগী ছাঁচ ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত ছিল। গায়ে হলুদের তত্ত্বে যেমন ফলফলারি, ফুল-লতাপাতা ও পশুপক্ষীর ছাঁচ ব্যবহৃত হত, তেমনি ফুলশয্যার তত্ত্বে প্রজাপতি অঙ্কিত ছাঁচ সর্বদাই অগ্রাধিকার লাভ করত। আবার দীর্ঘলাঙ্গুল হনুমান নির্দিষ্টচিত্তে সন্দেশ ভক্ষণে রত-এরকম নকশাও দেখা গেছে। বলাবাহুল্য নতুন জামাইয়ের অভ্যর্থনায় শ্যালিকারা অথবা প্রবীণ বেহাইয়ের আপ্যায়নে রসিকা বেহানেরা যে এগুলি কাজে লাগাতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরিহাস প্রিয়তার সঙ্গে বাঙালির গৃহশিল্প সামগ্রীর এই শিল্প চেতনা— এই দুইয়েরেই মণিকাঞ্চণ যোগ বাঙালির জীবনকে করে তুলেছিল রসসমৃদ্ধ।

চন্দ্রপুলির ছাচ ঃ
আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সংগ্রহ

সন্দেশ বা চন্দ্রপুলির মত বঙ্গললনারা আমসত্ত্ব তৈরি করতেন বড় থালার আকারের ছাঁচে ফেলে। আম বাংলার ফল এবং সন্দেশ-চন্দ্রপুলিও বাংলার খাদ্য এবং এই ভিন্নতা লক্ষ করা যায় তার আকারের দিক থেকে। আমের সহজলভ্যতার জন্যে আমসত্ত্বের ছাঁচ তো বড় হতেই হবে।

সন্দেশ বা আমসত্ত্বের এই ছাঁচগুলি তৈরি করা হয় মাটি দিয়ে পরিকল্পনামত ফলক বানিয়ে। আমসত্ত্বের ছাঁচের বেলায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত নরম পাথরের থালার উপর নরুন দিয়ে খোদাই করে তৈরি। মাটির যে ধরণের ছাঁচ তৈরি করা হবে, সেটির পরিকল্পনামত আকার অনুযায়ী নরম কাদা দিয়ে একটি ফলক তৈরি করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এবার নরুন দিয়ে কেটে কেটে সেই ফলকটির উপর তোলা হয় প্রার্থিত নকশাটি। এছাড়া ছোট ভাঙা পাথরবাটির নিচের অংশে নরুন দিয়ে কেটে কেটে ছাঁচও বানাতেন সেকালের গৃহলক্ষ্মীরা। শিল্পজ্ঞান ও কারিগরি বুদ্ধির সংমিশ্রণে পল্লীবালারা যে শিল্পসৃষ্টি করেছেন তা আজকের যুগে গ্রাফিক আর্টের শিল্পবুদ্ধির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গৃহশিল্পসামগ্রী পর্যায়ে আমরা আলপনা, কাঁথা এবং অন্যান্য শিল্পকর্মে যে সব নকশা সচরাচর দেখে থাকি, তার সব ধরনই কিন্তু এইসব ছাঁচে দেখা যায়। বস্তুর মাধ্যম হয়ত পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার রূপবৈচিত্র্যে তফাৎ ঘটেনি। আসলে বাঙালি রমণীর হাতে খোদাই করা ছাঁচ বাংলার আলপনা ও কাঁথার নকশা থেকে অভিন্ন এবং অভিন্ন এই বঙ্গসংস্কৃতি থেকেও।

মোটামুটি এই হল বাঙালির গৃহশিল্প সামগ্রীর উপকরণ। দীনেশচন্দ্র সেন সত্যিই বলেছিলেন, 'বাংলার পল্লী, দরিদ্র পল্লী—এইভাবে ভরপুর প্রেমের তপস্যায় শিল্পসমৃদ্ধ ছিল; এইজন্য বাংলার প্রত্যেক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল।' কিন্তু দুঃখের কথা, বিগতকালের অবসর, প্রাচুর্য আর প্রশান্তির মাটি বঙ্গললনাদের পায়ের তলা থেকে আজ সরে গেছে। তাই আজ গৃহশিল্প সামগ্রীর মধ্যে বঙ্গীয় কলালক্ষ্মীদের কুশলী হস্তের যাদুস্পর্শ নেই, স্নেহপরায়ণ হৃদয়ের উত্তাপ নেই—যা দিয়ে সামান্য উপকরণ রূপান্তরিত হত অসামান্য কারুকৃতিতে। বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডার আজ তাই শুষ্ক। প্রচলিত রূপের জগৎ আর তার শিল্পচেতনা আজ মৃতপ্রায়। বঙ্গসংস্কৃতির এইসব অমূল্য উপকরণ আজ তাই স্থানান্তরিত হয়েছে মিউজিয়ামের বদ্ধ খুপরির মধ্যে। আমাদের অবস্থা আজ হয়েছে সেই রকম :

কাঠুরিয়া এক মানিক পেল
পাথর বলি ফেলে দিল
অভিমানে কাঁদছে মানিক
মহাজনে টের না পেল।

দীর্ঘশ্বাস পড়লেও এরকম একাধিক গ্রামীণ গৃহশিল্পসামগ্রীর অপমৃত্যু আমাদের বোধ করি সহ্য করতেই হবে।

পুতুল-খেলনা

বাংলার পুতুলের আকৃতি, তৈরি করার পদ্ধতি এবং রঙের প্রলেপ—এসবের মধ্যে এমন অনেক বৈচিত্র্য আছে যা একান্তই লক্ষ করার মত। এসব পুতুলের কারুকৃতি এক সরল বলিষ্ঠতায় প্রকাশমান এবং সেইসঙ্গে এক মনোমুগ্ধকর জীবনীশক্তিতে যেন দীপ্যমান। যদিও লোকশিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ কিছু পুতুলের অবয়ব ও গঠনে নিখুঁত বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আসলে পুতুলের ব্যবহার শিশুদের কাছে খেলনা হিসেবে। তাছাড়া নানান ধরনের বার-ব্রতেও পুতুলের প্রয়োজন হয়। ব্রত ছাড়া পুতুল উৎসর্গ করা হয় দেবতার কাছে মানত হিসেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুতুলের ব্যবহার যেন শিশুদের জন্যই বেশি করে সংরক্ষিত। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে শিশুকাল থেকে তাদের হাতে যে পুতুল তুলে দেওয়া হয়, সেই পুতুল নিয়েই শিশু তার পারিপার্শ্বিক জগৎ—দেবদেবী, পশুপক্ষী ও মানুষজনকে চেনার চেষ্টা করে এবং এই পুতুল খেলার মধ্য দিয়েই কন্যাদের হাতেখড়ি হয়ে থাকতো তাদের ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের স্নেহ-প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ জীবনচর্যায়।

বাংলার এইসব পুতুল তৈরির উপকরণ হ'ল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাটি। মাটি ছাড়াও কাঠের, শোলার, ন্যাকড়ার, তালপাতার, কাগজের ও চিনি দিয়ে পুতুলও তৈরি হয়। কিন্তু যে উপাদানের পুতুলই হোক না কেন, পুতুলের গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা এলাকাগত বৈশিষ্ট্য থাকে। এর কারণই হ'ল, পুতুল তৈরিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীদের অংশগ্রহণ, যার ফলে বিভিন্ন স্থানের নিজ নিজ সম্প্রদায়গত পুতুলের মধ্যে বেশ কিছু অবয়বগত বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং এক একটি এলাকার সম্প্রদায়গত পুতুলের আকার ও নানান ধরনের পুতুল নিয়ে পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্যক পরিস্ফুট হতে পারে।

ক. কাঠের পুতুল

একদা গ্রাম-গ্রামান্তরের বিভিন্ন মেলা-পার্বণে গৃহস্থের প্রয়োজনে লাগে এমন সব বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির জন্য আনা হ'ত। গ্রামীণ কুটিরশিল্পীরা তাদের তৈরি জিনিসগুলি এইসব মেলা প্রাঙ্গণে বেচাকেনার সুযোগে তাদের সারা বছরের ভাতভিতের সংস্থান করতেন। এইসব মেলায় অন্যান্য ঘর গেরস্থালির নানান জিনিসপত্রের সঙ্গে আসতো ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য নানান ধরনের পুতুল-খেলনা। আসতো কাঠের পুতুল, কুম্ভকারদের এবং চিত্রকর-পটুয়াদের তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের পুতুল। এর মধ্যে কাঠের যেসব পুতুল আসতো

তাব মধ্যে ছোট ছোট ১৫ সেমি থেকে ২২ সেমি পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট কাঠেব পুতুলগুলি দেখতে ছিল মিশবেব 'মমি'ব মত। সেজন্য শিল্পবসিকবা কোনকালে হযতএদেব নামকবণে ভূষিত কবেছেন মমি পুতুল বলেই, যা চলতি কথায দাঁডিযেছে মামি পুতুল, তবে শহুবে মানুষদেব অনেকেই বলে থাকেন কালীঘাটেব পুতুল।

কালীঘাটেব পুতুল বলাব একটা কাবণও আছে। কলকাতাব কালীঘাটেব কালীমন্দিবেব আশপাশে নানান পুজো-আচ্চা বা ঘব গেবস্থালিব প্রযোজনমত জিনিসপত্র নিযে যেসব মনোহাবী দোকান গডে উঠেছে সেখানেই পাওযা যেত এইসব কাঠেব পুতুল। মা কালী দর্শনার্থীবা দর্শন সেবে প্রযোজনমত জিনিসপত্রেব সঙ্গে ছেলেভোলানো এসব কাঠেব পুতুল কিনে নিযে যেতেন তাদেব শিশুদেব জন্যে। তাই কালীঘাটে পাওযা যেত বলেই এই পুতুলগুলিব নাম হযেছে কালীঘাটেব পুতুল। অন্যদিকে নবদ্বীপেও এই ধবণেব পুতুল পাওযা যেত বলে বলা হ'ত নবদ্বীপেব পুতুল।

থলে বসপুবেব (হাওডা)
কাঠেব পুতুল

কিন্তু খোঁজ নিযে জানা যাবে, এ পুতুল কালীঘাটে বা নবদ্বীপে পাওযা গেলেও তৈবি হয সেই সুদূব বর্ধমান জেলাব পূর্বস্থালীব কাছে নতুনগ্রামে। সেখানেব সূত্রধব সমাজেব মানুষজনেব তৈবি এই কাবুকৃতি আজ পাইকিবি ব্যবসাদাবদেব হাত দিযে এসে পৌঁছোচ্ছে এই চোখ ধাঁধানো কলকাতা শহবে। কিন্তু আজ শহুবে আমেজেব ধাক্কা এমনভাবে গ্রামেব দিকে ঠেলেছে যে, কালীঘাটেব পুতুলও হযত কেনাব দিকে কেউ তেমন হাত বাডাবে না। এইভাবেই হযত হাবিযে যাবে আব পাঁচটা সাবেকি ছেলেভোলানো পুতুলেব মত কালীঘাটেব এই কাঠেব পুতুল, যা আসতো অনেক ঘাম ঝবানো সূত্রধব শিল্পীদেব বঙিন তুলিব স্পর্শ পেযে সেই নতুন গ্রামেব পল্লী থেকে। (নতুনগ্রামেব পুতুল সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনাব জন্য 'পবিশিষ্ট-৯' অধ্যায দ্রষ্টব্য)।

তাহলে কালীঘাটেব পুতুল ছাড়া এ পুতুলগুলিকে কি পুতুল বলবো? দেখা যাচ্ছে, সব পুতুলগুলিই কিন্তু বউ বেশী। একসমযে পুতুল খেলায ছোট মেয়েবা বউ বউ খেলাব জন্য পুতুলগুলিকে সযত্নে তুলে রাখতো। এখন অবশ্য ছোট মেয়েদেব সে খেলা আব নেই। তাছাড়া অবসরই বা কোথায? তাহলে কি বলা যাবে বউ পুতুল, যা কিনা একেবারে ছেলেভোলানো পুতুল-খেলনার পুতুল। পুরুলিযাব শিল্পীদের কাছে এটির নাম আবার রানী পুতুল, যে নামেই ডাকা হোক্, বউপুতুল বা রানী পুতুল অথবা কালীঘাটের পুতুল, বলতে

গেলে সত্যিই পুতুলগুলি বেশ নজরকাড়া পুতুল। এ পুতুল হাতে নিয়ে অবশ্য অনেক কথা মনে হচ্ছে। সামান্য একটা কাঠের পুতুল, কিন্তু কত শিল্পীর দুবেলা দু মুঠো ভাত যোগাবার দায়িত্ব এর। সেকথা ভাবলেই মনে হয় কত জীবন্ত, কত প্রাণময় এই পুতুল — সেই রূপকথার গল্পের মতই। তবে গল্পের রূপকথার কাহিনী হলেও সে গল্পের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন বৃত্তির শিল্পীদের শিল্পচেতনার এক পরিচয় পাওয়া যায়। এ মজার গল্পটা শোনা গল্পের যাদুকর অবন ঠাকুরের কাছ থেকে (দ্রঃ বিশ্বভারতী কোয়াটারলি পত্রিকা, ১৯৩৫)।

গল্পটা হল, তারা চার বন্ধু মিলে যাত্রা শুরু করেছিল এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে জঙ্গলের এক রাস্তা ধরে। তারপর সন্ধ্যে নেমে এল; তখন চার বন্ধু একটা মনের মত গাছতলা বেছে নিয়ে সেখানে রাত কাটানো ঠিক করলো। তবে প্রহরে প্রহরে একজনের জাগার পালা— বাঘ-ভালুকের ভয় কিনা তাই। প্রথম পালা পড়লো ছুতোরের ছেলের। সে তখন জেগে থেকে করবে কি, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে তার একটুকরো কাঠ কেটে তার উপর খোদাই করে একটা কাঠের বউ তৈরি করে ফেললো। এক প্রহর শেষ হ'ল—এবার সাজওয়ালা বাড়ির বন্ধুটির জাগার পালা। সে যখন পাহারায় এলো!, তখন সেই কাঠের পুতুলটা দেখে তার গায়ে দিল রঙ্ চড়িয়ে। সোনালি রঙে ভরিয়ে দিল তার দেহ। হাতের তালুতে আর পায়ের পাতায় পড়লো গোলাপি রঙ, তারপর চোখ আঁকলো কাজল কালির তুলি দিয়ে সেই খঞ্জন পাখির চোখের মত ক'রে। আবার প্রহর শেষ হ'ল, এবার জাগলো তাঁতির ছেলে। সে দেখলো, আহা কি সুন্দর পুতুল, কিন্তু পরনের কাপড় নেই যে! তাই সে তাকে বাহারে কাপড় দিয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে তুললো। এবার শেষ প্রহরে রাজার ছেলের পালা। সে জেগেই দেখলো সামনেই এমন সুন্দর একটা কাঠের বউ পুতুল। তখনেই তার মনে পড়ে গেল একটা সাধুর কাছে শেখা মন্ত্র, যাতে মরাকে জ্যান্ত করা যায়। এখন সে ভাবলো তার এবার মন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখলে মন্দ হয় না। তাই সে বিড় বিড় করে আউড়ে দিল মন্ত্রটা। ব্যস্! হয়ে গেল এক টুকটুকে জীবন্ত বউ, রানীর মতই দেখতে তাকে। তারপর আর কি, পালকি এনে তাকে নিয়ে চলল রাজবাড়িতে।

গল্প হলেও ভাবতে হয় এটা কি নিছকই রূপকথার কোন গল্প? কিন্তু এ গল্পের মধ্যেই রয়েছে সেকালের শিল্পী সমাজ, আর রাজানুগ্রহের সম্পর্ক। এ গল্পটিতে দেখা গেল, শিল্প কিভাবে রাজমর্যাদা পেয়ে তার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে, গল্পের মূল সৃষ্টিকর্তা নায়ক সেই সূত্রধর সন্তান, যারা আজও কাঠের পুতুল বানিয়ে থাকেন। সুতরাং কাঠের এই পুতুল তৈরির গল্পও তো মিথ্যে নয়, যার এক ক্ষীণ অবশেষ তো এই কালীঘাটের কাঠের পুতুল, যা ছেলে ভোলানো রূপে তৈরি হয় বর্ধমান জেলার নতুন গ্রামে।

শুধু বর্ধমান জেলার নতুন গ্রামেই এই কাঠের পুতুল তৈরি হয় না। এ জেলার দাঁইহাট, পাটুলি, কাষ্ঠশালী প্রভৃতি গ্রামের সূত্রধর কারিগররা এখনও এসব পুতুল তৈরি করে থাকেন। অন্যদিকে কেবলমাত্র বর্ধমান জেলাতেই নয়, পশ্চিবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির সূত্রধর সম্প্রদায় এখনও এই ধরনের কাঠের পুতুল তৈরি করে স্থানীয় মেলায় বিক্রির জন্য আনেন। হাওড়া জেলায় দেখা যায়, আমতা থানার থলে-রসপুর গ্রামের কাঠের সূত্রধর কারিগররা এখনও

এই ছেলেভোলানো রঙিন পুতুল তৈরি করে থাকেন। পাশাপাশি হুগলি জেলায় একসময় শ্রীরামপুর ও চন্দননগরে তৈরি করা হ'ত এই কাঠের পুতুল। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মেলা-উৎসবে এখনও আমদানি হয় এই পুতুল; আসে দাসপুর, কানশোনা, আকুলষাঁড়া (থানা ঃ কেশপুর) এবং গড়বেতার নিকটবর্তী পাশাপাশি তিনটি গ্রাম ঝাড়বনী, হুমগড় ও রাউলিয়া থেকে। অন্যদিকে করগা শিল্পীদের তৈরি এ জেলার ঝাড়গ্রামের অদূরবর্তী রামগড়-ধরমপুর (থানা ঃ বিনপুর) গ্রাম থেকে তৈরি হয়ে আসে আর এক ধরনের কাঠের পুতুল, যা এক সময়ে বেশ চিত্র বিচিত্রিত ছিল, কিন্তু এখন শুধু দু'রঙের আঁচড় কেটে তৈরি হয়। আর সেগুলি দেখতেও হয় বেশ আদিম প্রকৃতির। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও বেলেতোড়ে তৈরি হয় এই কাঠের বউ পুতুল, যা একদা বেলেতোড়ের বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের তুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার চোড়দা, সেনেড়া ও বৃন্দাবনপুর গ্রামেও সূত্রধর কারিকররা তৈরি করে থাকেন এই বউ পুতুল। বীরভূমেও এক সময়ে সূত্রধর শিল্পীরা 'খ্যাঁদা পুতুল' নামে এই ধরনের পুতুল কেঁদুলি ও বক্রেশ্বরের মেলায় বিক্রির জন্য আনতেন। শুধুমাত্র এপার বাংলাতেই নয়, ওপার বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার গাঁয়ে-গঞ্জে একসময়ে এই ধরনের কাঠের পুতুল তৈরি হত, যার নিদর্শন রয়েছে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মের প্রদর্শনী কক্ষে।

তবে কাঠের পুতুল হলেও বিভিন্ন স্থানের শিল্পীদের তৈরি পুতুলের আকৃতির মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিকতার ছাপ। এ পুতুল কোথাও তৈরি হয় তিনকোণা আবার কোথাও অর্ধগোলাকার আকারে। রঙের লেপনেও ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার ঐতিহ্য অনুসারে নানা ধরনে চিত্র বিচিত্রিত করা হয়। পুতুলগুলি তৈরি হয় সাধারণ কাঠ থেকে। সে সব কাঠের মধ্যে আছে আমড়া, জিওল, শ্যাওড়া, ছাতিম ও শিমুল প্রভৃতি গাছের ডাল। এইসব গাছের ডাল কেটে এনে পরিমাপমত সেগুলি কাটাই-ছাঁটাই করে পুতুলের রূপ দেওয়া হয়। কাঠ খোদাইয়ের কাজ শেষ হলে সেগুলিকে শুকিয়ে নেবার পর শুরু হয় রঙ ধরানোর কাজ। সূত্রধর পরিবারের পুরুষরা সাধারণত কাঠ কেটে বাটালি দিয়ে পুতুলের অবয়ব দেন এবং বাড়ির মহিলারা রঙ লেপনের কাজ করে থাকেন। তেঁতুলবীচির আঠায় মেশানো হয় লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো আর মেটে রঙ। তারপর পুতুলের গায়ে রঙ ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগে দেশি প্রথায় রঙ তৈরি করে নেওয়া হত। যেমন হরিতকী, গিরিমাটি, হিংগুল, নীল, চকখড়ি ও ভুষোকালী। কিন্তু এখন আর দেশি প্রথায় তৈরি রঙের বদলে ব্যবহার করা হয় বাজার চলতি কেমিক্যাল রঙ। সে যাই হোক সেসব রঙের বলিষ্ঠ রেখার টানে টানে চোখ মুখ ও কাপড়ের ভাঁজ তৈরি করে পুতুলটিতে রূপ দেওয়া হয়। পুতুলগুলি খেলনারূপে ব্যবহৃত হলেও এর সহজ, সরল ও অনায়াসসিদ্ধ নির্মাণপদ্ধতি, গঠনকৌশল ও নানারঙের বিন্যাস একান্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কাঠের বউ পুতুল ছাড়াও নতুনগ্রাম ও বর্ধমানের অন্যান্য স্থানের সূত্রধর সমাজ তৈরি করে থাকেন কাঠের রঙচঙ-এ প্যাঁচা, গৌর নিতাই, রাজারানী ও রাধাকৃষ্ণ পুতুল। মেদিনীপুরে সূত্রধররা বউ পুতুলের সঙ্গে খেলনা হিসেবে তৈরি করেন কাঠের ঢেঁকি পুতুল। পুরুলিয়ার চোড়দার কারিকররা বউ পুতুলের সঙ্গে তৈরি করেন রাধাকৃষ্ণ পুতুল এবং এ জেলার অন্য দু'স্থানের সূত্রধর শিল্পীরা করেন রাজারানী পুতুল। কিন্তু এতসব করেও শিল্পীদের পেটের

ভাত ভিতের সংস্থান ঠিক মত হয় না। প্রথম তো, বাজারে নানান ধরনের প্লাস্টিক পুতুল আসায় এ পুতুলের চাহিদা কমেছে। তদুপরি চড়াদরে রঙ কেনার জন্য পুতুলের দর বাড়াতে হচ্ছে। তখন কাঠ ছিল সহজলভ্য, কিন্তু এখন কাঠ কিনতে হচ্ছে বেশ দাম দিয়ে, তাই দর উর্ধ্বমুখী। অন্যদিকে দর বাড়ার জন্য এ পুতুলের আগ্রহ কমতে শুরু করেছে। আগে যে পুতুলের দাম ছিল ১০ পয়সা এখন সেখানে দামের পড়তা দাঁড়িয়েছে ২ টাকা থেকে ৩ টাকা। তবু কিনা এ পুতুল শিল্পটি বলতে গেলে মেয়েলি শিল্প, তাই গ্রামীণ মেলায় কোনরকমে ওঠানামা দরে বেচাকেনার মাধ্যমে এটি টিকে রয়েছে বলতে হবে। সূত্রধর সমাজের অন্যান্য লোকজন শুধু স্থানীয় মেলার টানেই কিছু কিছু পুতুল তৈরি করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন মাত্র, অন্য সময় গরুর গাড়ির চাকা বা দরজা জানালা ইত্যাদি নানাবিধ কাঠের কাজ করে থাকেন। তদুপরি নানান পর্বে তারা প্রতিমা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

সুতরাং দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পল্লীবাংলার শিল্পমানসে বাংলার এই সূত্রধর সমাজের অবদান যে কত ব্যাপৃত ছিল তার অবশেষ আজও লক্ষ্য করা যায় ছেলেভোলানো কাঠের এই পুতুলগুলির মধ্যে, যা বাংলার লোকশিল্পের সামগ্রী হিসাবে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনাকে মহত্তর করে তুলেছে।

খ. পটুয়া-চিত্রকরদের পুতুল

বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্য এক পুতুলের দিকে দৃষ্টি তবে এটি হ'ল পোড়ামাটির চিত্রকর-পটুয়া সমাজের তৈরির মধ্যে এ সম্প্রদায় ঐতিহ্য ও ধারাকে আজও ও হাওড়া জেলার পটুয়া-অধিকারী সে কথা জেলার পটুয়া সমাজ আজও করেন, কিন্তু হাওড়ার পটুয়া ও প্রশস্থ গ্রামের পটুয়ারা শুধু আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। সে পুতুলগুলির শরীরের জমাট উজ্জ্বলতা, মুখ, চোখ, হাত পা

কেশববাড়ের (মেদিনীপুর) পটুয়া-পুতুল

এই কাঠের পুতুল ছাড়া আর আকর্ষণ করানো যেতে পারে। রঙীন পুতুল, যা স্থানীয় অবদান। পট অংকন ও পুতুল বাংলার লোকশিল্পের পুরাতন টিকিয়ে রেখেছেন। মেদিনীপুর চিত্রকর সমাজ যে এ গৌরবের অনস্বীকার্য। মেদিনীপুর পট আঁকেন, পুতুল তৈরি সম্প্রদায় বিশেষ করে চন্ডীপুর পুতুলই তৈরি করেন, পট যাই হোক্, এদের নির্মিত গড়ন, নানা রঙের প্রলেপের কাপড় পরবার ধরন, বসার দাঁড়াবার ও ছেলেকোলে করার বিচিত্র ভঙ্গি একান্তই দেখবার মত। সংক্ষেপিত অভিব্যক্তি এবং সরস ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সৃষ্ট এদের পুতুলগুলি লোকশিল্পের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত।

পটুয়া-চিত্রকর মহিলারা যেসব পুতুল গড়েন, সেগুলির অধিকাংশই অবশ্য ছাঁচে ফেলে। হাত টিপেও যে পুতুল করেন না এমন নয়। তবে যে ভাবেই তৈরি হোক না কেন, সেসব

পুতুলে থাকবে আকৃষ্ট করা নানাবিধ রঙের প্রলেপ। তাছাড়া এঁদের তৈরি পুতুলের শ্রেণীবিভাগও বড় বিচিত্র এবং তাদের নামগুলোও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন শিলেট পুতুল, হিংলি পুতুল, মুখোস পুতুল বা বড় পুতুল, ঝুমঝুমি পুতুল প্রভৃতি। হিংলি পুতুল তৈরী হয় হাতে টিপেটিপে। শিলেট পুতুল হল, যেসব পুতুলগুলিকে দেওয়ালের গায়ে ফলকের মত ঝুলিয়ে রাখা হয়। মুখোস পুতুলও সাধারণত মুখোসের ধরনে এবং আকারে ছোট বড় হয়ে থাকে। শিলেট ও মুখোস পুতুল গৃহসজ্জার জন্যই তৈরি করা হত। সবশেষে বড় পুতুল যা সাধারণত দুখোলে তৈরি এবং ১০ সেমি. থেকে ২৫ সেমি. পর্যন্ত উচ্চতাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

পটুয়া রমণীরা বিশেষ করে যেসব পুতুল তৈরি করে থাকেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বিভিন্ন প্রকারের মাছ, রুইমাছ থেকে চিংড়ি মাছ, বিড়াল, বাঘ, হাতি, গরু,ময়ূর, টিয়া পাখি, দাঁড়ে বসা জোড়া পাখি, কলসি কাঁখে বউ, পুরুষ ও নারীর মুখযুক্ত মুখোস পুতুল এবং দেবদেবীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী, শিবদুর্গা, কালী, দুর্গা, মোহন্ত সাধু প্রভৃতি। সবচেয়ে বিখ্যাত হল, কোমরে হাত ছেলে কোলে কেশববাড় ও নাড়াজোলের হিংলি পুতুল।

পুতুল তৈরির পদ্ধতিও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তৈরি পুতুলটি এত হাল্কা হয় যে, মনে হবে যেন কোন কাগজের তৈরি পুতুল। তাছাড়া হাল্কা করে তৈরি করতে হয় তার কারণ দূরদূরান্তরের মেলায় মাথায় বা বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে ভার বেশি যাতে না হয় সেজন্য কম ওজনের পুতুলের দিকেই নজর বেশি। যদিও বিষয়টা তুচ্ছ, কিন্তু জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানে এদের উদ্ভাবিত শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়। এমন হালকা পুতুল তৈরির পদ্ধতি হল, কাদার পাতলা রুটি তৈরি করে ছাঁচে ফেলে বানানো। সামনে ও পিছনে দু'খোল জোড়া দিয়ে তৈরি এসব পুতুলের গড়ন শেষ হলে রোদে শুকিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে নেওয়া হয়, তারপর রঙ ধরাবার পালা। (মাটির পুতুল তৈরির পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনার বিষয়ে আলোচনার জন্য 'পরিশিষ্ট-১০' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

রঙও তৈরি করা হয় সেই আদিম কালের প্রথানুযায়ী। ভুষো কালি, তুঁতে, মেটে সিঁদুর, হরিতাল, এলামাটি, গেরিমাটি, কাঠখড়ি আর আলতা—এই হ'ল রঙের উপকরণ। আজকাল অবশ্য দোকানের কেমিক্যাল রঙের উপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। রঙ ভালভাবে ধরানোর জন্য তেঁতুল বিচির কাই, বেলের বা নিমের আঠা প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়।

পুতুল তৈরির পর বিক্রয়ের জন্য মেলায় যায়। পটুয়া মেয়ে ও পুরুষেরা তখন মাথায় করে পুতুলের ঝুড়ি নিয়ে যান। অনেকক্ষেত্রে পটুয়ারা বাঁকে করেও বয়ে নিয়ে যান। স্থানীয় মেলায় চিত্র-বিচিত্রিত রাশি রাশি পুতুলের সমারোহ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেলায় সমাগত মানুষজনদের, বিশেষ করে শিশুদের। পিতামাতারা তাদের স্নেহভাজনদের জন্য পুতুল না কিনে মেলা থেকে ফিরে যান না। সেদিক থেকে পটুয়াদের খেলনা পুতুল গ্রাম্য জনসাধারণের এক বড় আকর্ষণ।

এত মেহনত করে তৈরি পুতুলের দামও কিন্তু সামান্য। বর্তমানে হিংলি পুতুলগুলি ২৫ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা; হাতিঘোড়া ও চিংড়ি বা রুইমাছ ১ টাকা থেকে ২ টাকা এবং বড়

পুতুলগুলিও ২ টাকা থেকে ৩ টাকা দরে বিক্রি হয়। আজকাল রঙের দাম এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় মহার্ঘ হয়ে পড়ায় বহুক্ষেত্রে আবার পুতুলগুলিকে পোড়ানো হয় না—শুকনো পুতুলের উপরেই রঙ চড়িয়ে দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর জেলায় পটুয়া-চিত্রকরদের পুতুল হিসাবে নাড়াজোলের পুতুলের নামই সুবিদিত। এছাড়া এ জেলার নির্ভয়পুর, শিউরি, কেশববাড়, চৈতন্যপুর, নয়া, গোলগ্রাম, হবিবচক, মুরাদপুর ও মাদপুর প্রভৃতি স্থানের পটুয়াবা এখনও বেশ কিছু পুতুল তৈরি করে থাকেন। হাওড়া জেলার চণ্ডীপুর, লিলুয়া ও প্রশস্থ গ্রামের চিত্রকর পটুয়ারা বিভিন্ন মেলার সময় নানা ধরনের পুতুল তৈরি করে করেন।

অন্যদিকে হুগলি জেলার পুইনান, তালচিনান ও মোড়া প্রভৃতি গ্রাম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আখড়াপুঞ্জী ও কঙ্কনবেড়ে, বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় ও গগড়া এবং বীরভূম জেলার পাঁকুড় হাস প্রভৃতি স্থানের চিত্রকর পটুয়ারা পুতুল তৈরিতে নিযুক্ত আছেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবিধ কারণে এইসব চিত্রকর-পটুয়াদের জীবন আজ ক্ষতবিক্ষত ও বিপর্যস্ত। উপজীবিকার ধরন থেকেই বোঝা যায় এই সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা খুবই নিম্নস্তরের। এক তো যুগের প্রয়োজনে প্লাস্টিক প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর মাধ্যমে ছেলে ভুলানো পুতুল তৈরি হচ্ছে। মেলা-পার্বণের আকর্ষণও তো ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়েছে। সমাজ রূপান্তরের এই ধাক্কায় পড়ে পটুয়া সমাজ আজ এক দুশ্চিন্তা ও আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি পুতুলের আর খোঁজ পড়বেনা। এমনি করেই আর পাঁচটা লোকশিল্পের মতই কাঠের পুতুল বা পটুয়াদের পুতুল যাই হোক না কেন, গ্রাম-গঞ্জের সব পুতুল শিল্পগুলি একদিন দেশ থেকে লোপাট হয়ে যাবে।

গ. রঙিন পুতুল

পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি পুতুল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কুম্ভকার সম্প্রদায় সহ অন্যান্য মৃৎশিল্পীরা নানাবিধ ছেলেভোলোনো রঙিন পুতুল নির্মাণ করে থাকেন।

বীরভূম জেলার রাজনগরের কুম্ভকার সম্প্রদায় যেসব পুতুল তৈরি করে থাকেন. তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, বউ পুতুল, কলসি কাঁখে পুতুল, পেট মোটা আহ্লাদী পুতুল, খেলনা, পাখি, পুতুল ও কৃষ্ণরাধা পুতুল প্রভৃতি।

হুগলি জেলার তারকেশ্বরে ক্ষুদ্রাকৃতি ৪ সেমি. উচ্চতা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি এক ধরনের হাতে টেপা পুতুল পাওয়া যায়, যেগুলি উজ্জ্বল সবুজ, নীল ও হলুদ বর্ণে রঞ্জিত এবং সেগুলির দেহের স্থানে স্থানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরিধান বস্ত্র প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনমত রঙে ডোরা কেটে অলংকরণ করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মজিলপুরে পাওয়া যায় বহুবর্ণ রঞ্জিত ছাঁচে তোলা নানান ধরনের মনোরঞ্জনকারী পুতুল। এখানের মৃৎশিল্পী মন্মথনাথ দাস একদা বিভিন্ন দেবদেবীর পুতুল

ছাড়াও তৈরি করতেন জমিদারবাবু, কলসি কাঁখে বধু, নর্তকী প্রভৃতি আকর্ষণীয় পুতুল। দেবদেবীর পুতুলের মধ্যে বনবিবি, দক্ষিণ রায়, গণেশ জননী, রাধা ও কৃষ্ণ, সত্যনারায়ণ ও জগন্নাথ-বলরাম-শুভদ্রা প্রভৃতি পুতুল উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মন্মথবাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র পাঁচুগোপাল দাসও সেই সাবেকি পুতুল তৈরির ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এখনও এখানে যেসব সুদৃশ্য রঙ্গিন পুতুল তৈরি হয় তার এক তালিকা 'পরিশিষ্ট-১১' অধ্যায়ে উল্লেখ করা গেল। এছাড়া এ জেলার বারুইপুর, শিবানীপুর, বড়িশা ও চাঁদপুরেও নানাবিধ রঙিন পুতুল তৈরি হয়ে থাকে।

মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকাতেও বেশ কিছু রঙিন পোড়ামাটির পুতুল পাওয়া যায়। অনুরূপ নদিয়া জেলার নবদ্বীপে বুড়ো শিবের সর্পফণাযুক্ত রঞ্জিত মুণ্ডমূর্তি উল্লেখ্য এক শিল্প নিদর্শন। এছাড়া বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা এলাকার বেশ কিছু স্থানে রঙিন পুতুল তৈরি হয়।

বুড়ো শিবের মুণ্ড মূর্তি
নবদ্বীপ, নদিয়া জেলা

মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি এলাকার গোয়ালিনী পুতুলগুলি বেশ আকর্ষণীয়। এ পুতুলের দেহের অংশ কুম্ভকারের চাকে তৈরি করার পর হাতে টিপে টিপে মুণ্ড ও দুটি হাত জুড়ে দেওয়া হয়। এ পুতুলের দুটি হাতের মধ্যে একটি হাত মাথায় রাখা দুধের কেড়ে ধরা ও অন্য হাতটি কোলের ছেলে ধরে রাখা অবস্থায় নির্মিত। গোটা পুতুলের দেহে রুপোলি রঙের প্রলেপের উপর দেওয়া হয় কালো ও লালের আঁচড় যা কাপড়ের ভাঁজ ও গহনা প্রভৃতির চিহ্ন হিসাবে দর্শিত।

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় টুসু উৎসবের সময় পাওয়া যায় পনের থেকে সতের সেমি. উচ্চতাবিশিষ্ট রঙকরা এবং রঙিন কাগজ সাঁটা টুসু পুতুল, যা অবিকল নতুন গ্রামের কাঠের পুতুলের মত সাদৃশ্যযুক্ত।

আর এক ধরনের উপবিষ্ট হুঁকো কলকে হাতে বৃদ্ধের প্রতিরূপে মাথা নাড়ানো পুতুল বিভিন্ন স্থানের মেলায় কিনতে পাওয়া যায়, যা শিশু মনোরঞ্জন করার পক্ষেই যথেষ্ট।

কলকাতার কুমোরটুলি ও কালীঘাটে এখনও তৈরি হয় রঙ করা নানান ধরনের পুতুল। এছাড়া দৃষ্টিনন্দন রঙিন পুতুলের আর একটি বড় কেন্দ্র হ'ল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী ঘূর্ণি এলাকা। তবে এখানের শিল্পীরা একান্তই বস্তুতান্ত্রিক। একদা রাজ অনুগ্রহে এরা তাদের শিল্পের মধ্যে প্রথাগত ধারাটির বদলে বাস্তবের প্রতিবিম্বকে তুলে ধরেছেন, যা আজও চলছে। অর্থাৎ শিল্পীরা যেমন বস্তুটি জগতে আছে ঠিক তেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন রঙ ও তুলির আঁচড়ে। ফলে বাস্তবসম্মতভাবে পুতুল তৈরির জন্যে শিল্পীর যে মেহনত লেগেছে তার যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা নেই বলে বিত্তবানদের কাছেই এদের

পুতুল বেশি সমাদৃত হয়েছে। একই গোত্রের কুমোরটুলির পুতুল সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলে চলে। মোটকথা এখানে তৈরি পুতুলগুলির মধ্যে লেকাশিল্পজনিত বৈশিষ্ট্যের অভাব হলেও একান্তই মনোমুগ্ধকর।

ঘ. কুম্ভকার শিল্পীদের পুতুল

পুতুল তৈরির আর এক কারিগর হলেন কুম্ভকার সম্প্রদায় এবং উল্লেখ্য যে তাদের তৈরি পুতুলগুলি হ'ল বিশেষ করে নারীকেন্দ্রিক। পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামে বসতকারি এইসব কুম্ভকাব সমাজ মাটির নানাবিধ মৃৎপাত্রের স্রষ্টা হলেও, তারা যেসব পুতুল তৈরি করেন সেগুলির বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। এদের এইসব পুতুল নির্মাণ কৌশল দেখলে মনে হয়, মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেসব প্রাচীনতার লক্ষণযুক্ত পোড়ামাটির পুতুল বা মৃৎফলক আবিষ্কার করেছেন, সেগুলির সঙ্গে বর্তমানের কুম্ভকার শিল্পীদের কৃত পুতুলের মধ্যে যেন এক প্রবহমান সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

মেট্যালা গ্রামেব পুতুল
জেলা বাঁকুড়া

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পোড়ামাটিব এই পুতুলের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্টেলা ক্রামরিশ একদা লিখেছিলেন যে, ভারতে দু'ধবনের পুতুল পাওয়া যায়, যার একটি হল সময়োচিত ও অন্যটি হ'ল কালোত্তীর্ণ। সময়োচিত পুতুলের মধ্যে দেখা যায় সমকালীন বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যেব ছাপ, যাকে ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। অন্যদিকে এরই পাশাপাশি অন্য আর এক ধরনের পুতুল পাওয়া যায় সেগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রাক্ সিন্ধুসভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—সেজন্য যাকে বলা যেতে পারে কালোত্তীর্ণ পুতুল। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বাংলার বিভিন্ন স্থানে এখনও এই ধরনের বেশ কিছু পুতুল পাওয়া যায় এবং এই কালোত্তীর্ণ পুতুলগুলি বার-ব্রত ও শিশুদের খেলার বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কুম্ভকারদের পুতুলগুলির অধিকাংশই হয় হাতে টিপে বা কতক হয় ছাঁচে তুলে, তবে সবই হয় পোড়ানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুতুলের গায়ে রঙ চড়ানো হয় না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেঁতুল বিচির কষের সঙ্গে অভ্রের গুঁড়ো মেশানো লালচে রঙ প্রয়োগ করা হয়। আজকাল আবার কয়েকস্থানের কুম্ভকাররা সাদা রঙের প্রলেপের উপর সবুজ, নীল ও লাল রঙের নকশা করে থাকেন।

কুম্ভকার শিল্পীরা যেসব পুতুল তৈরি করেন তার মধ্যে প্রধান একটি হল ক্ষুদ্রাকার নাকটেপা পুতুল। এসব পুতুলের নাকের দু'পাশে গোলাকার ছোট্ট মাটির টিপ সেঁটে দিয়ে
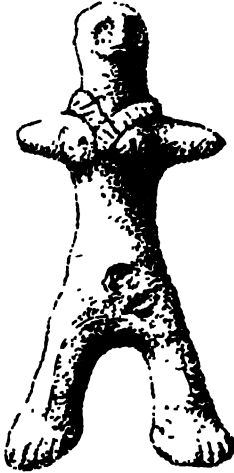
চোখের মণি এবং দাগ টেনে কাপড়ের ও গলার ভাঁজ প্রভৃতি করা হয় এবং হাতদুটি হয় প্রতীকীভাবে দর্শিত। আবহমান কাল ধরে ছোট ছোট মেয়েদের পুতুল খেলার জন্য প্রস্তুত এই যে ছোট ছোট পুতুল তৈরি হয়ে থাকে, সেগুলি সাধারণত উচ্চতায় হয় ৬ থেকে ৭ সেমি.। বর্তমানে হাওড়া জেলার পাতিহাল, নিজ বালিয়া, সড়িয়ালা-বালিপোতা, বাঁটুল, কালিকাপুর; তাঁতিবেড়ে, মেদিনীপুর শহরের মির্জাপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপা-দেবালয়, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও মেট্যালা প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকার সম্প্রদায় এই শ্রেণীর পুতুল তৈরিতে অদ্বিতীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ব-কথিত মেট্যালার এই ধরনের মাটির পুতুলের গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে আদিমতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে তা লোকশিল্পের এক সার্থক নিদর্শন। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ এলাকার ও বিষ্ণুপুরের কুম্ভকার সম্প্রদায়ের তৈরি এই রীতির হাতে টেপা পুতুলগুলির গঠন শৌকর্য আবার ভিন্নতর এবং বেশ দৃষ্টিনন্দন। হাওড়া জেলার পাতিহালের এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পুতুল ছাড়া ১২ থেকে ১৬ সেমি. উচ্চতার বড়ো আকারের হাতে টেপা পুতুলগুলিও এই সমগোত্রীয়। এসব পুতুলে পা থাকে না, বদলে যেন কোমর থেকে ঘাগরা ঢাকা, হাত যাও বা থাকে তাও সামান্য। কাদার ডেলা দিয়ে চোখের মণি, কাদার লেত্তি সেঁটে গলায় ঝোলানো অলংকার এবং আঁচড় কেটে খোঁপা ও বস্ত্রের অলকরণ করা হয়।

ষষ্ঠী পুতুল
পাঁচমুড়ো, বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কয়েক শ্রেণীর পুতুলের গঠন প্রকরণে ষষ্ঠী দেবীর প্রতীকরূপিনী 'মা-পুতুল'টি হলো আর এক উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পের নিদর্শন। এ পুতুলও তৈরি হয় আঙুলে টিপে, আবার ছাঁচও যে ব্যবহার হয় না এমন নয়। এই ধরনের ষষ্ঠী পুতুলের উল্লেখযেয়াগ্য প্রাপ্তিস্থান হ'ল, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ো গ্রাম। সেখানের কালো রঙের এইসব ষষ্ঠীপুতুলের কোলে দেখা যায় দুটি অথবা চারটি বা বহুসংখ্যক শিশু সন্তানের প্রতিকৃতি। এ পুতুলের মাথার দিকে থাকে একটি অর্ধবৃত্তাকার চালি। তবে এ পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত সাদৃশ্যের দিকে শিল্পীরা তেমন নজর দেননা—মোটামুটি একটা আদল এনে সম্পূর্ণ করেন। চোখ বা অলংকার কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির ডেলা বা লেত্তি সেঁটে দিয়ে তৈরি করা হয়। পাঁচমুড়ো ছাড়া বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও রাজগ্রামেও এই ষষ্ঠী পুতুল তৈরি হয়, তবে সেগুলি হয় লাল রঙের। এছাড়া হুগলি জেলার আরামবাগের কুমারগঞ্জ এলাকাও ষষ্ঠী পুতুল তৈরির এক কেন্দ্র।

উল্লিখিত পাঁচমুড়োর আর একটি উল্লেখযোগ্য পুতুল হ'ল 'রেল পুতুল'। অনেকগুলো কামরা নিয়ে যেমন রেলগাড়ি চলে তেমনি একটা সমতল ফলকের উপর পরস্পরের কাঁধে হাত রাখা অবস্থায় তিন চারটি টেপা পুতুল বসিয়ে এই রেল পুতুল তৈরি করা হয়েছে।

আসলে দেখা যায়, এই বিষয়বস্তুটিতে লোকশিল্পের ব্যঞ্জনা বেশ বলিষ্ঠভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

েল পুতুল ঃ পাঁচমুড়ো, বাঁকুড়া

একসময়ে হাত টিপে লালরঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিমধর্মী এক ধরনের মেয়ে পুতল তৈরি হ'ত অবিভক্ত বাংলার পাবনা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে। এই পুতুলগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল তার মুখমণ্ডল, যা জীবজন্তুর মুখের অনুকরণে তৈরি এবং কখনও সে পুতুলের গড়নে দেখা যায় ছেলে কোলে, কখনও বা দু'কাঁকালে কলসি অথবা কখনও পা ছড়িয়ে বসা অবস্থায়, যার উপরে শোয়ানো থাকে তার শিশুসন্তান। এ পুতুলের মাথার বেণী ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দাগ টেনে অলংকৃত করা হলেও দেহে নিবদ্ধ গয়নাগুলি কাদার লেত্তি সেঁটে এবং চোখের মণি কাদার টিপ লাগিয়ে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুতুলটি প্রস্তুত করা হয়, তা এক চিত্তাকর্ষক লোকশিল্পের উদাহরণ।
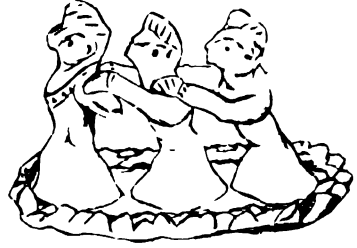
দেশবিভাগের পর এখানকার কুম্ভকার শিল্পীরা অসমের গোয়ালপাড়া ও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে চলে আসেন। ফলে রায়গঞ্জে বসতকারি শিল্পীরা এই প্রথাগত পুতুলের ধারাটিকে আজও টিকিয়ে রেখেছেন; এখনও এখানে ঐ ধরনের ছেলে কোলে মা পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া রায়গঞ্জের কুম্ভকার পল্লী এলাকার শিল্পীদের তৈরি আরও কয়েকটি পুতুল হ'ল, মাথায় বহনকৃত ঝাঁকাতে অথবা মাথায় হাত এবং কোমরে আর এক হাত রাখা পুতুল। ঠিক এই ধরনের আর একটি পুতুল এখানের শিল্পীরা তৈরি করেন, তবে সে পুতুলটি পলিয়া-রাজবংশীদের অনুকরণে পিঠে ছেলে বহনকারী মহিলাদের প্রতিরূপ।
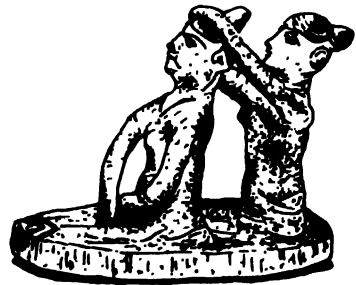
সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী আর একটি পুতুল তৈরির কেন্দ্র হ'ল, মুর্শিদাবাদ জেলার চৌড়িগাছা-কাঁঠালিয়া গ্রাম। এখানকার কুম্ভকার সম্প্রদায়ের তৈরি পুতুলগুলি হ'ল, মেয়েদের চুল বেঁধে দিচ্ছে, কখনও বা উকুন বেছে দিচ্ছে তার সঙ্গী, যাঁতায় দু'জন মহিলা মিলে ডাল-কড়াই পেষাইরত, ঘোড়সাওয়ার, হাতিসওয়ার ও গোয়ালিনী প্রভৃতি পুতুল। বিষয়-বৈচিত্র্যে অতুলনীয় কাঁঠালিয়ার এই পুতুলগুলি পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পকলার এক ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টান্ত।

কাঁঠালিয়া গ্রামের পুতুল ঃ মুর্শিদাবাদ

হাতে টেপা এসব পুতুল ছাড়াও প্রথাগত দুখোল ছাঁচে তৈরি পুতুলেরও নির্মাতা বিভিন্নস্থানের কুম্ভকার সম্প্রদায়। যেহেতু এগুলি কুম্ভকারদের কৃত তাই অনেকে বলেন কুমোরে

পুতুল, যা অপভ্রংশে দাঁড়িয়েছে কুমিরে পুতুল। আসলে কিন্তু এ সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বলেন 'রানী পুতুল'। এ পুতুলের আবার পা নেই, দেহের দু'পাশ লাগানো হাত দুটিও সামান্য আকারের, তবে ঘাগরা পরা যৌবনের দীপ্তি সমন্বিত। মাথায় থাকে কোঁকড়া চুল। রানী নাম সার্থক করার জন্য কোন কোন স্থানের এই ধরনের পুতুলগুলির মাথায় থাকে মুকুট এবং গলায় ঝুলতে থাকে অলংকার হিসেবে ঝোলানো হার। গায়ে অবশ্য অভ্রমেশানো লালরঙের প্রলেপ লাগানো হয়। আর সে রঙ করার পদ্ধতিও বিচিত্র। পোণে পুড়িয়ে নেবার পর অভ্র মিশ্রিত তেঁতুল বিচির কষে গোলা জলে এইসব পুতুলগুলিকে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। পরে আবার লাল রঙে চুবিয়ে নিলেই পুতুলগুলি উজ্জ্বল বর্ণময় হয়ে ওঠে। এই ধরনের পুতুল তৈরি হয় বিশেষ করে হাওড়া জেলার পুইল্যা, তাঁতিবেড়ে, বাঁটুল, তুলসীবেড়ে, ঘুঘুবেশে, সীতাপুর, দুর্গাপুর, সড়িয়াল-বালিপোতা ও পাতিহাল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুজালি ও ডোঙ্গাড়িয়া এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক এলাকার নানাস্থানের কুম্ভকার পল্লীতে।
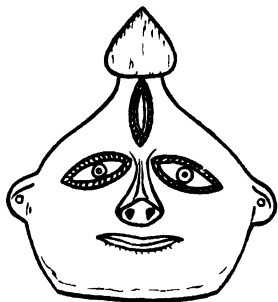
পাঁচমুড়োব 'বোঙা' পুতুল

আর একটি নজরকাড়া পুতুল হ'ল ঘোড়া বা হাতির পিঠে চাপা পুতল। অশ্বারোহী ধরনের পুতুল পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলায় পাঁচমুড়ো, মালদহ, মেদিনীপুর মির্জাবাজার, মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়া ও কাঁদি, হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়ে, পাতিহাল, ঘুঘুবেশে ও সীতাপুর এবং পুরুলিয়া জেলার নানাস্থানে। আসলে এইসব মৃৎশিল্প কেন্দ্রে তৈরি পুতুলগুলোর সবই হয় হাতে টিপে। অনেক সময় সাদা প্রলেপের উপর লাল-কালো ডোরাও টেনে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, অশ্বারোহী পুতুলের মত হাতির পিঠে চাপা সওয়ারি পুতুলও দেখা যায় নানাস্থানের কুম্ভকার পল্লীতে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের কাঁদি ও হাওড়ার পাতিহালের পুতুলগুলি উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়োয় আবার দেখা গেছে বাঘ অথবা বাঘের পিঠে চড়া সওয়ারি পুতুল। হয়ত একসময় বাঘের উপদ্রবে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের উদ্দেশে নিবেদিত হ'ত এই পুতুল। এছাড়া, পাঁচমুড়োয় হাতে টিপে তৈরি হয় 'বোঙা পুতুল', যা সাঁওতাল আদিবাসীদের দেবতা। মেদিনীপুর জেলার মির্জাবাজারের কুম্ভকাররা এক ধরনের গয়লানি পুতুল তৈরি করে। সে পুতুলের একহাত থাকে কোমরে, অন্য হাতে কাঁকালে চেপে ধরা দুধের কেঁড়ে। কখনও বা কেঁড়ের পরিবর্তে কোলে ছেলে থাকে। মাথায় থাকে চুড়ো করে বাঁধা চুল। পুতুলগুলো হয় দশ থেকে পনের সেমি. উচ্চতাসম্পন্ন এবং এ পুতুলগুলিকে বলা হয় 'চিরকুন' পুতুল। অনেক সময় এই ধরনের আর এক পুতুল এখানে তৈরি হয়, যে পুতুলে একহাত থাকে মাথায় আর এক হাত কোমরে। মুখটির অবয়ব হয় গরুর মুখের মত, হয়ত বা গোমাতার প্রতিকৃতির অনুকরণ।

ছেলে ভোলানো পুতুলের মধ্যে পশুপাখি ও জীবজন্তুর এমন অসংখ্য পুতুল এক সময় তৈরি হত বিভিন্ন কুম্ভকার পল্লীতে। সে তালিকায় ছিল কুমির, ময়ূর, টিয়া, হাতি, ঘোড়া, গরু, বাঁদর, ভালুক, বাঘ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের পুতুল। কিন্তু চাহিদার অভাবে এসব পুতুলের উৎপাদন ক্রমশই কমতির দিকে।
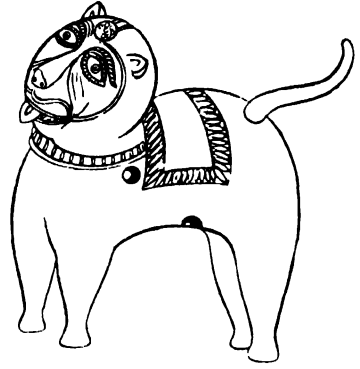
পাঁচমুড়োব বাঘ পুতুল

হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের কুম্ভকার শিল্পীরা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য চাকা লাগানো নৌকো পুতুল যেমন তৈরি করেন সেইসঙ্গে পাল্কি পুতুলও। বালিকাদের পুতুল খেলার সরঞ্জামের মধ্যে ছোট পুতুল আর সেই সঙ্গে চাই পাল্কি। এইসব পাল্কিতে সাধারণত কোন রঙ লাগানো হয় না; তবে আবার কোথাও কোথাও সাদারঙের প্রলেপের উপর হলুদ, সবুজ ও নীল রঙের মোটা দাগের নকশাও করে দেওয়া হয়। হাওড়া জেলায় পাল্কি পুতুল তৈরির কেন্দ্র হ'ল পাতিহাল, নিজবালিয়া, ঘুঘুবেশে, সীতাপুর ও বাঁটুল প্রভৃতি স্থান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, পাল্কির মত বালিকাদের ঘরকন্নার নানান উপকরণ হিসাবে এক সময়ে কুম্ভকার শিল্পীরা তৈরি করতেন ক্ষুদ্রাকার আয়তনের পোড়ামাটির বাটনা বাটার শিল-নোড়া, থালা-গেলাস, হাঁড়ি-কলসি, ধামা-কুলো, বেলুন-চাকি, কড়াই-উনুন প্রভৃতি।

ঠিক পুতুল না হলেও, গৃহস্থ পরিবারের প্রয়োজনীয় গৃহশিল্প সামগ্রী হিসাবে একদা কুম্ভকাররা নির্মাণ করতেন 'চারবাটি'। এটির উদ্দেশ্য ছিল, গৃহস্থেরা যাতে নানান ধরনের বীজ তুলে বা সেই সঙ্গে খুচরো পয়সা-কড়ি রাখতে পারেন। সেজন্য গৃহস্থের ভাঁড়ার ঘরের কড়িকাঠে দড়ি দিয়ে অথবা মাটির ঘরের দেওয়ালের গোঁজে এই চারবাটিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। এই চমকপ্রদ পাত্রটি তৈরি হ'ত চারটি ছোট মাটির খুরি একত্রে জুড়ে এবং তার উপরে থাকতো একটি অর্ধগোলাকৃতি হাতল। হাতলটির দু'পাশের শেষপ্রান্তে আবার উৎকীর্ণ করে দেওয়া হত ময়ূরের মুখ। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার হাতলের মধ্যস্থলে বসানো হ'ত একটি ছোট বাটি। অনেক সময় সাদা খড়ির প্রলেপের উপর নীল বা খয়েরি রঙের মোটা দাগের অলংকরণ করে দেওয়া হ'ত, কখনও বা অভ্রমেশানো লালরঙে শোভিত হ'ত। একদা হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের এবং মেদিনীপুর জেলার মির্জাবাজারের কুম্ভকার সম্প্রদায় এগুলি তৈরি করে হাটে-বাজারে বা মেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে আসতেন। বর্তমানে এই শিল্পটি লুপ্ত বললেই চলে।

ঙ. চাকা লাগানো খেলনা-পুতুল

ভারতের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে খননকাজ করে যেসব পুতুল বা ছোট-খাটো মূর্তিকা প্রভৃতি পাওয়া গেছে, সেগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের গ্রাম্য কুম্ভকারদের

তৈরি পোড়ামাটির নানাবিধ পুতুল-খেলনাগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে মিলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায়, আবহমানকাল ধরে এক প্রথাগত শিল্প ধারা যেন প্রবহমান রয়েছে। শুধু তাই নয় সাবেব কালের পুতুল-খেলনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রাচীনকাল থেকে আজকের সময়ে প্রবহমান ভারত সংস্কৃতির সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির উপর ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য আলোকপাত করতে পারে।

তিবিবেড়েব (হাওড়া) পুতুল

অনুরূপ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, বেড়াচাঁপা, পান্না ও হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকাজের ফলে যেসব মূর্তিকা, পুতুল ও খেলনা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির গঠনভঙ্গিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বাংলার লোকশিল্পও সম্ভবত প্রাচীন কালের সেইসব শিল্পীদের শিল্প-ভাস্কর্য ধারার কাছে বহুলাংশে ঋণী। কেননা এইসব পুরাতাত্ত্বিক স্থানগুলিতে যেসব হাতি, পাখাওয়ালা হাতি, হাতিতে চড়ে বসা হাতি সওয়ারের মূর্তি, ষাঁড়, ভেড়া বা ভেড়ার উপর বসা মূর্তি, ঘোড়ায় টানা রথের উপর বসা মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেছেন যে, সম্ভবত এসব মানুষ বা পশুর আকৃতিযুক্ত পুতুলগুলি সেকালে ছেলেমেয়েদের খেলনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। অন্যদিকে আমাদের বাংলায় মৃৎশিল্পীরা এখনও এই ধরনের কুকুর, ষাঁড়, ভেড়া, ঘোড়া, হাতি ও পাখি ইত্যাদি খেলনা-পুতুল ঐ পুরাতন ধাঁচেই তৈরি করে চলেছেন। এদের তৈরি এসব খেলনা-পুতুলগুলির নির্মাণ কৌশল ও আকৃতির মধ্যে একটা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে প্রবহমান রয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।
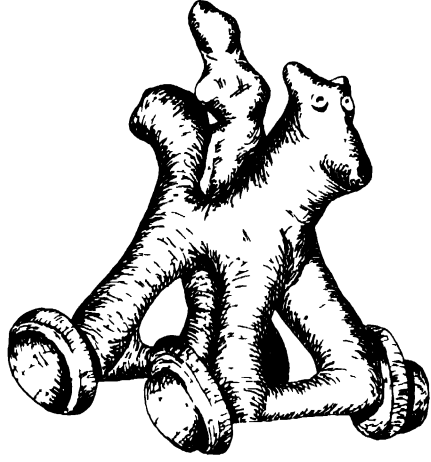
সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপা এলাকার চন্দ্রকেতুগড় থেকে একটি পোড়ামাটির খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে, যা নির্মাণশৈলীগতভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, সেটি কুষাণযুগে নির্মিত। এ চাকা লাগানো পুতুলটি হল, বাঘের পিঠের উপর রাখা ক্ষুদ্রাকার মন্দিরের মধ্যে উপবিষ্ট এক পুরুষ মূর্তি। দেবপালের নালন্দা তাম্রপট্টে, যে ব্যাঘ্রতটি-মণ্ডলের উল্লেখ আছে, এ মূর্তিটি যেন সেই ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র চন্দ্রকেতুগড়ে এ পুতুলটিই নয়, মেদিনীপুর জেলার তমলুক, ২৪ পরগনা জেলার হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানেও এমন অজস্র চাকা লাগানো খেলনা পুতুল পাওয়া গেছে, যা একান্তই কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রাচীনকালের এসব চাকা লাগানো পুতুলগুলি সেকালের ছেলেদের খেলার উপকরণ, না দেবতার কাছে নিবেদন করার জন্য কোন ধর্মীয় উপচার—এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে। অমাদের সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে এসব খেলনা গাড়িগুলির নির্মাণ পদ্ধতি। প্রাচীন শুঙ্গ-কুষাণ আমলে নির্মিত কোন এক মেষমূর্তির নিচেব দিকে দু'পাশে চাকা লাগাবার স্থান যেমন রয়েছে, তেমনি এটিব পিছনে পিঠেব উপর একটি ক্ষুদ্রাকার গর্তও রয়েছে, যাতে স্বচ্ছন্দে একটি লম্বা কাঠি বা বাঁশেব কঞ্চি গুঁজে দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঠেলে নিযে যেতে পারা যায়। সুতরাং এগুলি যে সেকালে শিশুদেব খেলনা গাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। অন্যদিকে ভাবত শিল্পের এইসব চাকা লাগান পুতুল-খেলনাগুলি আমাদের বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য মৃচ্ছকটিকে উল্লিখিত সেইসব খেলনা গাড়ির কথাই স্মরণ কবিযে দেয়।

অতএব সেকালেব এই ঢং-এ শিশুদেব মনোবঞ্জক চাকা লাগানো খেলনা গাড়ির ধারাবাহিকতা হয়ত আজ আর তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এই ধরনের খেলনা গাড়িব প্রচলন আমাদের শিশুদের জগৎ থেকে কিন্তু লুপ্ত হযনি। বাংলার কুম্ভকার পল্লীতে মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি ছাড়া আজও যেসব পুতুল-খেলনা তৈরি হয়ে থাকে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল, শিশু মনোবঞ্জক চাকা লাগানো পুতুল। এ বিষযে আগ্রহশীলদেব জ্ঞাতার্থে নিবেদন করা যেতে পারে যে, আজকের টিন ও প্লাস্টিকের পুতুল-খেলনা আমাদের শিশুদের জগতে ব্যাপকহারে আমদানির সঙ্গে পাশাপাশি এইসব গ্রাম্য শিল্পীদের পুতুলও যে হৃদয়গ্রাহী হিসাবে আজ অব্দি চলে আসছে, তা মেলায় আগত দেশীয় পুতুল শিল্পের সম্ভার দেখেই বোঝা যায়।

গ্রাম্য মেলায় যেসব মাটির খেলনা-পুতুল আমদানি হয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যান্য বিবিধ ধরনের পুতুল ছাড়াও থাকে চাকা লাগানো খেলনা পুতুল। এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার পাতিহাল গ্রামেব কুম্ভকার সম্প্রদায় আজও তৈরি করে থাকেন চাকা লাগানো হাতি বা ঘোড়া সওয়াব যুক্ত কোন পুতুল এবং চাকা লাগানো নৌকোর মাঝিসহ নৌকো-পুতুল। এগুলিতে দড়ি বা সুতোব লাগানোর জায়গা থাকে, যা দিয়ে শিশুরা সহজেই এগুলি টেনে নিয়ে যেতে যেতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আলোচ্য ঐ গ্রামের শিল্পীরা এসব পুতুলের গায়ে চুনখড়ির সাদা প্রলেপের উপর সবুজ ও লাল রঙের টান দেন—যা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

হাওড়া জেলায় চাকা লাগানো আর একটি পুতুলের কেন্দ্র হ'ল উলুবেড়িয়া থানার এলাকাধীন তাঁতিবেড়ে। এখানের তৈরি চাকা লাগানো ঘোড়ায় চড়া মূর্তি বেশ ব্যাপকভাবেই বিক্রি হয়। এছাড়া এখানের কুম্ভকার শিল্পীরা শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরি করেন ঘাগরাপরা মেয়ে পুতুল, পাল্কি ও সেই সঙ্গে চাকা যুক্ত নৌকো। অন্যদিকে এখানে পুতুলের উপর রঙ চড়ানোর পদ্ধতিটিও বেশ চমকপ্রদ। পুতুলগুলিকে শিশুদের মনে ধরানোর জন্য এরা পুতুলের উপর তেঁতুল বীজের কষ সহযোগে লালচে রঙ লাগান এবং সেই সেই রঙের ঔজ্জ্বল্য

বৃদ্ধির জন্য অভ্রের গুঁড়োও মেশান। এছাড়া এই জাতীয় চাকা লাগানো নৌকো পুতুলের আর একটি কেন্দ্র হল, হাওড়া জেলার ঘুঘুবেশে (থানা ঃ শ্যামপুর) এলাকার কুম্ভকার পল্লী।

আলোচ্য এ জেলায় চাকা লাগানো ঐ ধরনের পুতুল তৈরির আর একটি কেন্দ্র হল, এ জেলার বাগনান থানার বাঁটুল গ্রাম। এখানের কুম্ভকাররাও আবহমানকাল ধরে অন্যান্য ছেলে ভোলানো পুতুলের সঙ্গে চাকা লাগান ঘোড়সওয়ার পুতুলও তৈরি করে আসছেন।

পাশাপাশি মেদিনীপুব জেলায় চাকাযুক্ত পুতুলের এযাবৎ যা সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল, পাঁশকুড়ো থানার রঘুনাথবাড়ি ও মাগুরা গ্রামে এখনও শিশুদের খেলনার জন্য যেসব পুতুল তৈরি হয় তার মধ্যে চাকাসহ ঘোড়ায় চড়া অশ্বারোহী পুতুলটিই উল্লেখযোগ্য। এ জেলার আরও অন্যান্য স্থানে হয়ত এই ধরনের চাকা লাগানো পুতুল তৈরি হয়, কিন্তু সঠিক তথ্য না পাবার কারণে এ জেলার পুতুল তৈরি কেন্দ্রের সঠিক চিত্রটি উপস্থাপন করা গেল না।

অন্যদিকে হুগলি জেলার একটি বিখ্যাত লোকোৎসব হল মাহেশের রথ। দীর্ঘদিন ধরে এ রথের প্রসিদ্ধির জন্য কুম্ভকার শিল্পীরা চাকা লাগানো পোড়া মাটির রথও নির্মাণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে চাহিদার অভাবে এই নগণ্য খেলনাটির প্রতি কারুর তেমন আগ্রহ না থাকায় পোড়ামাটির এই রথ নির্মাণ বর্তমানে অপ্রচলিত হয়ে যেতে বসেছে, তবু মাহেশের রথের সময় এ পুতুলটি এখনো আসে বিক্রির জন্যে।

হুগলি জেলার খানাকুল থানার চাপনগরী গ্রামের কুম্ভকাররাও অন্যান্য পুতুলের সঙ্গে চাকাযুক্ত ঘোড়সওয়ার ও নৌকোপুতুলও তৈরি করে থাকেন এবং এখানকার তৈরি পুতুলগুলি বিক্রির জন্য আসে হাওড়া জেলার আমতা থানার এলাকাধীন ঝিখিরা গ্রামের রথের মেলায়।

মালদহ জেলার কালিয়াচকে অনুষ্ঠিত বিজয়া দশমীর মেলাতেও দেখা যায় এই ধরনের চাকা লাগানো নৌকোপুতুল। উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের কুম্ভকার পল্লীতেও চাকা লাগান ছুটন্ত ঘোড়া পুতুল তৈরি হয়।

অনুরূপ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুরেও পাওয়া যায় একান্ত চমকপ্রদ চাকাযুক্ত ঘোড়ার গাড়ি। শিশু মনোরঞ্জনের বহুবিধ খেলনা এযাবৎ আবিষ্কৃত হলেও, এখানকার তৈরি চাকা লাগানো ঘোড়ার গাড়ি খেলনার চাহিদা মোটেই কমে যায়নি। এ জেলার বজবজ থানার এলাকাধীন আছিপুর গ্রামের কুম্ভকার পল্লীতে তৈরি হয় চাকা লাগানো অশ্বারোহী পুতুল। তবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বিষয় বৈচিত্র্যে চমকপ্রদ নানা ধরনের চাকা লাগানো পুতুলের প্রাপ্তিস্থান হল, বেড়াচাঁপা গ্রামের কুম্ভকার পল্লী। এখানে আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের সময় পাওয়া গেছে বেশ কিছু চাকা লাগানো সেকালের পুতুল-খেলনা। কিন্তু সেসব খেলনা পুতুলের ধারাবাহিকতা আজ ক্ষীণ হলেও বেড়াচাঁপার কুম্ভকার পল্লীতে বজায় রয়েছে বহু রকমের চাকা লাগানো খেলনা পুতুলের উৎপাদন। যুগের ধারা বদললেছে বলেই এখানে পুতুলের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে,

কিন্তু প্রথাগত রীতি প্রকরণ বদলায়নি। সেজন্য এখানের কুম্ভকার সম্প্রদায় শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরি করে থাকেন চাকাযুক্ত ঘোড়সওয়ার, গরুর গাড়ি এবং মোটর সাইকেল আরোহী প্রভৃতি। অদ্ভুত ও অপূর্ব এসব খেলনা পুতুল দেখে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বেশ বোঝা যায়, অতীতকে জানতে হলে আমাদের অধুনাকালের এইসব গ্রাম্য শিল্পসামগ্রীর জীবন্ত ধারাবাহিকতাকে কোনমতেই অবহেলা করা চলে না, তা সে শিশুদের খেলনা পুতুলই হোক, বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত অন্য কোন পুতুলই হোক।

দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পল্লীবাংলার শিল্পমানস শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে এইভাবেই বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে খেলনাতেও এসেছে শহুরে আমেজ। অন্যদিকে সন্তান-সন্ততিদের জন্যে এমন সহজ তুলির টানে চিত্রায়িত সাধারণ পুতুল কেনায় আজ আর কারুর বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকছে না। ফলে বাংলার এইসব প্রথাগত লোকশিল্পের নিদর্শন ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে এবং এই অবস্থায় এইসব খেলনা-পুতুলের নিদর্শনগুলির সন্ধান ও সংগ্রহ যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চ. গালার পুতুল

গালার পুতুলের কথা মনে হলেই আঁমাদের বীরভূমের পুতুলের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। ইলামবাজারে এক সময়ে তৈরি হতো চিত্তগ্রাহী গালার পুতুল, তৈরি করতেন সেখানকার 'নুরি' সম্প্রদায়। পুতুল তৈরির প্রধান উপকরণ অর্থাৎ গালা, সহজেই এখানে পাওয়া যেত। কারণ সেকালে জেলার লাক্ষা উৎপাদনের মধ্যবিন্দু ছিল এই ইলামবাজার। লাক্ষাকীটের দেহ-নিঃসৃত আঠালো রস থেকে পাওয়া গালা নিষ্কাশন করার পর যা অবশিষ্ট থেকে যেত, সেই বাতিল গালার অংশটুকু পুতুলশিল্পীরা সংগ্রহ করতেন এবং তার সঙ্গে সামান্য মাটি মিশিয়ে, গালা মেশানো নানান রঙের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করতেন আকর্ষণীয় পুতুল। বীরভূমের লাক্ষা শিল্পের অবনতির দরুন, কাঁচামালের অভাবে পুতুলশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসে। ফলে এইসব খেলনা-পুতুলের চলনও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই শোচনীয় পরিণতিতে, শিল্পীরা ক্রমশ এসব কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। ছেলেভোলানো শিল্পটির এই পড়ন্ত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের এদিকে দৃষ্টি পড়ে। তিনি এই বিপন্ন শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হন এবং এই 'নুরি' সম্প্রদায়ের একজন

গালার পুতুল ঃ পাঁচরোল

গালা শিল্পীকে শ্রীনিকেতনে নিয়ে এসে শিক্ষার্থীর এক আসর বসান। এর ফলে আবার এখানে তৈরি হতে শুরু করে সেই পুরনো গ্রাম্যরীতির নানাবিধ পুতুল ও ফলফলারি। এখানকার তৈরি পুতুলগুলোর মধ্যেও বেশ একটা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। আমরা যারা রাঁচি বা বেনারসের ছোট ছোট কাঠের পুতুল দেখতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে এ পুতুল মনে হবে যেন ঐসব পুতুলেরই নতুন কোন সংস্করণ। তবে বিষয়বস্তুতে পুরোদস্তুর প্রকাশ পেয়েছে বাংলার সেই লৌকিক রূপের ধারা। এ পুতুলের মধ্যে তাই দেখা যায় ছেলে-কোলে মা, মেয়েদের চুল বাঁধা, ঢেঁকিতে ধান কোটা, মাহুতসহ হাতি বা ঘোড়সওয়ারের মূর্তি এবং ব্যাপকভাবে তৈরি হতো আম, আতা, লিচু, করলা, লেবুজাতীয় ফলফলারি। কিন্তু লাক্ষা চাষ উঠে যাওয়ায় কাঁচামালের অভাবে এবং সর্বোপরি সাধু প্রচেষ্টার অভাবে এই কারুকলাটির পুরাতন ঐতিহ্য আর শেষ অবধি বজায় থাকেনি। বীরভূমের গালার পুতুলের ঐতিহ্য শেষ হয়ে গেলেও গালার আকর্ষণীয় রঙ-লাগানো আর এক ধরনের পুতুলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায়। বাঁকুড়া জেলায় এই ধরনের পুতুল তৈরির কেন্দ্র হলো বিষ্ণুপুরের শাঁখারিবাজার। পুজো-পার্বণ উপলক্ষে মেলায় এরা এই গালার পুতুল আনেন বিক্রির জন্য। তবে চাহিদার অভাব রয়েছে, অনেকক্ষেত্রে রঙের বাহারি ঔজ্জ্বল্যও যেন ম্লান হয়ে এসেছে। তবুও স্থানীয় শাঁখারি পরিবারের মেয়েরা আবহমানকালের সেই মেয়েলি শিল্পটিকে এখনও ঠিক পরিত্যাগ করতে পারেননি।

অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলায় এই ধরনের পুতুল তৈরির রেওয়াজ কমে এলেও এখনও তাদের পুতুলশিল্পের রীতিপ্রকৃতি ও অলংকরণে অতটা খাদ মেশানো শুরু হয়নি। এখানকার পুতুল শিল্পীরা বেচাকেনার জন্য স্থানীয় বাজারের উপর শুধু নির্ভরশীল নয়, তাদের আশাভরসার প্রধান কেন্দ্র হলো ওড়িশার বারিপদার রথের মেলা। তাই ওড়িশা রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি এগরা থানার পাঁচরোল এবং পটাশপুর থানার খড়ুই বাজারের শাঁখারি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে রথের মেলার আগে যেন প্রাণচাঞ্চল্য জাগে, ঘরে ঘরে রঙিন গালার পুতল তৈরির মহোৎসব শুরু হয়ে যায়।

খড়ুই বাজারে শাঁখারি পরিবারের তিন-চার ঘর এবং পাঁচরোল গ্রামে এমন দশ-বারো ঘর এই পুতুল তৈরির কাজে বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন। জীবিকানির্বাহের তাগিদে পরিবারের পুরুষরা আস্ত শাঁখ থেকে শাঁখা কাটেন সেই পুরনো দেশি প্রথায় দু'হাতে অর্ধগোলাকৃতি শাঁখের করাত চালিয়ে। আর বাড়ির মেয়েরা অবসর সময়ে শাঁখের আংটি তৈরি করেন এবং কোন মেলার আগে এই পুতুলের কাজে হাতে দেন। আগেই বলা হয়েছে, এদের তৈরি পুতুলের বড় আকর্ষণ হলো রকমারি রঙের প্রলেপ, যা গালা ও রঙের মিশ্রণের দরুন ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। তৈরির পদ্ধতিও বেশ চমৎকার। প্রথমে কাদার তাল থেকে হাতে টিপে-টিপে এরা পুতুল করেন—কোন ছাঁচের সাহায্য না দিয়েই। ফলে সে সব পুতুলের গঠনে রয়েছে সেই আবহমানকালের সারল্য। বিষয়বস্তু মূলত হাতি, ঘোড়া (লম্বা ও নিচু গলার), হরিণ, জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, নাড়ুগোপাল, গণেশ, মনসা, রাজা-রানী, ধর্মের

ষাঁড় এবং হাতি বা ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ প্রভৃতি। শেষোক্ত দু'ধরনের পুতুল আবার দু'টি অংশে বিভক্ত, আটকে রাখার জন্য ঘোড়া-হাতি ও সওয়ারের সংযোগস্থলে দু'টি ছিদ্রে সরু কাঠি ব্যবহার করা হয়। উচ্চতায় পুতুলগুলি হয় পাঁচ থেকে পনের সেন্টিমিটার।

গ্রামের আশপাশে যেখানে উইঢিবির অস্তিত্ব আছে সেখান থেকে ঐ উইঢিবি ভেঙে প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ করতে হয়। তারপর মাটির গামলা বা হাঁড়িতে ভিজিয়ে রাখতে হয় সংগৃহীত মাটি। উই ঢিবির মাটির সুবিধে এই যে, এতে তেমন কোন কাঁকর থাকে না এবং মাটি বেশ আঠালো রকমের হয়। তাহলেও মাটি চটকে নিয়ে দেখা হয় কাঁকর বা ইটের কোন টুকরো আছে কিনা-যাকে বলা হয় 'চাঁচি'। এরপর সেই মাটি চটকানো কাদার তাল প্রয়োজনমতো শুকিয়ে যাবার পর দু'হাতের দশ আঙুলের কারিগরি শুরু হয়। তারপর তৈরি করা পুতুলগুলিকে বাড়ির উনুনে পুড়িয়ে নেওয়া এবং রঙ লাগানোর পালা। এ পর্যায়ে প্রথমে তৈরি করতে হয় রঙ-দেওয়া গালার কাঠি, যা দেখতে হয় 'পেন্সিলে'র মতো। পরিমাণমতো চাঁচগালার সঙ্গে প্রার্থিত রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে আগুনে গরম করে রঙিন গালাকাঠি তৈরি হয়। সাধারণত এসব কাঠি পেন্সিলের মতোই বার থেকে আঠার সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। লাল, কালো, হলুদ ও সবুজ, এই চার রঙের গালাকাঠিই সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

এবার এক মালসায় কাঠকয়লার আগুনে পোড়ানো পুতুলগুলিকে গরম করে নেবার জন্য রাখা হয়। অনেক শিল্পীর বাড়িতে দেখেছি মালসার বদলে মাটির কলসিকে আড়াআড়িভাবে অর্ধেক কেটে নিয়ে কলসীর উপরদিকের 'মোকা' উপুড় করে তাতে মাটি দিয়ে কাঠকয়লার আগুন রাখার পাত্র করা হয়। আগুন যাতে নিভে না যায়, তার জন্য বাঁশের চোঙা (এদের কথায় নলি বা ললি) দিয়ে ফুঁ দেওয়া হয়। পুতুল যেই গরম হয়ে যাবে, তখনই তা বাঁশের তৈরি 'কামড়া'য় আটকে নেওয়া যাবে। 'কামড়া' হলো প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ সেন্টিমিটার বাঁশের একটি পাব, যার উপরের দিকটা মাঝামাঝি ফাটানো থাকে নিচের গাঁট পর্যন্ত। এবার কামড়া ফাঁক করে তার ভেতর গরম পুতুল আটকে নিয়ে রঙিন গালার কাঠি বোলাতে হয়। সাধারণত শিল্পীরা পুতুলের সামনের দিকে লাল বা সবুজ এবং পিছনদিকে কালো রঙ দেওয়া বেশি পছন্দ করেন। জগন্নাথ-পুতুলের বেলায় এরা অবশ্য জমিনে কালো রঙই প্রয়োগ করেন। এবার হলুদ রঙের গালার কাঠি থেকে সরু গালার সুতো বের করে গরম অবস্থায় তাই দিয়ে পুতুলের জামা-কাপড়ের পাড় ইত্যাদিসহ অঙ্গাবরণের ও অলঙ্কারের যাবতীয় নকশা করা হয়। রঙ-গালা থেকে এই সুতোর লেত্তি তৈরি করাকে এরা বলে থাকেন 'গুনা'। অক্ষি তারকায় হলুদ রঙের লেত্তি গোল করে পাকিয়ে তার ভেতর কালোর টিপ দিয়ে দেওয়া হয়।

পুতুল তৈরি শেষ হলে খড়ুইবাজারের শিল্পীরা কাছাকাছি পঁচেটগড়ের রাসমেলায় পুতুল নিয়ে আসেন ফি বছর। তাছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতে দাঁতন থানার সরশঙ্কার মেলাতেও খড়ুইবাজার ও পাঁচরোল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ঝুড়িভর্তি পুতুল। তবে স্থানীয় এসব মেলাতে পুতুলের চাহিদা থাকলেও এখানকার পুতুল বেশি করে চালান যায় ওড়িশার বারিপদায় রথের মেলায়। সে জন্যেই বোধ হয় এখানকার পুতুলের মধ্যে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার

এত সমারোহ। রথবিপদার মেলাতে যখন এসব পুতুল ঝুড়ি-ঝুড়ি চালান হয়ে আসে, তখন ধারণাই করা যায় না যে এগুলি সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের দু'টি অখ্যাত গ্রাম থেকে আসছে। তাই ওড়িশার হস্তশিল্প বিভাগের সরকারি কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এগুলিকে ওড়িশার লোকশিল্প বলে মনে করা বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়।

তবে এত ঝক্কি-ঝামেলা পুইয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এখানকার মহিলারা যেসব পুতুল তৈবি করেন, সেগুলি কী দামে বিকোয়, সে প্রশ্ন স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পুতুল শিল্পীরা তাদের মনমতো দাম যে পান না, তা বলাই বাহুল্য। দাম পঞ্চাশ পয়সা থেকে একটাকা বা তদূর্ধ্বে তিন থেকে পাঁচ টাকা। তবে হাটে-বাজারে ছোট পুতুলগুলির চাহিদাই বেশি। একে তো গালার দাম চড়েছে প্রায় বিশগুণ, তার উপর রঙের দামও ঊর্ধ্বমুখী। সেই তুলনায় উপযুক্ত মজুরির দাম যোগ করলে পুতুলের দাম পড়ে যায় অনেক।

কথায় বলে, 'ব'সে থাকলে উপোস যাই, বেগার গেলে খেতে পাই'। শিল্পীদেরও সেই অবস্থা। যা হোক্ অবসর সময়ে হাত চালালে যদি দু'চারটে পয়সা আসে, তাই বা মন্দ কী? তাই আজও পাঁচরোল আর খড়ুইবাজারের গ্রামে তৈরি হচ্ছে এইসব রংদার গালার পুতুল।

ছ. হাত-নাচনা পুতুল

বাংলার লোকসংস্কৃতির বহু উপকরণই লুপ্ত হতে চলেছে। আধুনিক নগর কৃষ্টির প্রবল জোয়ারেব মাঝে সে সব গ্রাম্য জীবনচর্যার উপচার আজ তুচ্ছ বিবেচনায় কোথায় যেন তলিয়ে যেতে বসেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাসবহুল পরিবেশে এ মৃত্যু রোধ করা যাবে না জানি, কিন্তু সে সব বিলীয়মান সংস্কৃতির পরিচয় অন্তত লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনকে তো অস্বীকার করা যায় না।

মেদিনীপুর জেলায় ঠিক এমন একটি অবহেলিত লোকসংস্কৃতির উপাদান হ'লো হাত-নাচনা পুতুল। এ বিষয়টি সম্পর্কে আগে আমার জানা ছিল না, কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হল বছর কয়েক আগে খড়্গপুরের কাছে মালঞ্চ গ্রামে গিয়ে। সেখানে দক্ষিণাকালীর আটচালা মন্দিরটির গায়ে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ভাস্কর্য ফলকগুলি যখন নিরীক্ষা করছিলাম তখন সেখানে ময়লা বেশবাসে পরিহিত দু'ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হ'লো। এঁদের একজনের কাঁধে ছোট একটি ঢোলক দেখে আমার আগ্রহ বাড়ল তাঁদের পরিচয় পেতে। সেকথা জিজ্ঞাসা করতেই এঁদের একজন বলে উঠলেন, তাঁরা নাচনা পুতুল দেখিয়ে বেড়ান। নাচনা পুতুলটি আবার কি জিনিস, সে সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতেই তাঁর কাঁধে ঝোলানো ময়লা ঝুলি থেকে দুটি ন্যাকড়ার পুতুল বের করলেন তারপর সে দুটিকে দস্তানা পরার মত দুহাতের মুঠির ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। দেখা গেল, ডান হাতের পুতুলটি কৃষ্ণ আর বাঁ হাতের পুতুলটি রাধার প্রতিকৃতি। এবার দুহাতে অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে পুতল নাচ শুরু হ'লো। সঙ্গে গানের তালে তালে চললো ঢোলক-আলা ব্যক্তিটির ঢোলসঙ্গত।

গানের কলি তখন মন্দির চত্বরে গম গম করছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে বচিত সে গানটি হ'লো ঃ 'ও শুন মাঝি ভাই / পার করে দাও পারে চলে যাই।। পারের মাঝি কেলে সোনা / কড়ি বিহনে পার করেনা / দেনা পাওনা চুকে লওনা / আমরা পারে চলে যাই ।। শ্যামবাজারে বাড়ি আমার / নামটি বিনোদিনী রাই ।।'

এদিকে গান আর শেষ হতে চায় না। কৃষ্ণলীলা শেষ হলে শুরু হ'লো শিবদুর্গার ঝগড়া, তারপরে রাম-সীতা, নিমাইসন্ন্যাস, সবশেষে দেহতত্ত্বের ঝুমুর গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলও বদল হতে লাগলো। সেখানে কৃষ্ণরাধা গেলেন তো শিবদুর্গা এলেন, এলেন রামসীতা। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর নাচনা পুতুলটা নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে। বোঝা গেল, শ্রোতার মনোরঞ্জনে তাদের চাহিদামতো ভিন্ন ভিন্ন গানের পসরা তুলে ধরতে চায়।

গান শেষ হলে এবার শ্রোতাদের কাছে দক্ষিণার জন্যে প্রার্থনা। হাতের মুঠিতে ধরা পুতুল দুটিকে খুলে রাখার সময় নাচনাদার বললেন ঃ 'এবার বুঝলেন তো আমাদেব পরিচয়। বাড়ি আমাদের ময়না থানার বৃন্দাবনচকে। সেখান থেকে এতদূর এসছি দুটো পয়সা পাবার আশায়। এইভাবে বেণী পুতুল দেখিয়ে পেটের ভাতভিত জোগাড়ের ধান্দায় বাড়ি বাড়ি ভিখ মেগে বেড়াই।' বোঝা গেল, এরা হাতনাচনা পুতুলকে বলে থাকেন বেণী পুতুল।

গ্রাম বাংলায় মেলায়-উৎসবে বিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যমরূপে বাঁশের ডগায় লাগানো ভারি কাঠের পুতুল কাঁধে করে বা কোমবের পাটিতে বেখে প্রথাগতভাবে নাচানো হ'তো পর্দার আড়ালে। কাঠের পুতুলের হাত পা ও মাথা নাড়াবার সে কৌশলের মধ্যে জনমানসের আহ্লাদের আতিশয্য একদিন এ শিল্পটিকে জনপ্রিয়তার আসনে বসিয়েছিল। কিন্তু হায়, গ্রামজীবনের সে নির্মল আনন্দ পুতুল নাচটিও বিদায় নিয়েছে পল্লীসংস্কৃতির আঙ্গিনা থেকে। কিন্তু তাহলেও এই হাত নাচানো বেণী পুতুল এখনও টিকে রয়েছে দেখে পুলকিত হলাম। ইংরেজিতে যাকে বলে 'গ্লাভস পাপেট' সেই পুতুল নাচের প্রথাগত ধারাটিকে যে এই শিল্পীরা এখনও লালন পালন করে চলেছেন, তা জানতে পেরে বড়ই আনন্দ হ'লো।

সেজন্য পরে আবার নতুন করে খোঁজ সন্ধান শুরু হল সেইসব শিল্পীর জীবন ও জীবিকার তত্ত্বতল্লাশে, যারা বঙ্গ কৃষ্টির এই অবহেলিত পুতুল নাচটির দীপশিখাটিকে আজও জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মেদিনীপুর জেলায় এই পুতুল নাচ দেখিয়ে যারা জীবিকা অর্জন করেন তাদের জীবনকাহিনী দুঃখের হলেও বেশ অভিনব। এই সম্প্রদায়ের বসতি হ'লো, ভগবানপুর থানার ইক্ষুপত্রিকা, পদ্মতামলি ও জুখিয়া গ্রাম, ময়না থানার বৃন্দাবনচক এবং নন্দীগ্রাম। এসব গ্রামের মধ্যে পদ্মতামলি গ্রামেই এই শিল্পীদের সংখ্যা প্রায় জনা পনের, তারপর ইক্ষুপত্রিকার গ্রামে জনা দশেক, জুখিয়া গ্রামে জনা পাঁচ-ছয়, বৃন্দাবনচকে ও নন্দীগ্রামে জনা দুই করে শিল্পীর বসবাস। এসব পুতুল শিল্পীদের জীবনযাত্রার মান যে খুবই নিম্নস্তরের সে কথা বলাই বাহুল্য। বলতে গেলে এরা সত্যিকারের সর্বহারা। জমি জায়গা নেই, উপায় উপার্জন বলতে গান গেয়ে পুতুল নাচিয়ে আর ঢোল বাজিয়ে মানুষের মর্জিমত ভিক্ষার দান। তবে তার জন্য এদের কোন দুঃখ নেই, রক্তের সঙ্গে মিশে আছে তাদের আবহমানকালের এই সঙ্গীত নৃত্যের উন্মাদনা। অন্যদিকে জাতিগত দিক থেকেও এরা সমাজে অবহেলিত,

অর্থাৎ ঘোড়ই জাত হলেও অন্তজ শ্রেণীর হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং সামাজিক অবস্থা সুখকর নয় বলেই হয়ত দুমুঠো অন্নের তাগিদে একদিন গ্রহণ করতে হয়েছিল এই বৃত্তি। তবে বঙ্গ- সংস্কৃতির উপচার তো এই নিচুতলার দানেই সমৃদ্ধ হয়েছে এবং এইসব আঞ্চলিক কৃষ্টির সংমিশ্রণেই যে বঙ্গ সংস্কৃতি সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা লাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাত-নাচনা পুতুলগুলি তৈরির বিষয়েও বেশ মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। এসব পুতুল তৈরিতে অপর সম্প্রদায়ের কারিগরদের উপর এদের নির্ভর করতে হয়। পুতুলের মুণ্ডুটা হয় মাটির, যা হাতে তৈরি করে পুড়িয়ে নেওয়া হয়, তারপর লাগানো হয় যথাযথ রঙের প্রলেপ। সেজন্য এ মুণ্ডুনির্মাণে কুম্ভকার বা চিত্রকর পটুয়া সমাজের শিল্পীদের দ্বারস্থ হতে হয়। বৃন্দাবনচকের শিল্পীর নাচনা পুতুলের মাথাগুলি বানিয়ে দিয়েছিলেন মেদিনীপুর শহরের লবকুশ কুম্ভকার। মনে হয় লবকুশ এইসব নাচনা পুতুলের মুণ্ডু তৈরিতে বেশ ওস্তাদ ছিলেন।

পুতুলের মুণ্ডু পোড়ামাটির হলেও হাত দুটো হয় কাঠের। সেজন্য এদের যেতে হয় স্থানীয় কাঠের কাজের মিস্ত্রীদের কাছে। এসব হাত তৈরিতে পিঙ্গলা থানার কালিয়াড়া বা ভগবানপুরের কাঠের কাজের কারিগর বাড়ুই সম্প্রদায়ের বেশ দক্ষ হিসাবে সুনাম আছে। এবার হাত ও মাথা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে, সেগুলি নিয়ে পুতুল শিল্পীরা নিজেরাই জোড়া লাগিয়ে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। রঙিন কাপড়ের টুকরো দিয়ে এক ঘাঘরা বানিয়ে তার উপর দিকে সুতো দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় মুণ্ডুটিকে এবং সেইমত হিসেব করে ঘাগরার দুদিকে যথাস্থানে সুতোয় বেঁধে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয় কাঠের হাত দুটোকে। এরই সঙ্গে কাঠের হাতে বেঁধে দেওয়া হয় ঘুঙুর। এইভাবে বাইস থেকে পঁচিশ সেমি. উচ্চতাবিশিষ্ট নাচনা পুতুল তৈরি হয়ে যায়। অনেক সময় প্রয়োজনে স্থানীয় চিত্রকর-পটুয়াদেরও ডাক পড়ে এই পুতুলের রূপদানে।

আগেই বলেছি, এদের পুতুলের রকমফের সম্পর্কে। সেজন্য ঝোলায় ভরা থাকে রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, রামসীতা, নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া বা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী প্রভৃতি নানা ধরনের পুতুল, যা শ্রোতার চাহিদামত গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে দেখানো হয়। এদের ধারণা অনুষ্ঠানের সময় পুতুলগুলি সত্যিই দেবতা হিসাবে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়, তাই সন্ধ্যায় আস্তানায় ফিরে তাদের যথারীতি পুজো-আচ্চাও করা হয়ে থাকে। এক এলাকায় তো শ্রোতা পাওয়া দুষ্কর। তাই জেলার নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। এমন কি চলে যেতে হয় বিহারের টাটানগর বা ওড়িশার বারিপদা বা বালেশ্বর এলাকাতে।

অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার মত হাওড়া জেলার উত্তর প্রান্ত জগৎবল্লভপুর থানার এলাকাধীন পাতিহাল গ্রামেও বেশ কিছু হাত-নাচনা পুতুল শিল্পীদের দেখা পাওয়া যায়। এই শিল্পীদের বসবাস ঐ গ্রামের মাল পাড়ায় এবং এই মাল সম্প্রদায় বর্তমানে সাপুড়ে বলেই বিশেষ পরিচিতি। এদের জীবন কাহিনীও বেশ বিচিত্র। একদা এরা জল অচল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও, বাংলার লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে এরা অনেকেই ইসলামধর্মাবলম্বী হয়ে যান। ফলে এই সম্প্রদায় হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই আজ আপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু তা হলেও

তাদেব সাবেকি উপজীবিকা সাপ ধবা আব সাপ খেলানোব উপবে এবা এখনও নির্ভবশীল। লক্ষণীয বিষয় হল, এবা সাপ খেলানোব সময হাত-নাচনা পুতুল নাচেবও অনুষ্ঠান কবে থাকেন। তবে এদেব এই হাত-নাচনা পুতুলেব সংখ্যা বর্তমানে মাত্র দুটি।

এদেব পুতুলগুলিব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই কাঠেব তৈবি। মুণ্ডটা গলা পর্যন্ত, তাবপব দেহকাণ্ডেব স্থানটি ফাঁপা নলেব মত, আব হাতেব তালুব সঙ্গে কব্জি থাকলেও, সেটি ফাঁপা নলেব মত, যাব মধ্যে আঙুল ঢুকিযে শিল্পী ইচ্ছামত নাডাচাডা কবতে পাবে। পুতুলেব সাজ সজ্জায দেখা যায, নাক, কান, চুলেব খোঁপা, সিঁথি সবই কাঠ খোদাই কবে তৈবি, যাব মধ্যে ভুরু, চুল ইত্যাদি বিভিন্ন বঙে বঞ্জিত এবং মাথাব খোঁপাব সঙ্গে বাঁধা থাকে ঘুঙুবেব ছোট এক মালা এবং কানে পবানো হয পুঁতিব গযনা।

মেদিনীপুব জেলাব পুতুলেব মত এদেব পুতুলগুলিব চবিত্র কোন ধর্মীয দেবদেবীব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয, ববং কিছুটা সামাজিক। তাই এদেব পুতুলেব নামকবণে দেখা যায, দু'সতীন বা বিনোদিনী, আবাব অনেক সময বলে থাকেন, 'ভালো নাচবি খাঁদি'। এদেব গানেব মধ্যে সেজন্য সমাজজীবনেব নানান ছুটছাট ঘটনাব সঙ্গে থাকে হাস্যবসেব প্রলেপ। গানেব নমুনায তাই দেখা যায,—"মাগো কলিকালেব কথা, বলব কত?/ বৌদিব পাতে মাছেব মুডো/গিন্নীব পাতে কাঁটা কুটো," অথবা "এ বথে যাবো না দিদি উল্টোবথে যাব/দু সতীনে যুক্তি কবে কাঁঠাল কিনে খাবো।" মেদিনীপুবেব হাত-নাচনা পুতুলে শিল্পীদেব যেমন বাদ্যযন্ত্র থাকে, এদেব তেমন কোন বাদ্যযন্ত্র নেই, গানেব তালে তালে পুতুলগুলিকে অঙ্গ ভঙ্গি সহকাবে নাচিযে থাকে।

পবিশেষে বলা যেতে পাবে, মেদিনীপুব ও হাওডাব শিল্পীদেব হাত নাচনা পুতুলেব এই প্রদর্শন দীর্ঘদিন ধবেই এবা বংশ পবম্পবায চালিযে আসছেন। তবে সংখ্যায যে ভাবে শিল্পীব দল কমতে শুরু কবেছে, তাব ফলে আব কতদিন এই শিল্পটিব উপব এবা নির্ভবশীল থাকবেন তাই চিন্তাব বিষয। কিন্তু তা হলেও মেদিনীপুব ও হাওডাব লোকসংস্কৃতিব এই উল্লেখযোগ্য উপাদান দাবিদ্র নিপীড়িত মানুষেব অন্তস্থলে চিবদিন যে বিবাজমান থেকে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জ. তালপাতার পুতুল

এবাবে তালপাতাব পুতুল। শিশুদেব জন্যে তৈবি তালপাতাব তৈবি দু'আঙ্গুলেব টিপুনিতে নাচানো তালপাতাব সিপাই পুতুল একসময়ে গ্রাম্য মেলায ছিল শিশুদেব এক বড আকর্ষণ। তালপাতা দিযে তৈবি সিপাইযেব হাত ও পাযেব অংশ টুপি পবা ধডেব সঙ্গে সুতোয সেলাই কবে জুডে মধ্যে এক সরু কাঠিতে প্রতিস্থাপন কবা হ'ত। কাঠি আঙুল দিযে ঘোবালেই তালপাতাব সিপাই হাত-পা ছুঁডতে থাকে — যা শিশুদেব পুলকিত কবাব পক্ষে যথেষ্ট। এগুলি গ্রামীণ মেলায় মেলায় পাওয়া যেত। কিন্তু হায, কোথায় আজ হাবিয়ে গেল সেই মনভোলানো তালপাতার সেপাই।

শোলার কারুশিল্প

বাঙলার প্রথাগত লোকশিল্পেব ঐতিহ্যবহনকারী যেসব শিল্পবস্তুর প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে একটি হল শোলার কারুশিল্প এবং শোলার মত সামান্য বস্তুটি দিয়েই তৈরি হয় অলংকরণসজ্জায় ও আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নানান শিল্পদ্রব্য। সেদিক থেকে শোলার মত একটি অবহেলিত জলজ উদ্ভিদ থেকে এমন সব সুষমামণ্ডিত শিল্পবস্তুর যে সৃষ্টি হতে পারে তা চিন্তার অগম্য। এটা অবশ্য ঠিক যে, হেলাফেলাব যেসব বস্তু লোকশিল্পীদের হাতে পড়ে কিভাবে সুন্দর শিল্পবস্তুতে পরিণত হয় তাব উজ্জ্বল নিদর্শন হল শোলার তৈরি এইসব শিল্পসম্পদ, যা আজও অনন্য গৌরবের অধিকারী।
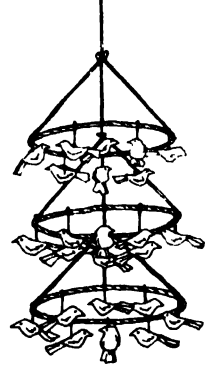
শোলাব ঝাঁকপাখি

শোলা নামের এই জলজ উদ্ভিদটি গ্রাম-বাঙলার জলা-জঙ্গলে, খাল-বিল ও অগভীর পুকুরের ধারে ধারে আপনা থেকেই জন্মায়। কাঁচা অবস্থায় প্রায় সবুজ রঙের এই উদ্ভিদটি যখন পুরুষ্টু আকার ধারণ করে তখন দেখতে হয় সরু বা মোটা ধরনের লাঠির মত। মাটির গুণে শোলা মোটা বা সরু যাই হোক না কেন, সবই কিন্তু শিল্পসৃষ্টির কাজে লেগে যায়। জল থেকে কেটে তুলে এনে বাণ্ডিল করে সেগুলি শোলা-শিল্পীদের কাছে বা কলকাতার বিভিন্ন আড়তদারদের কাছে চালান যায়। এক সময়ে শোলা উৎপাদনের এক বড়ো ধরনের স্থান ছিল নদিয়া জেলার বাতের বিল। শোলা শুকিয়ে নিয়ে খুব ধারালো ছুরি দিয়ে ছাল অংশটি ছাড়িয়ে নেবার পর যে সাদা অংশটি পাওয়া যায় তাই দিয়ে শিল্পীরা নানাবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ শুরু করেন।
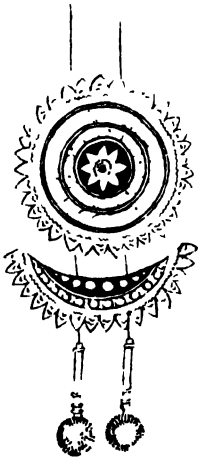
শোলার চাঁদমালা

শোলার শিল্পকাজ সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করতে গেলেই শোলা-শিল্পীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়। বাঙলার আর পাঁচটা লোকশিল্পের মত শোলা শিল্পটির ধারক-বাহক হলেন এদেশের মালাকার সম্প্রদায়। সম্ভবত এক সময়ে মালাকার সম্প্রদায় ফুলের মালা বা পুষ্পসজ্জার কাজে দক্ষ ছিলেন। সেজন্য বাঙলার রূপকথার গল্পে মালাকারদের দেখা মেলে, যারা রাজবাড়িতে ফুল ও ফুলের মালা ইত্যাদি জোগান দেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও জানা যায় ফুলের মালাগাঁথার ও রাজবাড়িতে জোগান দেবার

কাজে দক্ষ মালাকার হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়িকা বিদ্যার কাছে যে পুষ্পমাল্য পাঠাতেন তার গ্রন্থনচাতুর্য ছিল একান্তই দর্শনীয়। এছাড়া চৈতন্য চরিতামৃত এবং বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যেও মালাকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ফুলসজ্জা ছাড়া মালাকার সম্প্রদায় একই সঙ্গে শোলার ফুল দিয়ে তৈরি মালা ইত্যাদি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে সজ্জা ইত্যাদিতে ফুল ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কারণে মালাকার সম্প্রদায় পরিবর্ত হিসাবে শোলার মত দ্রব্যটিকে বেছে নিয়ে তারই মাধ্যমে যে শিল্পকর্ম শুরু করেন, তা পরবর্তী সময়ে সৌন্দর্য-সজ্জার উপকরণ হিসাবে খুবই আদৃত হয়। উপরন্তু লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানান দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে শোলা শিল্পটি তার যথাযোগ্য স্থান করে নেয়।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই এই মালাকার শিল্পীদের বসবাস। বিশেষ করে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার নানাস্থানের এবং কলকাতার নতুনবাজার, কুমারটুলি ও বাগবাজার এলাকায় মালাকার সম্প্রদায়ের তৈরি শোলার বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার বেশ উচ্চ প্রশংসিত। দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু মালাকার শিল্পী পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার নানাস্থানে বসবাস করায় সেখানেও শোলার তৈরি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য দেখা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে বসবাসকারী এই সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় আজও শোলাশিল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শোলার তৈরি হনুমান

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তাগিদে ঘর-সংসারে অন্যান্য যে সব কারুশিল্পের প্রয়োজন পড়ে, শোলার ক্ষেত্রে অবশ্য তা নয়। সেজন্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ক্রিয়াচারের তাগিদে শোলা-শিল্পের উপর জীবিকা-নির্ভর হলেও তাদের বৃত্তিচ্যুত হতে হয়নি। অন্যদিকে শোলার নানান ধরনের শিল্পের সঙ্গে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা আজও টিকে রয়েছেন বিভিন্ন অলংকরণ-সজ্জার কাজে; অনাদরের ধাক্কায় আর পাঁচটা লোকশিল্পের মত নির্বাসিত হতে হয়নি। পরবর্তী সময়ে—বিশেষ করে শোলা দিয়ে বিভিন্ন

দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ ও অলংকরণ সজ্জার তাগিদে অর্থকরী উপার্জনের পন্থা হয়ে ওঠার কারণে মালাকার ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই শিল্পে অংশ গ্রহণ করেছেন।

শোলা শিল্পের কৃৎ-কৌশলেও বেশ অভিনবত্ব দেখা যায়। সামান্য উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যেই লোকশিল্পের যে চরিত্র, শোলার ক্ষেত্রেও সেটি ধরা পড়ে। কারণ এর উপাদান বলতে কিছু শুকনো শোলা-গাছ, হালকা দুএকটি তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি আর কাঁচি এবং জুড়বার জন্য প্রয়োজনীয় আঠা, যেটি আগে তেঁতুল বিচির কাই থেকে প্রস্তুত হত। এখন বহুক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ময়দার সঙ্গে তুঁতে মেশানো লেই বা গঁদের আঠা। এই শিল্পে ব্যবহৃত ছুরিগুলিকে বলা হয় 'কাথ' এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন আকারে তৈরি সেগুলির আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা—ধোসা, কালসো ও ইস্ত্রি। এছাড়া বিভিন্ন আকারে লোহার পিনও ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনমাফিক ঐ-সব তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়ে শিল্পী শোলাকে নানান আকারে কেটে নেয়; কখনও সেগুলি হয় কাগজের মত পাতলা এবং গোল বা সুতোর মত সরু আকার, যার নামকরণ করা হয়েছে কাপ ও পাতুরি। এবার ঐ কাপ বা পাতুরিগুলিকে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে শিল্পী তাঁর নিপুণ কৃৎকৌশলের অভিজ্ঞতায় এবং প্রয়োজনমত নানান রঙ প্রয়োগপূর্বক রূপদান করেন মনোমুগ্ধকর সব দ্রব্যের। এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য শিল্পকর্মের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে শোলা শিল্পের বেশ ফারাক।

এবার শোলা শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। প্রথমত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যেসব দ্রব্য তৈরি হয় তার তালিকা করলে দাঁড়ায়—শোলার সাধারণ ফুল-মালা (পূর্ব বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠানে অতি অবশ্যই ফুলমালা লাগে); পদ্মফুল, হাঁস, শাঁখ ও বেঁকি কলকা সমন্বিত চাঁদমালা; রাসের কদম ফুল; বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের জন্য শোলার টোপর ও কনের জন্য সিঁথি মৌর; লোকিক দেবদেবীর ঘটের উপর ঝোলানোর জন্যে চৌকো শোলার ফ্রেমযুক্ত ঝারা—যার চারকোণে নিবদ্ধ হয় একটি করে কদম ফুল, অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর থানে শোলাব চৌদল দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় ফুলঘবা অর্থাৎ ফুলের ঘর। স্বর্গে বাতি দেওয়ার জন্য শোলার চিত্র-বিচিত্রিত অলংকরণে ভূষিত চৌকো আকারে ফানুস ইত্যাদি। এছাড়া লৌকিক দেবদেবীর থানে বিশেষ করে হাওড়া জেলায় মানত হিসাবে দেওয়া হয়

শোলার তৈরি কাক[illegible]
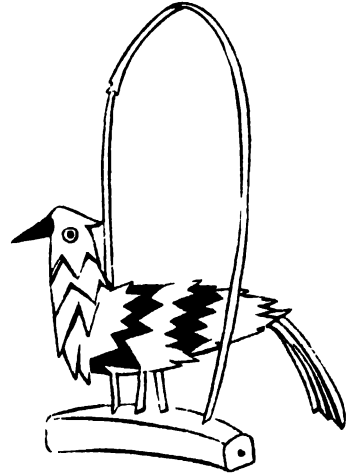
মালাকারদের তৈরি শোলার নৌকো ও পিরের আস্তানায় দেওয়া হয় শোলার তৈরি ঘোড়া। উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার নানা স্থানে নির্মিত হয় শোলার

তৈরি মনসা মূর্তি ও মনসা পট, যাকে বলা হয় করণ্ডিয়া এবং শোলার তৈরি কালী-মুখোস প্রভৃতি। মেদিনীপুর জেলায় মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধের সময় পুকুরের জলে ভাসানো কলাগাছের ভেলার উপর স্থাপন করা হয় পাঁচচুড়ো মন্দির সদৃশ একটি শোলার চৌখুপি, যা মালাকার সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য শিল্পকৃতি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টিতে মালাকার সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা হল অলংকরণ সজ্জার বিভিন্ন উপকরণ। এ তালিকায় আছে শোলার কদম ফুল এবং পদ্ম ও শালুক ফুল ও রজনীগন্ধার মালা; শোলার গোড়ে মালা, শোলার বিভিন্ন ধরনের কল্কা; দেবদেবীর মাথার মুকুটসজ্জা ও সেই সঙ্গে প্রতিমার অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চন্দননগর ও কৃষ্ণনগরে যে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মিত হয় সেগুলিতে বর্ধমান ও নদিয়া জেলার মালাকারদের রচিত শোলার 'ডাকের সাজ' বেশ প্রসিদ্ধ। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট-১৩' অধ্যায়)। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানের মালাকার শিল্পীরা মাটির প্রতিমার বদলে শোলার তৈরি প্রতিমা নির্মাণ করে বেশ প্রশংসিত হয়েছেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রদর্শন উপলক্ষে রাস উৎসবের সময় নির্মিত হয় শোলা দিয়ে তৈরি নানান গাছপালা ও সেইসঙ্গে ফুল লতাপাতা প্রভৃতি। গাছের ডালে ডালে সেজন্য থাকে শোলার তৈরি কাকাতুয়া, টিয়া প্রভৃতি পাখি, আর থাকে কুমির, হাতি ও ঘোড়ার প্রতিকৃতি। অনুরূপ শোলার কলাগাছে ঝুলতে থাকে শোলার তৈরি কলার কাঁদি ও সেখানে দেখানো হয় এক হনুমান সেই কলার কাঁদি থেকে কলা নিয়ে ভক্ষণরত। কোন কোন শিল্পরসিক শোলা-শিল্পী তৈরি করেন তাজমহলের অনুকৃতি বা মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের উপর খোদাই ময়ূরপঙ্খীর অনুরূপ প্রতিকৃতি।

তৃতীয় যে ধরনের কাজ মালাকার সম্প্রদায় করে থাকেন তা হল পুতুল ও খেলনা প্রভৃতি দ্রব্যাদি। স্বভাবতই এঁরা রচনা করেন মাছ, দাঁড়ের উপর বসানো ময়ূর, মাছরাঙা, টিয়া, কাকাতুয়া, এবং লালমোহন ও হিরামোহন পাখি, ঘোড়া, হাতি, কুমির ও হনুমানের প্রতিকৃতি—যার অধিকাংশই দেখা যায় বিক্রির জন্য আনীত বিভিন্ন মেলায় বা রাস উৎসবের প্রদর্শনীতে। এছাড়া তৈরি হয় বিছানায় শুয়ে থাকা ছোটশিশুদেব মনোরঞ্জনের জন্য শয্যার উপর টাঙানোর উদ্দেশ্যে 'ঝাঁকপাখি' নামের পাঁচ থেকে সাত-আট থাকবিশিষ্ট একটি ঝারা। এই ঝারার থাকগুলি করা হয় গোলাকার এবং সেগুলির প্রত্যেকটি ফ্রেমে লাগানো থাকে অজস্র শোলার তৈরি চড়ুই পাখির প্রতিকৃতি। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, হাওয়া লেগে শোলার পাখিরা যখন নাড়াচাড়া করে, তা দেখে শয্যায় শায়িত কান্নারত শিশুর কান্না থেমে যায় এবং সে আনন্দে পুলকিত হয়। শিশুর মন ভোলানোর উদ্দেশ্যে তৈরি নানা বর্ণের উজ্জ্বল ও অসংস্কৃত রূপের সারল্যে এবং নির্মাণকৌশলে যে গ্রাম্য লৌকিক মনের স্পর্শ পাওয়া যায় তা সত্যিই রীতিমত উপভোগ্য।

বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ প্রয়াত সুধাংশুকুমার রায় শোলা শিল্পের অন্য আর একটি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে লিখেছেন যে, একসময়ে শোলার পুতুল দিয়ে পূব-বঙ্গের খুলনা জেলার চিতলমারিতে পুতুল নাচ দেখাতেন মালাকার সম্প্রদায়। এই শোলার

পুতুলগুলি হত দু'ধরনের। সে পুতুলনাচের একটায় থাকতো স্বাভাবিক শোলার তৈরি পৃষ্ঠপট এবং অন্যটায় থাকতো লিনেন দিয়ে তৈরি পৃষ্ঠপট।

বিভিন্ন জীবজন্তু ও পশুপাখি সহ মানুষের প্রতিমূর্তি তৈবির কাজে একদা হাওড়া জেলার বেলুড়ের নিকটবর্তী বারাকপুরের শোলা-শিল্পীদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর রাসের সময় এখানে যে মেলা বসে তাতে স্থানীয় শোলাশিল্পীদের তৈরি বেশ কিছু শোলার পুতুল-খেলনা বিক্রির জন্য আসে। তাছাড়া এখানেব রাস উৎসবের শোলার নানাবিধ সজ্জাও রীতিমত দর্শনীয়। এখানাকার কোন এক শিল্পীর তৈরি একটি সুন্দর হনুমান মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় আছে।

কলকাতার কাছাকাছি শোলা শিল্পের আর এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মহেশপুর, যেখানে শোলার নানাবিধ সজ্জাদ্রব্য প্রস্তুত ছাড়াও সবচেয়ে বেশি কাজ হয় চাঁদমালা নির্মাণের।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, শোলার নানান দ্রব্য নির্মাণের মধ্যে একসময়ে ইংরেজ রাজত্বে অর্থকবী শিল্প হিসাবে মালাকার সম্প্রদায় বিশেষ এক ধরনের শোলার টুপি নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। টুপিব গোটা কাঠামোটি শোলায় নির্মিত হলেও, তার উপরে মুসলমান কারিকরেরা আচ্ছাদন হিসাবে খাকি কাপড়ে মুড়ে সেটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতেন। বর্তমানে সে টুপির চাহিদা না থাকায় এ শিল্পটির বর্তমানে বিলুপ্তি ঘটেছে।
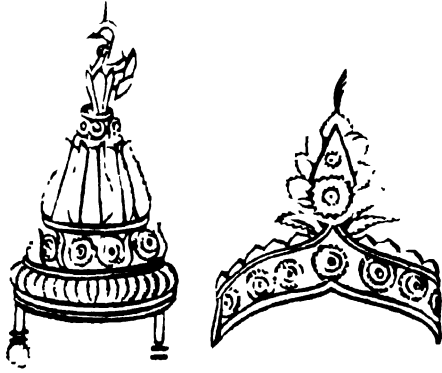
শোলার টোপব ও সিঁথি মৌব

বাস্তবিক পক্ষে শোলার মত নরম একটি উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যগুলির সৃষ্টি বিশেষ শিল্পকুশলতার পরিচয়বাহী। বংশানুক্রমিকভাবে শোলা-শিল্পীরা এই কাজ যথেষ্ট নিপুণতা ও যোগ্যতাব সঙ্গে আজও করে চলেছেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক রীতিনীতিগুলির প্রয়োজনে নির্মিত শোলার শিল্পকলায় সামান্য দৈন্যদশা দেখা গেলেও, পরিবর্ত হিসাবে বর্তমানে শোলার প্রতিমা রচনা ও সজ্জা থেকে অন্যান্য বিবিধ শোলার অলংকরণ-সজ্জার চাহিদার টানে শিল্পীসমাজ আজও স্বমহিমায় থেকে লোকশিল্পের ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন—যা একান্তই সান্ত্বনার বিষয়।

আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক মৃৎশিল্প

ক. মনসাঘট ও মনসাচালি

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় লোকদেবতা হিসাবে পূজিত দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি লোকশিল্প হল মনসা ঘট, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় মনসাবারি ঘট। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় এলাকায় মনসাপূজা অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিশেষ করে, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে দেবী মনসার থান লক্ষ করা যায়। কোথাও কোথাও মাটির বা ইটের দেওয়ালযুক্ত পাকা কোন মন্দির থেকে থাকলেও, অধিকাংশ স্থানে গাছতলায় দেবীর অধিষ্ঠান এবং সেখানে দেবী মূর্তি হিসাবে পূজিত হয় মনসা-ঘট, যাকে বলা হয় মনসাবারি। দেবী মূর্তির প্রতিকৃতি হ'ল, পোড়ামাটির কালো বা লালবর্ণযুক্ত এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতির ঘটের গায়ে সংবদ্ধ ফণাযুক্ত সাপ। এই সাপের ফণা আবার ঘটের আকার অনুযায়ী কোথাও হয় এক, বা তিন, বা পাঁচ, অথবা সাত ও আরও অনেক। তবে তিনটে সাপের মূর্তি বসানো মনসা ঘটের প্রচলনই বেশি। অনেক স্থানে আবার মাটির বা ইটবাঁধানো বেদীতে এই মনসা ঘট সাজানো থাকে।
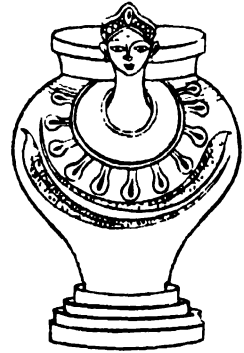
পাঁচমুড়োর (বাঁকুড়া) মনসাঘট

মনসা ঘট ছাড়া বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো ও সোনামুখির আর একটি অপরূপ শিল্পকৃতি হ'ল মনসার চালি বা মনসার মেড়। চাল বা চালচিত্র থেকে হয়ত 'চালি' কথাটি এসে থাকবে। মনসার চালি বলা হলেই বুঝতে হবে ফণাযুক্ত সাপের প্রতিমূর্তি পর পর সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে তৈরি করা পোড়ামাটির কালো রঙের একটি প্রতিমূর্তি, যা শিল্প সৌকর্যে অতুলনীয়। একটি উপুড় করা লম্বাটে ধরনের ঘটের গায়ে অর্ধবৃত্তাকারভাবে এই চালি প্রস্তুত করা হয়; যার গায়ে সাঁটা থাকে অসংখ্য ফণাযুক্ত সাপ ও ফুল। চালিতে অসংখ্য সাপের ফণা বিস্তারের মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় তা এক ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপে দর্শিত হলেও সেটির নান্দনিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। কোন সময় পরপর দু'থাক বা সাত থাক পর্যন্ত একত্র করে এই চালি নির্মাণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনসা-চালির উপরের কেন্দ্রীয় স্থানে গলায় মালা ঝোলানো যে মূর্তিটি দেখা যায় সেটি কৃষ্ণের আদলেই তৈরি। এ ধরনের আরও তিনটি মূর্তি নিচের দিকে নিবদ্ধ হয়। এছাড়া মধ্যস্থলে কমপক্ষে সারিবদ্ধ ছ'টি দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি দেখা যায়। সর্পদেবী মনসার তেমন কোন মূর্তি দেখা না গেলেও সমগ্র চালিতে অধিকাংশ স্থান জুড়ে

উদ্যত ফণা সর্পরাজিই যে দেবী মনসার প্রতীক হিসাবে উৎকীর্ণ হয়েছে তাই মনে হয়। সাধারণত এগুলি উচ্চতায় ও প্রস্থে হয় এক থেকে দেড় মি. এবং রঙ হয় উজ্জ্বল কালো। উল্লেখ্য যে, পোড়ামাটির এই শিল্প নিদর্শনটি দেখে মনে হবে যেন কালো রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। আসলে কাঁচা অবস্থায় এগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পোনে ধোঁয়া বেরুবার পথ বন্ধ করে পোড়াবার দরুন এই চালিগুলি উজ্জ্বল কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

মনসা চালি পাঁচমুড়ো বাঁকুড়া

বহুদিন ধরে প্রচলিত এবং প্রথাগত নির্মাণশৈলী অনুসারে মনসাবারি বা চালির এই বিন্যাস একটা নির্দিষ্ট বাঁধাধবা নিয়মেই পর্যবসিত হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ো ও সোনামুখি এলাকার কুম্ভকার সম্প্রদায়ই বংশানুক্রমে এই মনসা চালি বা মনসা মেড় নির্মাণ করে থাকেন। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র মৃৎশিল্প কেন্দ্রগুলিতে অসংখ্য নানা ধরনের মনসা ঘট তৈরি হয়ে থাকে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এই ধরনের শত-সহস্র মনসা ঘট ও মনসা চালি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ভক্তরা মনসা পুজোর জন্যে কুম্ভকার পল্লী থেকে ক্রয় করে থাকেন।
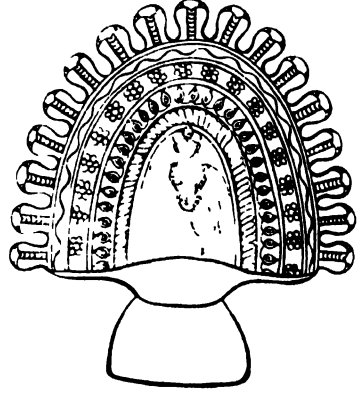
খ. পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া : নানান ঘরানা

লৌকিক দেবদেবীর থানে মানত হিসাবে হাতি-ঘোড়া উৎসর্গ করার প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথাটি নয়, পশ্চিমের গোটা ভারত জুড়েই এই হাতি-ঘোড়া উৎসর্গ প্রথার ব্যাপ্তি লক্ষ করা যায়। শুধু মানত নয়, বহুস্থানে গ্রাম-দেবতার প্রতীক হিসাবে হাতি-ঘোড়া পূজিত হয়। অতএব যেখানে মৃৎশিল্পীদের সৃষ্ট যেসব হাতি-ঘোড়া তৈরি হয়, সেগুলিই ভক্তদের দৌলতে চলে আসে গ্রাম-দেবতার থানে। তাই বিভিন্ন স্থানের মৃৎশিল্পীদের হাতে পড়ে এসব হাতি-ঘোড়ার গড়নও হয়েছে নানা ধরনের ও বিভিন্ন আকৃতির। আসলে ঘোড়া-হাতি তৈরির পদ্ধতি প্রায় সমগোত্রীয় হলেও একজায়গার কেন্দ্রীভূত শিল্পীরা যে ঠাটবাটের ঘোড়া-হাতি তৈরি করেন, অন্যস্থানের মৃৎশিল্পীদের তৈরি ঘোড়া-হাতির গড়ন আবার ভিন্নরকমের। ফলে গোষ্ঠীগত এই তফাৎটাই হাতি-ঘোড়ার ঘরানা চিহ্নিত করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
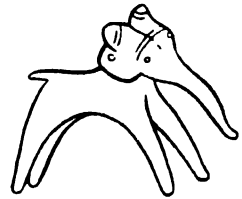
পাঁচমুড়োর নিরেট হাতি

বলা বাহুল্য, এই হাতি-ঘোড়া তৈরির মৃৎশিল্পীরা হলেন বাংলার কুম্ভকার সম্প্রদায়, যারা আবহমানকাল দরে লৌকিক দেবতার থানে উৎসর্গীকৃত এই হাতি-ঘোড়া তৈরি করে আসছেন। লোকধর্মের সঙ্গে এইসব হাতি-ঘোড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো বছর আগে তৈরি হাতি-ঘোড়া বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর থানে আজও দেখতে পাওয়া যায়। যা থেকে এই প্রথাগত শিল্পধারার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

কাঁটালির্যাব (মুর্শিদাবাদ) নিরেট গড়নের ঘোড়া

মানত হিসাবে দেবস্থানে বা পিরস্থানে উৎসর্গীকৃত হাতি-ঘোড়াগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় নিরেট গড়নের এবং ক্ষুদ্রাকৃতি। তবে কুম্ভকারের চাকে তৈরি ফাঁপা জাতীয় আর এক ধরনের বড় আকারের দৃষ্টিনন্দন ঘোড়া-হাতি তৈরি হয় যার উদ্দেশ্য ঐ একই, অর্থাৎ দেবতার কাছে মানত হিসাবে প্রদান। ফাঁপা পেট, ফাঁপা পা ও ফাঁপা মুণ্ডু এই তিনটি হল এ জাতীয় হাতি-ঘোড়ার প্রধান অংশ। এই ভিতর ফাঁপা তিনটি অংশই তৈরি করা হয় কুম্ভকারদের চাকে। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাসার্ধ কম বা বেশি করা হয়। তারপর একটু শুকিয়ে গেলেই এই তিনটি অংশ জোড়া লাগাবার পালা। মুখের আদলটি আনা হয় আঙুলের সাহায্যে টিপে টিপে। ঘোড়ার চোখ বা গলায় অলংকরণের কাজ করা হয় বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'চিয়াড়ি'। ঘোড়ার লাগাম, কান ও লেজ আলাদাভাবে তৈরি করে জুড়ে দেওয়া হয়। হাতির ক্ষেত্রে শুঁড় বা কানও পৃথকভাবে তৈরি করে হাতির গায়ে সেঁটে দেওয়ার নিয়ম।

এছাড়া মৃৎশিল্পীরা এগুলি তৈবিতে আরও যেসব ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন সেগুলি হ'ল 'উচা', যা বাঁশের তৈরি অর্ধগোলাকার, পাথরের তৈরি 'বল্যা', যা দিয়ে ভেতরে ঠোকা লাগাবার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কাঠের তৈরি 'পিটনে', যেটি দিয়ে বাইরে ঠুকে ঠুকে আকার গঠনের কাজ করা হয়। এবার শিল্পবস্তুটিকে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নেবার পর তার ওপরে লাগায় 'বনক' রঙের প্রলেপ; কারিকর শিল্পীরা বহুস্থানে এই রঙকে বলে থাকেন 'বেলিবনক'। পাঁচমুড়োর কুম্ভকার শিল্পীরা অবশ্য প্রথমে প্রলেপ দেন দেশীয় প্রথায় তৈরি সাদা রঙের 'খড়ি গাদ', তারপর দেন হলদে রঙের 'ভালোগাদ' এবং সবশেষে উজ্জ্বল লালবর্ণের জন্য 'বনক' রঙ। (মৃৎশিল্পের বনক রঙ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট-১২' অধ্যায়)।

পাঁচমুড়োর ঘোড়া (বাঁকুড়া)

এবার শিল্পীরা তাদের 'পোন' বা ভাটিতে এইসব ঘোড়া-হাতি প্রথামত সাজিয়ে কাঠকুটো ও খড়পাতার আগুনে

পোড়াবার ব্যবস্থা করে। 'পোন' বা 'ভাটি' আবার দু'ধরনের হয়। একটা হ'ল গোলাকার যাকে বলা হয় 'বেড়াশাল' পোন এবং অন্যটি কুলোর আকার মত অর্ধগোলাকৃতি, যাকে বলা হয় 'শিউনাপোন'।

বনক রঙের প্রলেপের দরুন ঘোড়া-হাতিব রঙ দাঁড়ায় বেশ চকচকে পোড়ামটির রঙ, কিন্তু কালো রঙের হাতি-ঘোড়া তৈরি করতে হলে প্রচুব পরিমাণে ঘুঁটের আগুন করে পোনের ধোঁয়া বের হবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হাতি-ঘোড়াগুলি হয় চকচকে কালো বঙয়ের।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘোড়া-হাতি তৈরি হ'লেও, বিখ্যাত হয়েছে বাঁকুড়ার ঘোড়া। অবশ্য বাঁকুড়া জেলার নানা মৃৎশিল্প কেন্দ্রে হাতি-ঘোড়া তৈরি হলেও বিশেষভাবে নাম হয়েছে ঐ জেলার পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের তৈরি হাতি-ঘোড়া। একসময়ে এখানকার নির্মিত হাতি-ঘোড়া কেবলমাত্র মানতের উদ্দেশে অথবা প্রয়োজনে পুজোর প্রতীক হিসেবে তৈরি হয়ে বেচাকেনা হ'ত। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ঘোড়া-হাতির নির্মাণ কৌশলের মধ্যে যে শিল্প নিপুণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল সে বিষয়ে শিল্পরসিকদের কৃত নানান পত্র পত্রিকায় যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে, বিশেষ করে পাঁচমুড়োর ঘোড়া এখন দেশবিদেশের নানাস্থানে চালান যাচ্ছে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে। সুতরাং পাঁচমুড়োর ঘোড়া-হাতি এখন জগৎবিখ্যাত শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবে একথা সত্যি, পাঁচমুড়োর হাতি-ঘোড়া অন্যান্য সব মৃৎশিল্পের কেন্দ্র অপেক্ষা গঠন নৈপুণ্যে যে খুবই সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফলত পাঁচমুড়োর ঘোড়া-হাতি, বিশেষ করে সেখানকার ঘোড়া আজ তাই সাধারণের কাছে বাঁকুড়ার ঘোড়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও পাঁচমুড়ো ছাড়া বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র কুম্ভকার পল্লীতেও যথার্থ লোকশিল্পের অনুসারী ঘোড়া-হাতি তৈরি হয়।

পাঁচমুড়ো ছাড়া, বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য স্থানে চাকে তৈরি পৃথক পৃথক গড়নের যেসব হাতি-ঘোড়া তৈরি হয় সে স্থানগুলি হ'ল সোনামুখি, হামিরপুর, কামারডিহা, বিবরদা, স্যান্দড়া, রাজগ্রাম, কেয়াবতী, জয়কৃষ্ণপুর নাকাইজুড়ি, জোতবিহার, ইঁদাস, বিষ্ণুপুরের উলিয়াড়া ও নিমতলা, মেটালি, পাত্রশায়ের ও মুরলু। তবে এর মধ্যে প্রধান কেন্দ্রগুলি হ'ল পাঁচমুড়ো, রাজগ্রাম, সোনামুখি ও হামিরপুর। লক্ষ করার বিষয় হ'ল, পাঁচমুড়ো বাদে, এসব স্থানের ঘোড়া-হাতির শিল্পনৈপুণ্য ভিত্তিক কমনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ তেমন কোন প্রচার না থাকার ফলে পাঁচমুড়োর নাম এখন সর্বোচ্চ শীর্ষে।

সোনামুখিব (বাঁকুড়া) ঘোড়া

পাঁচমুড়োর ঘোড়ার তুলনায় সোনামুখির ঘোড়ার গড়ন বেশ কিছুটা ভিন্ন ধরনের। পাঁচমুড়োর ঘোড়াগুলির লাগামসহ গলার গড়ন অনেকটা জিরাফের মত লম্বাটে; কানগুলিও

বাঁশপাতার মত লম্বা, ক্ষুদ্র সরু লেজ, যা বাঁকানোভাবে অর্ধগোলাকার হয়ে ঝুলতে থাকে। এছাড়া পাঁচমুড়োর ঘোড়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ঘোড়ার গলাব অংশে জোড়া মালা ছাড়া গায়ে তেমন কোন অলংকরণ নেই। একই গড়নের লাল ও কালো দু'রঙের ঘোড়া এখানে তৈরি হয়। অন্যদিকে সোনামুখির ঘোড়ার গলা বেশ খাটো মাপের ও লম্বাটে ধরনের। এখানের ঘোড়া লাগামবিহীন ও কান স্বাভাবিক ঘোডার মতই, লেজ দেহের সঙ্গে লাগানো।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে. বর্তমানে পাঁচমুড়োর ঘোড়ার কান ও লেজ আলাদাভাবে তৈরি করা হয় এবং পবে সেগুলি ঘোড়ার দেহে ফুটো করা নির্দিষ্ট ছিদ্রে সেঁটে দেওয়া হয়। আসলে তৈরি পদ্ধতিব মধ্যে এই প্রথাটি শুরু হয়েছে যখন পাঁচমুড়োর ঘোড়া দেশ-বিদেশে চালান যেতে শুরু হয়। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ঘোড়ার দেহেব সঙ্গে তৈরির প্রথম থেকেই কান ও লেজ জুড়ে দেওয়ার ফলে অন্যত্র পাঠানোর দরুন নাড়াচাড়ার সময় সেগুলি সহজেই ভেঙে যায়। সেজন্য পাঁচমুড়োর ঘোড়ার কান ও লেজ আলাদা করে তৈরি করে পরে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এমন কি বড় আকাবের ঘোড়ার দেহটিকেও আজকাল দু'খোলে তৈবি করা হচ্ছে, যাতে সহজেই ক্ষুদ্র পরিসরের মোড়কে পাঠাতে পাবা যায়। যেহেতু সোনামুখি বা বাঁকুড়ার অন্যান্য স্থানের তৈরি ঘোড়ার তেমন কোন ব্যবসায়িক চাহিদা গড়ে ওঠেনি, তাই সেখানকার ঘোড়ার লেজ ও কান পূর্ব প্রথাগতভাবেই প্রথম থেকেই দেহের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সোনামুখি ঘোড়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, ঘোড়ার গলার কাছে মালা ঝোলানোর মত বা-রিলিকে খোদাই বেশ কিছু অলংকরণ। কারণ সোনামুখির শিল্পীরা দেখেছেন পির-ফকিররা যখন তাদের টাট্টু ঘোড়াটি নিয়ে গৃহস্থের দোরে দোরে ভিক্ষে করতে যান, তখন সে ঘোড়ার গলায় স্বল্পমূল্যের পুঁতির অলংকার শোভিত থাকে। সেদিক থেকে সোনামুখির মৃৎশিল্পীরা কল্পনা ছাড়াই বাস্তব দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে তাদের কৃত শিল্পটির রূপায়ণে তৎপর হয়েছেন।
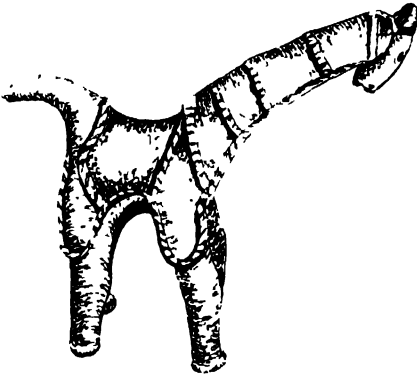
পুরুলিযাব ঘোড়া ঃ কালিদহ

বাঁকুড়া শহরের পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং দারকেশ্বর নদের অপর তীরে অবস্থিত রাজগ্রামের কুম্ভকার পল্লীতে আর এক ধরনের ঘোড়া তৈরি হয়। এ ঘোড়ার আকার অবশ্য স্বাভাবিক ধরনের, গলা সামান্য বাঁকানো এবং লাগাম যুক্ত এবং ছোট আকারের লেজটি

দেহের সঙ্গেই সাঁটা। এখানের ঘোড়ারও গলার কাছে পুঁতির মালার ধরনের অলংকরণ শোভিত এবং ঘোড়ার পিঠে নকশা উৎকীর্ণ। অনুরূপ বাঁকুড়া শহরের অন্য প্রান্তে স্যান্দড়া গ্রামের কুম্ভকার শিল্পীদের ঘোড়াও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ ঘোড়ার গায়ে আবার অলংকরণের প্রাচুর্য, কিন্তু শরীরের আদলটি অবশ্য রাজগ্রামের ঘোড়ার মতই। ঘোড়ার কান ও লেজ দেহের সঙ্গেই যুক্ত।

রাজগ্রামের ঘোড়া (বাঁকুড়া)

বিষ্ণুপুর এলাকার বিষ্ণুপুর ও উলিয়াড়ার কুম্ভকার পল্লীতে নির্মিত ঘোড়াগুলির ধরন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। উলিয়াড়ার ঘোড়ার গলাটি পাঁচমুড়োর ঘোড়ার মতই লম্বাটে ধরনের, লাগাম সহ গলার কাছে অলংকৃত এবং বিষ্ণুপুরের ঘোড়ার মাথাগুলি ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মত, অনেক সময় লাগামবিহীন। তবে এখানের দুটি ঘরানার ঘোড়ার লেজগুলি মোটা ধরনের সামান্য খাড়া।

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানার এলাকাধীন মুরলুগ্রামের কুম্ভকার সম্প্রদায় যে পোড়ামাটির ঘোড়া তৈরি করেন তা এক ভিন্ন আকৃতির। এখানকার এ ঘোড়ার গলা তেমন উঁচু নয়, বরং গলাটি নিচু হয়ে সামনের দিকে প্রসারিত, ঠিক যেন প্রাগৈতিহাসিক ডাইনসোরের মত। ঘোড়ার চার পা ও গলা চাকে তৈরি করে দেহের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এর লেজটিও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ সেটি সরু নয়, পায়ের আকৃতির মত এক মোটা লেজ। এ ঘোড়ার অলংকরণ বলতে গলার কাছে মাথার ও ধড়ের দু'প্রান্তে বেড় দিয়ে পরপর বিন্দু চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেমন কোন সমতা নেই বলেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানকার ঘোড়াগুলি লোকশিল্পের এক সার্থক নিদর্শন।

পাশাপাশি এ জেলার বড়জোড়া থানার মেটালি গ্রামেও বেশ কয়েকঘর কুম্ভকার সম্প্রদায়ের বসবাস। সুতরাং নিজ বৃত্তি অনুসারে এখানকার মৃৎশিল্পীরা হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি নির্মাণের সঙ্গে পোড়ামাটির বৃহদাকার হাতি-ঘোড়াও তৈরি করে থাকেন, তবে তা একেবারেই সাদামাঠা।

বাঁকুড়া জেলায় পোড়ামাটির ঘোড়া-হাতি তৈরির আর একটি কেন্দ্র হ'ল ইঁদাস থানার এলাকাধীন জোতবিহার ও পাত্রসায়ের থানার অধীন হামিরপুর গ্রাম। এখানেও চাকে তৈরি লম্বা গলার যেসব ঘোড়া তৈরি হয় সেগুলি
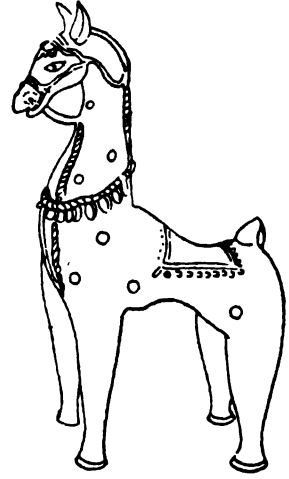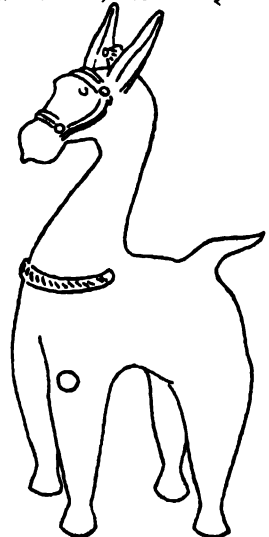
বিষ্ণুপুরের ঘোড়া (বাঁকুড়া)

মুরলুর মতই বেশ একটু সাদামাঠা নীরস ধরনের এবং তেমন অলংকরণের বাহুল্য নেই। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার বাকি অন্যান্য স্থানের তৈরি ঘোড়ার অবয়বে অল্প বিস্তর পার্থক্য নজরে পড়ে এবং বহুক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে সেগুলি আদিমতার লক্ষণযুক্ত লোকশিল্পের নিদর্শন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি মৃৎশিল্প কেন্দ্রে ঘোড়ার সঙ্গে হাতির মূর্তিও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঘোড়ার মত হাতিও গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর থানে মানত হিসাবে উৎসর্গ করার প্রথা আছে। তাই ঘোড়ার মত হাতির চাহিদাও গ্রাম গ্রামান্তরে। এ হাতি তৈরির পদ্ধতিও ঘোড়ার মত চাকে পা ও দেহ ফাঁপা করে সৃষ্ট এবং পরে যথাযথ জোড়া লাগিয়ে রূপদান করা হয়। তবে এ জেলার ভিন্ন ভিন্ন মৃৎশিল্প কেন্দ্রে তৈরি বিচিত্র গড়নের হাতির আকার ও অবয়বের মধ্যেও বেশ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোন কোন মৃৎশিল্প কেন্দ্রের শিল্পীর হাতে পড়ে হাতির শুঁড় হয় ওপরে তোলা আবার কোথাও বা সেটি নামানো, কোন কোন হাতি আবার গজদন্তযুক্ত, আবার কোথায় সাধারণ। বিভিন্ন স্থানের অধিকাংশ হাতির গায়ে ও গলায় অলংকরণ শোভিত দেখা যায়। তবে দৃষ্টিনন্দন এক ধরনের পোড়ামাটির লাল ও কালো রঙের হাতি তৈরি হয় স্যান্দড়ায়, যাকে বলা হয় বোঙা হাতি। আসলে বোঙাহাতি নামকরণের পশ্চাদ্‌পট হ'ল, সাঁওতাল আদিবাসীদের দেবতা বোঙার কাছে মানত হিসাবে উৎসর্গের জন্যই নামটি এসেছে বোঙাহাতি। এখানকার এই বোঙাহাতির বৈশিষ্ট্য হ'ল, গড়নে এটি পেটমোটা গোলাকার ধরনের এবং সেইসঙ্গে শুঁড় নামানো গজদন্ত যুক্ত এবং মাথায় ত্রিভুজাকৃতি পুঁতির মালার সদৃশ অলংকরণ। আরণ্যক এই পশুটির স্মৃতিবাহী পোড়ামাটির মূর্তিতে রূপান্তরিত বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অবয়বের এই হাতিগুলি বাংলার লোকশিল্পের এক সার্থক নিদর্শন।

উলিয়াড়াব ঘোড়া (বাঁকুড়া)

বাঁকুড়া জেলার ঘোড়া-হাতির নানান ঘরানা সম্পর্কিত আলোচনার পর এবার অন্য জেলার কুম্ভকার শিল্পীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। যেহেতু ঘোড়া-হাতি লৌকিক দেবদেবীর থানে মানত হিসাবে দেবার অথবা দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজার্চনা করার প্রথা, তাই বাঁকুড়ার মত পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানেই স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে এলাকার স্থানীয় কুম্ভকার শিল্পীরা তাদের প্রথাগত শিল্পশৈলী অনুসারে চাকে তৈরি ফাঁপা ধরনের ঘোড়া-হাতি তৈরি করে থাকেন। পাশাপাশি মেদিনীপুর জেলার জামবনি থানা এলাকার অন্তর্গত বেলিয়া, মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন বেলে-কুমোরপাড়া ও মির্জাবাজার এবং কেশপুর থানার রায়গ্রাম প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকার শিল্পীরা নানান গড়নের যেসব ঘোড়া-হাতি তৈরি করে থাকেন তা বাঁকুড়া জেলার মৃৎশিল্পীদের কৃত ঘোড়া-হাতির চেয়ে কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। জামবনির বেলিয়া

কুমোরপাড়ার ঘোড়া বেশ মনোরম অলংকৃত, লম্বা সোজা গলা, কান ছোট এবং লেজ বাঁকানো আকারে দেহের সঙ্গে লেপ্টে থাকে এবং তদুপরি ঘোড়ার পিঠের উপর জিন হিসাবে চৌকো নকশা করা চাদরের অলংকরণ। তবে এখানকার ঘোড়া-হাতিগুলি তেমন উচ্চতা সম্পন্ন না হ'লেও ৪৫ সেমি. থেকে ৬০ সেমি. পর্যন্ত খাড়াই।

অন্যদিকে মেদিনীপুরের বেলিযা-কুমোরপাড়ার ঘোড়াও বেশ বড়সড় আকারে লাল ও কালো রঙে তৈরি হয এবং সে ঘোড়ার গড়নও পাঁচমুড়োর সমতুল্য এক মার্জিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। এখানেব ঘোড়ার কানগুলিও পাঁচমুড়োর মত বেশ চওড়া ও খাড়া, লেজও তাই, যা দেহের সঙ্গে সাঁটা। ঘোড়ার লাগাম সহ গলার নিচে বা-বিলিকে উৎকীর্ণ অলংকরণ, পিঠে জিনের চাদর বিছানো। এখানের শিল্পীদের তৈরি বড় আকারের ঘোড়াগুলি ছাড়াও তিরিশ থেকে ষাট সেমি. উচ্চতাবিশিষ্ট আরও তিন-চার রকম গড়নের ঘোড়া তৈরি হয়, যা একান্তই অভিনব বলা যেতে পারে। তবে এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরি বড় থেকে ছোট আকারের যেসব হাতি দেখা যায় সেগুলিও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। গজদন্তযুক্ত বড় হাতিগুলির শুঁড় সামনের দিকে নামানো, অর্ধগোলাকৃতি বৃহৎ আকারের কান, লেজ আবার বাঁকানো অবস্থায় উর্ধ্বমুখি, মাথায় মালার অলংকরণ, পিঠে মাহুত বসার স্থানটিতে জিন বিছানো — সব মিলিয়ে নিখুঁত করার দিকেই যেন শিল্পীদের নজর। এখানের ছোট ছোট হাতিগুলি সাদামাঠা হলেও বেশ দৃষ্টিনন্দন। এক ধরনের ছোট শুঁড় ও গোলাকার অবয়বই হ'ল এই
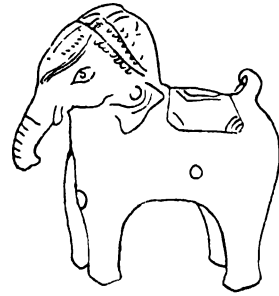
উলিযাডাব হাতি (বাঁকুড়া)
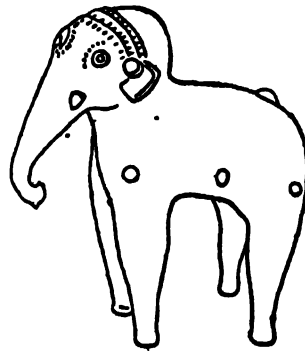
রাজগ্রাম ও পাঁচমুড়োর হাতি (বাঁকুড়া)

হাতিগুলির বিশেষত্ব। এছাড়া ছোট আকারের আরও যে ধরনের হাতি এখানে তৈরি হয়, তার গায়েও বেশ কিছু অলংকরণ দেখা যায়। মোট কথা, মেদিনীপুর-বেলিয়ার কুম্ভকার সমাজের কৃত হাতি-ঘোড়াগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণকারী লোকশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

সবচেয়ে ভিন্নধরনের এক ঘোড়া তৈরি হয় মেদিনীপুর শহরের কুমোরপাড়া মির্জাবাজারে। যদিও এখানের ঘোড়াগুলি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি. উচ্চতাবিশিষ্ট আকারে চাকে তৈরি হয়, তবে সেগুলির গড়ন আবার নানা ধরনের। ঘোড়াগুলির মাথা সামনের দিকে প্রসারিত, কোন কোনটি আবার সেগুলির মুখব্যাদান করে থাকা মুখমণ্ডল — সব মিলিয়ে বেশ অভিনব।

মেদিনীপুর জেলার মত পুরুলিয়া জেলার নানাস্থানের কুম্ভকার পল্লীতে ঘোড়া-হাতি তৈরি হয়। যদিও সেখানকার ঘোড়ার আকৃতি পাঁচমুড়োর মত উচ্চতাসম্পন্ন নয়, তাহলেও মাঝারি আকারের গলা নিচু বা উঁচু ধরনের অলংকরণবিহীন সেসব ঘোড়াগুলি গঠন বৈচিত্র্যে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং সেইসঙ্গে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধারক। পুরুলিয়া জেলার যেসব স্থানে পোড়ামাটির হাতিঘোড়া তৈরি হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কালিদহ, সেনেড়া, ভাঙাবাঁধ, গোলকুঁড়া ও করখালি প্রভৃতি গ্রাম।

বীরভূম জেলায় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া তৈরির আর একটি কেন্দ্র হ'ল, ঐ জেলার খয়রাশোল থানার এলাকাধীন বাবুইজোড় গ্রাম। এখানে মানত হিসাবে উৎসর্গের জন্য যেমন হাতে তৈরি ছোট ছোট ঘোড়া তৈরি হয়, তেমনি এখানকার কুম্ভকার মৃৎশিল্পীরা প্রস্তুত করে থাকেন চাকে তৈরি ফাঁপা আকৃতির হাতি-ঘোড়া, যা অবশ্য উচ্চতায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি.।

এছাড়া, এজেলার রাজনগরের কেওটাবাঁধ এলাকাতেও কিছু কিছু হাতি-ঘোড়া তৈরি হয়, যা আবার বাবুইজোড়ের থেকে কিছুটা ভিন্ন গঠনের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্ধমান জেলার অণ্ডালের নিকটবর্তী কুমারডিহি গ্রামের কুম্ভকার শিল্পীরাও পোড়ামাটির হাতি-গোড়া নির্মাণ করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত এইসব জেলাগুলিতে পোড়ামাটির ফাঁপা হাতি-ঘোড়া তৈরির কেন্দ্রস্থল ছাড়া, উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কয়েকটি কুম্ভকার পল্লীতেও ফাঁপা ধরনের বেশ কিছু ঘোড়া তৈরি হয়ে থাকে। তবে সেগুলির গড়ন বেশ একটা উচ্চতাসম্পন্ন না হলেও সেখানকার ঘোড়াগুলির আকৃতির মধ্যে বাঁকুড়া জেলার ঘোড়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কুম্ভকারের চাকে তৈরি ফাঁপা ধরনের প্রথাগত পোড়ামাটির ঘোড়া-হাতি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার মৃৎশিল্পীরা ক্ষুদ্রাকৃতি নিরেট বেশ কিছু ঘোড়া-হাতি হাতে প্রস্তুত করে থাকেন। তবে সেসব ঘোড়া হাতে গঠিত হলেও সেসব ঘোড়ার শিল্পকৃতির মধ্যে বেশ আদিমতার ছাপ লক্ষ করা যায়। হাতে তৈরি নিরেট ঘোড়া-হাতি তৈরির বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র হল, বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার এলাকাধীন বাঁধসেগুা মৌজার অধীন গোরাপাড়া, নদিয়া

জেলার শান্তিপুরের চৌগাছাপাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কার নিকটবর্তী নয়নপুর, মহাদেবনগর ও হাজারপুর, মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বারই, কুশিদা ও খড়বা থানার রামপুর, দারকিনারা এবং ইংলিশবাজার থানার মহদীপুর, মেদিনীপুর জেলার মির্জাবাজার এবং পুরুলিয়া জেলার রায়বাঘিনী, বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ো প্রভৃতি কুম্ভকার পল্লী।

সমাজজীবনের নানা পরিবর্তনের ধাক্কায় পড়ে ঘোড়া-হাতির চাহিদা ক্রমশ কমে আসছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পাঁচমুড়োর ঘোড়ার চাহিদাদৃষ্টে সোনামুখির কুম্ভকার শিল্পীরা বর্তমানে তাদের প্রথাগত নিজস্ব শৈলী বিসর্জন দিয়ে নিজেদের বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে পাঁচমুড়োর ঘোড়া-হাতির ধরন নকল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেদিক থেকে পুরানো ধরনের যেসব হাতি-ঘোড়া বিভিন্ন লোকশিল্পের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে বা কোন দেবস্থানে উৎসর্গীকৃত ঘোড়া-হাতির স্তূপেব মধ্যে এখনও গাদাগাদিভাবে রয়েছে, সেগুলির গঠন শৈলীর সঙ্গে হালের তৈবি ঘোড়া-হাতির শিল্পধাবাব মধ্যে বেশ পার্থক্য নজরে পড়ে। সুতরাং এই অবস্থায় বিভিন্ন মৃৎশিল্প কেন্দ্রের সৃষ্ট ঘোড়া-হাতির সংগ্রহ নিয়ে একটি পৃথক পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অন্যথায় বাংলার এই অনন্য লোকশিল্পের সমগ্র নিদর্শন অচিরেই বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গ. দুলদুল ঘোড়া

ঘোড়ার প্রসঙ্গ যখন এলো, তখন কাপড়ের তৈরি 'দুলদুল' ঘোড়াব কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ঘোড়া বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় উৎসব মহরম-এর সময় ব্যাপকভাবে বিক্রির জন্য আনা হয়। ঘোড়াগুলি উচ্চতায় হয় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেমি.। এ ঘোড়া নির্মাণের জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কাঠামো তৈরি করে সেটিকে ভরাট করা হয় খড়, পাট ও বালি বা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে। তারপর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ঘোড়ার অবয়বটি সম্পন্ন করা হয়। এবার নানান রঙের কালো, লাল, সাদা ও সবুজ কাগজ এবং সেইসঙ্গে জরির ফিতে লাগিয়ে সেটিকে অলংকৃত করা হয়। বর্ধমান জেলার অণ্ডাল, হাওড়া জেলার পাঁচলা এলাকা এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি স্থান এই দুলদুল ঘোড়া তৈরির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল।

ঘ. পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ

বাংলার লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকশিল্পের এক উদাহরণ হ'ল পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ; অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র তুলসীবৃক্ষ যে বাঁধানো বেদীতে রোগন করা হয়, সেই অধিষ্ঠান বেদীই হ'ল তুলসীমঞ্চ। গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রতি গৃহস্থের বাস্তুভূমির এক নির্দিষ্ট স্থানে যে তুলসী গাছটি বসানো হয় সেখানে নিত্যপূজা ছাড়াও গৃহস্থ বধূরা প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা প্রণাম সারেন। সুতরাং গরিব গৃহস্থেরা কেউ মাটির তৈরি বেদী নির্মাণ করে তার মধ্যস্থলে তুলসীগাছ বসাতেন; বিত্ত বিশেষে অনেকে আবার ইট-চুনবালি সহযোগে

ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা মন্দির বা দেউলাকৃতি মঞ্চ নির্মাণ করে তার উপরিভাগে তুলসীগাছ লাগিয়ে দিতেন। কখনো বা তুলসী মঞ্চের গায়ে আবার লিপি খোদাই করে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। মেদিনীপুর জেলার মণিনাথপুর গ্রামের চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এমন এক তুলসীমঞ্চে লিপি খোদাই রয়েছে, যার পাঠ ঃ 'রঘুনাথ তব পদে এই করি আশ/আজীবন থাকি যেন তব পদে দাস ।। রামচরণ /রাজমিস্ত্রি গুরুচরণ দলাই পিতা দর্পনারায়ণ / দলাই মেদিনীপুর তোড়াপাড়া।'
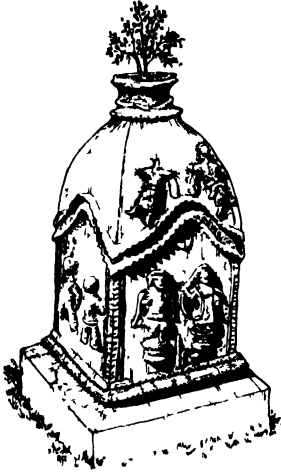
সাজুয়াপোতাব কুম্ভকারদের
তৈরি তুলসীমঞ্চ

অন্যদিকে, অর্থবানদের অনেকে স্থানীয় সূত্রধর শিল্পীদের দিয়ে ধাপকাটা ডমরুসদৃশ ইটের এক সুদৃশ্য তুলসীমঞ্চ স্থাপন করাতেন, যার উদাহরণ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে দেখা যায়। এছাড়া কোথাও বা ইঁটের তৈরি শুয়ে থাকা এক হাতির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে তার পিঠের উপর তুলসীগাছ লাগাবার ব্যবস্থা রাখতেন। এমন দুটি তুলসীমঞ্চের নিদর্শন দেখা যায়, মেদিনীপুর জেলার দাসপুর ও তিলন্তপাড়া গ্রামে।

এছাড়া চারদিক খোলা একটি পঞ্চরত্ন রীতির ছোটখাটো মন্দির নির্মাণ করে সেটির গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে যে তুলসীগাছ রোপন করা হ'ত এমন উদাহরণেরও অভাব নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ করে পাঁশকুড়া ও তমলুক থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে 'হরিসভা' বা 'হরি মন্দির' নামে কথিত বসতবাড়ি সংলগ্ন কোন চত্বরে সংস্থাপিত হয় একই সঙ্গে লাগোয়া পাঁচটি তুলসীমঞ্চ, যার মধ্যেরটি হয় বড় আকারের এবং চারকোণের চারটি হয় ক্ষুদ্রাকৃতি।

তুলসীমঞ্চ প্রসঙ্গে সেকালের আর একটি লুপ্তপ্রায় প্রথা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সেকালে প্রতিষ্ঠিত বাঁধানো তুলসীমঞ্চে রোপিত তুলসীগাছের গোড়ায় দেবীর উদ্দেশে মুদ্রা উৎসর্গের রীতি বিদ্যমান ছিল। এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহশালার উৎসাহী সংগঠকেরা এইভাবে এক ভগ্ন তুলসীমঞ্চে অনুসন্ধান চালিয়ে বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করেন।

পবিত্র তুলসীবৃক্ষটিকে উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের যেসব মঞ্চে রোপন করা হয়, সেগুলির প্রসঙ্গ আলোচনার পর অন্য আর একটি সুদৃশ্য আঞ্চলিক প্রথাগত তুলসীমঞ্চ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এ তুলসীমঞ্চটি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের জন্য মেদিনীপুর জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায় নির্মাণ করে থাকেন। ভিতরটি ফাঁপা এবং চৌকো, ছ'কোণা বা

আটকোণা আকৃতির এইসব তুলসীমঞ্চ লোকশিল্পের এক অনুপম নিদর্শন। উল্লেখ্য যে, এটি সংগ্রহের জন্য গৃহস্থকে তেমন আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয় না।

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ো, তমলুক, সুতাহাটা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর সদর থানা এলাকার নানাস্থানে বসতকারি কুম্ভকার সম্প্রদায় আলোচ্য এই পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ নির্মাণের স্রষ্টা।

তুলসীমঞ্চগুলির আকৃতি সাধারণত চৌকো, ছ'কোণা বা আটকোণা। কোথাও আবার সম্পূর্ণ গোলাকার দেউল মন্দিরের ধরনেও এই তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করা হয়। কেশিয়াড়ি ও ময়না থানা এলাকায় দেখা যায় চৌকো ধরনের তুলসীমঞ্চের গায়ে চৌকো জানালা করে দেওয়া হয়েছে। উপরে কানা থেকে একটি মোটা মাটির নল নিচে পর্যন্ত প্রসারিত; অর্থাৎ ঐ নলটিতে মাটি ভরাট করে দেওয়া হয়, উপরে তুলসীগাছ লাগানো হয়, কিন্তু গোটা তুলসীমঞ্চটির চার গায়ে জানালা থাকায় মনে হয় যেন ক্ষুদ্র কোন চারচালা কুটির বিশেষ। সাধারণত এগুলি উচ্চতায় হয় ৪৫ সে.মি. (দেড় ফুট) থেকে ৯০ সেমি. (৩ ফুট) এবং এর ব্যাস হয় ৪৫ সেমি. (দেড় ফুট) থেকে ৬০ সেমি. (২ ফুট)। এগুলির দেওয়াল হয় ১ সেমি. (১/২ইঞ্চি) থেকে প্রায় ২ সেমি. (১ ইঞ্চি) পুরু।

আলোচিত এই তুলসীমঞ্চের উপরের অংশটির ছাদ সাধারণত স্তূপাকৃতি গোলাকার বা চৌকো ধরনের হয় এবং সে ছাদের মধ্যস্থলে সংযুক্ত করা হয় কলসির উপরিভাগের 'কানা' সদৃশ (বা স্থানীয়ভাবে সেটি 'মোকা' নামেও পরিচিত) অংশ; অর্থাৎ যা হ'ল কলসীর মুখের বেড় অংশের আকৃতি। কলসির 'কানা' কথাটি সম্পর্কে বৈষ্ণব সংগীতে আছে, 'মেরেছো কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেবনা' ইত্যাদি।

অন্যদিকে এই তুলসীমঞ্চের নিচের অংশটি ফাঁকা থাকে। কারণ উঠোনে মাটির উপর বসানোর পর মঞ্চটির ফাঁকা অংশে মাটি ভরাট করা হ'লে সেটি নিচের সমতল ভূমির মাটির সঙ্গে সংযোগ সাধন হওয়ায় রোপিত তুলসীগাছের পক্ষে শিকড় চালানোর সুবিধা হয়।

এখন এই যে চারকোণা, ছ'কোণা বা আটকোণা আকৃতির তুলসীমঞ্চের কথা বলা হ'ল এগুলির সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ঐসব তুলসীমঞ্চের দেওয়ালে অলংকরণ-সজ্জা হিসাবে বা-রিলিফে উৎকীর্ণ করা হয় নানান দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি। প্রতি দেওয়ালের চারপাশে থাকে উঁচু বর্ডার হিসাবে নকাশি সজ্জা। এছাড়া ফুল-লতাপাতার সজ্জা তো থাকেই; উপরন্তু কোথাও বা নিবদ্ধ হয় গৌর-নিতাই বা রাধাকৃষ্ণ, কোথাও বা জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা অথবা লক্ষ্মীনারায়ণ বা রামসীতার মূর্তি প্রভৃতি। খোল-করতাল বাদ্য-বাদক ও উর্ধ্ববাহু বৈষ্ণব ভক্তের মূর্তিও অবশ্য বাদ যায় না। সাবেকি দু'একটি তুলসীমঞ্চের দেওয়ালে দেখা যায় মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে চারপাশে অন্য সখীদের মূর্তি, যা মন্দির দেওয়ালে প্রথাগত রাসমণ্ডল মোটিফের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, লৌকিক শৈলী অনুসারী এসব পুতুলগুলি আগেই তৈরি করে পরে তুলসীমঞ্চের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। কোন কোন তুলসীমঞ্চের গায়ে আবার নানান শাস্ত্রবাক্য খোদাই করে দেওয়া হয়, যাতে লেখা থাকে,

'হরেকৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির' ইত্যাদি। কোন কোন তুলসীমঞ্চে আবার শিল্পীর নামও খোদাই করা থাকে, যার উদাহরণ হ'ল বেলিয়া কুমোরপাড়ার তৈরি এক তুলসীমঞ্চে লেখা আছে ঃ 'সেবাভিলাষি মৃৎশিল্পী শ্রীহরিপদ দাস সাং বেড়াপাল।'

তুলসীমঞ্চ তৈরি পদ্ধতির মধ্যে শিল্পীর বেশ মুন্সিয়ানা লক্ষ করা যায়। প্রথমত হাঁড়ি-কুড়ি তৈরির জন্য কুম্ভকাররা যে এঁতেল মাটি সংগ্রহ করেন সেই মাটির চার বা পাঁচ ভাগের সঙ্গে একভাগ বালি মিশিয়ে কাদার তাল তৈরি করা হয় এবং এই কাদার তাল ছায়ায় কয়েকদিন রেখে দেবার পর মৃৎশিল্পীরা তুলসীমঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেন। প্রথমে এই কাদার তাল থেকে সামান্য অংশ নিয়ে সেটিকে দড়ি বা কাছির আকৃতির মত লম্বাটে আকারে গোলাকার করে নেওয়া হয়, যা শিল্পীদের কথায় হ'ল 'শিড়া' তৈরি। এবার পরিকল্পিত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পরিমাপমত লম্বা এই শিড়াগুলিকে চওড়া কাঠের তক্তার উপর পাশাপাশি জুড়ে সেটিকে কাঠের পিঠনে দিয়ে পিটিয়ে সমতল করা হয়। এইভাবে পেটানোর দরুন ১ সে.মি. (১/২ ইঞ্চি) বা ২ সে.মি. (১ ইঞ্চি) পুরু অবস্থায় পৌঁছানোর পর তুলসীমঞ্চের দেওয়াল তৈরির কাজ শেষ হয়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চারকোণা তুলসীমঞ্চ করতে হলে এইভাবে চারটি কাদার রুটি তৈরি করতে হয় এবং ছ'কোণা হলে ছ'টি ও আটকোণা হলে পরিমাপমত আটটি দেওয়াল তৈরি করে নিতে হয়। এরপর শিল্পী তার কর্মদক্ষতামত পর পর ঐ দেওয়ালগুলিকে খাড়াভাবে জুড়ে জুড়ে মঞ্চের দেওয়াল অংশের কাজ শেষ করেন। দু'দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানটি শক্তভাবে জোড় লাগার জন্য সংযোগস্থলটিতে গোল করে লম্বা কাদার পটি জুড়ে দেওয়া হয়। এবার দেওয়ালের কাজ শেষ হলে বাকি থাকে উপরের চাল তৈরির কাজ।

এক্ষেত্রে শিল্পী তাদের চাকের সাহায্যে যেমন প্রথাগত কলসির কানাসহ উপরিভাগের অংশ তৈরি করেন, ঠিক সেইভাবেই চাক ঘুরিয়ে বেশ পুরু করে কলসির কানা সহ অর্ধকলসের আকারে ঐ অংশটি তৈরি করে সেটিকে তুলসীমঞ্চের ছাদ হিসাবে ঐ দেওয়ালের উপরে জুড়ে দেন। তবে লক্ষণীয় যে, চারচালা বা আটকোণা ধরনের যে ছাদই নির্মাণ করা হোক্ না কেন, ছাদের চাল প্রথাগত কুঁড়ে ঘরের ধনুকাকৃতি বাঁকানো চালের মতই নিচের দিকে অর্ধগোলাকৃতি চাল হিসাবে তৈরি করা হয়। এইভাবে তুলসীমঞ্চের ছাদ ও দেওয়াল নির্মাণপর্ব শেষ হয়। বলা বাহুল্য, তুলসীমঞ্চটিকে মাটির উপর বসানোর জন্য এর নিচের দিকটা যে ফাঁকা রাখার নিয়ম, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তুলসীমঞ্চের দেওয়াল ও ছাদ নির্মাণ হয়ে গেলে শিল্পীর পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন সব মূর্তি-পুতুল সাধারণভাবে হাতে তৈরি করে তুলসীমঞ্চের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। পুতুলগুলিকে অবশ্য নিখুঁত করার দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। মূর্তিগুলির গায়ে সরু শলাকা দিয়ে বিন্দু চিহ্ন এঁকে চোখ, নানাবিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রাবরণের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। তৈরি করা কাঁচা মঞ্চগুলিকে প্রথমে ছায়ায় রেখে পরে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এবার এর উপর আগাগোড়া বনক রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়, যার ফলে এগুলি পোড়ানোর পর লাল রঙ-এ শোভিত হয়। কুম্ভকার শিল্পীরা যখন তাদের প্রস্তুত অন্যান্য হাঁড়ি-কুড়িগুলিকে

'পোন'-এ পোড়াবার ব্যবস্থা করেন, তখন সেই ভাঁটিতে তুলসীমঞ্চগুলিকেও পোড়াবার জন্য রাখা হয়।

এইভাবে পোড়ানোর পর কুম্ভকার সম্প্রদায় তাদের অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে এইসব তুলসীমঞ্চগুলিকে হাটে-বাজারে বিক্রির জন্য এনে থাকেন। তবে বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোন গৃহস্থ পরিবার যখন তুলসীমঞ্চ স্থাপনের প্রয়োজনে কুম্ভকার শিল্পীদের কাছে বায়না দেন, তখন শিল্পীরা তাদের কৃৎকৌশল মাফিক তুলসীমঞ্চটি তৈরি করার পর নগদ টাকার পরিবর্তে গৃহস্থ উপযুক্ত ধুতি চাদর-গামছা ও চালডাল, তেল-নুন-শাকসব্জিসহ এক সিধে প্রদান করেন। এরপর নতুন তৈরি ঐ তুলসীমঞ্চটি উঠোনের এক নির্দিষ্টস্থানে স্থাপন করার পর সেটির ফাঁকা অংশে মাটি ভরাট করে উপরের কানা অংশের মধ্যিখানে একটি তুলসীগাছ বসিয়ে দিয়ে তুলসীমঞ্চ স্থাপনের কাজ সমাপন করা হয়।

আলোচ্য এইসব তুলসীমঞ্চের শিল্পীরা হলেন স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায়। বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ো, তমলুক ও সুতাহাটা থানা এলাকার নানাস্থানে বসতকারী কুম্ভকার শিল্পীরা দীর্ঘদিনের অনুশীলনে এই তুলসীমঞ্চ সৃষ্টির বিষয়ে বেশ দক্ষ ও কর্মকুশলী। উল্লিখিত পাঁশকুড়ো থানার অন্তর্গত মাগুরি, জগন্নাথচক, কেনাসি-বৃন্দাবনচক, ফকিরগঞ্জ, পূর্বচিল্কা, খসরবন, রঘুনাথবাড়ি ও সাধুয়াপোতা; তমলুক থানা এলাকার মধ্যে অনন্তপুর, যশোমন্তপুর ও খারুই এবং সুতাহাটা থানা এলাকার মধ্যে বাবুপুর প্রভৃতি স্থানে এইসব তুলসীমঞ্চ তৈরি শিল্পীদের কেন্দ্রীভূত বসবাস। এইসব এলাকার শিল্পীরা অবশ্য চারকোণা, ছ'কোণা ও আটকোণা তুলসীমঞ্চ তৈরির কারিগর। এছাড়া এ জেলার খড়্গপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত কাউথা এবং মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন বেলিয়া-কুমোরপাড়া ও ধেড়ুয়া গ্রামে বসবাসকারী কুম্ভকার শিল্পীরা নানাবিধ পোড়ামাটির ফাঁপা হাতিঘোড়া তৈরির সঙ্গে গোল ও চৌকো ধরনের তুলসীমঞ্চও নির্মাণ করে থাকেন। যদিও এই এলাকার শিল্পীদের তৈরি তুলসীমঞ্চের গঠনাকৃতির মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়, তাহলেও সেগুলি কম শিল্প-সুষমা সম্পন্ন নয়। আলোচ্য জেলার ঘাটাল থানা এলাকার কুম্ভকার সম্প্রদায়ও এক সময়ে নকশাদার সুন্দর সুন্দর তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করতেন, যার নিদর্শন এখনো এলাকার নানাস্থানে দেখা যায়। তবে অনুমান করা যায়, স্থানীয় তেমন চাহিদা না থাকায় এই এলাকার কুম্ভকার শিল্পীরা আর তেমন তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করছেন না।

পোড়ামাটির এসব তুলসীমঞ্চ ভঙ্গুর হলেও প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এমন সুদৃশ্য বহু তুলসীমঞ্চ নানাস্থানে দেখা যায়। সবচেয়ে প্রাচীন এক ভগ্ন পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের একটি অংশের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহশালায়। যদিও সম্পূর্ণ তুলসীমঞ্চটি পাওয়া যায়নি, বদলে পাওয়া গেছে সেটির দেওয়ালের একটিমাত্র অংশ, যাতে উৎকীর্ণ হয়েছে লৌকিক শিল্পানুসারী এক জৈন দেবতার মূর্তি। সেজন্য অনুমান করা যায়, হয়ত একসময়ে বাঁকুড়া জেলার কুম্ভকার সম্প্রদায়ও পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ নির্মাণ করতেন এবং সেইসঙ্গে সাবেকি জৈন সংস্কৃতি অধ্যুষিত এলাকায় এই ধরনের জৈনমূর্তি খোদাইকাজে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য যে, একদা গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত এবং বর্তমানে গুরুসদয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এমন একটি প্রাচীন অপরূপ চিত্তগ্রাহী তুলসীমঞ্চ সে সময়ের কুম্ভকার শিল্পীদের সৃষ্ট কারুকৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

দুঃখ ও আক্ষেপের কথা, একদিন যেমন গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে ধর্মাচরণের টানে স্বল্পমূল্যে সংগৃহীত এই তুলসীমঞ্চ গৃহস্থের পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যবর্ধনের সহায়ক হয়ে উঠতো, আজ কিন্তু আধুনিকতার আমেজে তার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন দেখা যায়, পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের বদলে তৈরি হচ্ছে সিমেন্টের ছাঁচে ফেলা তুলসীমঞ্চ। কোথাও বা এনামেল প্লেটে চিত্রিত রাধাকৃষ্ণের মূর্তিযুক্ত ফলক সেঁটে দেওয়া হচ্ছে এইসব সিমেন্টের তুলসীমঞ্চের গায়ে। ব্যবসায়ী বিষয়বুদ্ধির প্রলোভনে স্থায়িত্বের কথা ভেবে লোকে ছুটে চলেছে এইসব রুচিহীন পণ্যের দিকে। যে লোকশিল্পের কারিগরি নৈপুণ্য একদা সৌন্দর্যবর্ধনের সহায়ক ছিল, সেটির অবলুপ্তি এইভাবেই ঘটে চলেছে; অর্থাৎ চাহিদা না থাকায় প্রথাগত এই পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ আর তেমন নির্মিত হচ্ছে না। তবু এখনও পাঁশকুড়া, তমলুক ও সুতাহাটা থানা এলাকার দু'একটি স্থানের কুম্ভকার সম্প্রদায়ের কাছে ফরমাশ দিলে, তারা যে তৈরি করে দিতে সক্ষম হবেন না এমন নয়। সেদিক থেকে কালেভদ্রে দু'একটি তুলসীমঞ্চ স্থানীয় চাহিদামত এখনও তৈরি হচ্ছে। সর্বোপরি বর্তমানে তুলসীমঞ্চের এই নিদর্শনটি এখন মিউজিয়ামের প্রদর্শন কক্ষের শোভা বর্ধন করে বাংলার প্রথাগত লোকশিল্পের ঐতিহ্য ঘোষণায় মুখর হতে চলেছে।

ঙ. দীপলক্ষ্মী পুতুল

দীপলক্ষ্মী বা দেওয়ালী অথবা দীপাবলী পুতুলের চল দেওয়ালী উৎসবকে কেন্দ্র করে, উপলক্ষ প্রদীপ সজ্জা। পোড়ামাটির তৈরি এ পুতুলের নিচের অংশটা হয় গোলাকার চাকে তৈরি ফাঁপা — যা ঘাগরার মত দেখতে হলেও সেটি বাতিদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত। উপরের অংশে দেহ ও মাটি জুড়ে নারীমূর্তির অবয়ব আনা হয়। এর সঙ্গে দু'হাত উঁচু করা এ পুতুলের ঐ দু'হাতে সাঁটা থাকে দু'টি এবং মাথায় একটি প্রদীপ, যাকে বলা হয় তিন প্রদীপের পুতুল। এ পুতুলের আকার ও শৈলীর মধ্যে বেশ আদিমতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তাগিদে এই লোকশিল্পটির উদ্ভব হলেও, সারিবদ্ধ প্রদীপ সজ্জার দরুন এর গঠন সৌকর্য যেভাবে অভিব্যক্ত হয় তা অতুলনীয়। তাছাড়া ধর্মীয় এই দীপলক্ষ্মী পুতুল নির্দেশিত করে ধনসম্পদ বৃদ্ধির প্রতীক শ্রী বা লক্ষ্মীর ভাবমূর্তি — তাই দেওয়ালীতে এই পুতুল এত জনপ্রিয়।

মেদিনীপুরের মির্জাবাজারের দেওয়ালী পুতুল

দীপলক্ষ্মী পুতুল পাওয়া যায় পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলায়। স্থানীয় কুম্ভকার সমাজের তৈরি এই পুতুলের গঠন অবশ্য দু'জেলায় বেশ রকমফের। পুরুলিয়া জেলার পুতুলগুলির গঠন নৈপুণ্য একান্তই চিত্তাকর্ষক। সেখানে তৈরি পূর্ববর্ণিত দু'হাত ও মাথায় রাখা প্রদীপ লাগানো পুতুল ছাড়া আরও অন্য গঠনের পুতুল তৈরি হয়। সেগুলির মধ্যে একটির ধরন হ'ল এক নারীমূর্তি উপরে দু'হাত দিয়ে একটা অর্ধবৃত্তাকার মাটির বেষ্টনী মাথার উপরে তুলে রাখে এবং সেই চক্রাকার বেষ্টনীর গায়ে সারিবদ্ধভাবে জুড়ে দেওয়া হয় অসংখ্য প্রদীপের সারি। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দু'চালার পুতুলও দেখা যায় এবং সেখানে উপরে দুহাত প্রদীপসহ গোলাকার বেষ্টনী ধরা অবস্থা ছাড়া দু'কাঁধের পাশ থেকে অর্ধবৃত্তাকারভাবে আরও দুটি বেষ্টনী প্রদীপসহ নীচের দিকে গোলাকার দণ্ডের গায়ে যুক্ত হয়। এইভাবে সাতটি প্রদীপ যুক্ত দেওয়ালী পুতুলকে স্থানীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে 'সাতবহানিয়া'। অবশ্য তিন পাঁচ বা নয় সংখ্যক প্রদীপের বিন্যাসও দেখা যায়। আবার কোথাও কোন নারীমূর্তির দু'হাতে সংযুক্ত হয় দুটিমাত্র প্রদীপ এবং মাথার অংশটি মুকুট শোভিত।

দেওয়ালী পুতুল পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া শহর ছাড়া বলরামপুর, ঝালদা, আদ্রা, কুকড়ু ও ছাতাটাঁড় (থানা ঃ বাগমুণ্ডি) প্রভৃতি এলাকার কুম্ভকার শিল্পীরা তৈরি করে থাকেন। প্রথাগতভাবে চাকে পুতুলের নিচের অংশের দেহকাণ্ডটি গোলাকারভাবে তৈরি করা হয়— যা শেষ অবধি দেখতে হয় ঘাগরার মত। এবার উপরের অংশে ছাঁচে তোলা মুখ জুড়ে দিয়ে পুতুলের সম্পূর্ণ দেহকাণ্ডটি সম্পাদন করা হয়। এবার আলাদাভাবে কাদার দণ্ড জুড়ে হাত ও তার সঙ্গে সংশ্লিস্ট গোলাকার বেষ্টনী তৈরি করে বেষ্টনীর গায়ে গায়ে অসংখ্য প্রদীপ সেঁটে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, পুতুলের আয়তন ও মাটির গোলাকার বেষ্টনীর আকার অনুযায়ী প্রদীপের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা তের থেকে ষোলতে গিয়ে দাঁড়ায়। পুতুলগুলির উচ্চতাও বহুক্ষেত্রে তিরিশ সেমি. থেকে এক বা দেড় মিঃ হয়ে থাকে। পুতুল তৈরি শেষে পোড়ানোর পালা। শেষে হয় রঙ চড়ানো। পুরুলিয়ার পুতুলগুলিতে বিশেষভাবে অভ্রগুঁড়ো মেশানো রুপোলি রঙের চলই বেশি। তবে চকচকে গোলাপি ও নীল রঙের পুতুলও দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লাল, নীল, কালো, হলদে ও সাদা রঙ দিয়ে পুতুলের গায়ে নানাবিধ অলংকরণ করা হয়। বিশেষ করে নিচের গোলাকার ঘাগরা অংশে থাকে ফুল-লতাপাতার চিত্রণ।

মেদিনীপুরের দীপলক্ষ্মী পুতুল তৈরি হয় মানিকপুর ও মির্জাবাজারের কুম্ভকার পল্লীতে। এখানে দু'রকমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুতুলের মধ্যে একটি হ'ল প্রথাগত প্রদীপ লাগানো পুতুল এবং অন্যটি হ'ল পোড়ামাটির তৈরি পলতে লাগানোর ব্যবস্থা সমেত কেরোসিন কুপিযুক্ত পুতুল। এখানে এ পুতুলগুলিকে বলা হয় 'পরী পুতুল'। এ পুতুলগুলিও তিরিশ সেমি. থেকে আধ্ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এখানের পুতুলের নিচের গোলাকার অংশটি চাকে তৈরি করা হয় এবং দেহের বক্ষস্থল, মুখমণ্ডল ও হাত আলাদাভাবে জুড়ে পুতুলটি সম্পূর্ণ করা হয়। পুতুলগুলি কাঁচা অবস্থায় তৈরির পর তা শুকিয়ে নিয়ে পোড়ানোর পর রঙ দেওয়ার পালা। এক্ষেত্রে পুতুলগুলিকে শাদা খড়িতে চিত্রণের পর, নিচের ঘাগরা অংশে লাল গোলাপি, সবুজ বা নীল ও হলদে রঙ লাগিয়ে তার ওপর পদ্মফুল বা অন্যান্য ফুল-লতাপাতার অলংকরণ

করা হয়। এরপর পুতুলের উপরে গাত্রাবরনী অংশে রঙ লাগাবার পর চোখ, মুখ ও ঠোঁটে যথাযথভাবে চিত্রণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পুরুলিয়ার দীপাবলী পুতুলগুলি যেমন নারীপুরুষ ও পশুপাখি বিষয়বস্তুভিত্তিক হয়, তেমনি মেদিনীপুরের পুতুলগুলিও নারী মূর্তি ছাড়া জীবজন্তু ও অন্যান্য ঠাকুরদেবতাদের মূর্তিকেন্দ্রিক হয়। অনেক সময় মেয়ে পুতুলগুলির দু'হাতের বদলে তৈরি করা হয় চার বা দশ হাত। এখানকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেওয়ালী পুতুল হ'ল রাবণ মূর্তি। বেশ বোঝা যায়, মেদিনীপুরের মৃৎশিল্পীরা নানাবিধ উদ্ভাবনী বুদ্ধি খাটিয়ে নানান ধরনের দেওয়ালী পুতুল গড়ে থাকেন। তাই দেওয়ালী পুতুলের প্রদীপ নিভে যাবার সম্ভাবনায় তারা কেরোসিন কুপি যুক্ত করে পুতুলগুলিকে বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছেন। মেদিনীপুরের দীপলক্ষ্মী পুতুল নির্মাণের গঠনশৈলী পুরুলিয়ার পুতুল থেকে স্বতন্ত্র হলেও দীপাবলীর আলোকসজ্জার এই দুটি স্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকশিল্পটি একান্তই হৃদয়গ্রাহী।

চ. টুসু খোলা

দীপলক্ষ্মী বা দেওয়ালী পুতুলের মতই প্রদীপ সজ্জার আর এক আকর্ষণীয় শিল্পবস্তু হ'ল টুসু খোলা বা খলা। গোটা পৌষ মাস জুড়ে টুসু পুজো ও উৎসব চলে। এই পুজোকে উপলক্ষ্য করে প্রদীপ সজ্জার উদ্দেশ্যে এক মনোরম শিল্পকৃতি সৃষ্টি করা হয়, যাকে বলা হয় টুসুখোলা বা টুসুখলা। এই টুসু খোলার গঠন বৈশিষ্ট্য হ'ল, একটি মাটির ঘটের বা সরার উপর গোলাকার কানায় বসানো হয় প্রদীপের সারি এবং সে ঘট বা সরার আয়তন অনুযায়ী প্রদীপের সংখ্যা ন' থেকে পনের বা কুড়ি পর্যন্ত হতে পারে। এবার পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু ভাসানের দিন এই টুসু খোলার প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয় কোন বৃহৎ দিঘি, পুষ্করিণী বা নদীর জলে। যেহেতু জলে এটা ভাসানো হয় সেজন্য এর গঠনও সেইভাবে ভিন্ন ধরনের করা হয়। জলে ভাসানো ছাড়া মেঝেতে বসানোর জন্য যে টুসু খোলা তৈরি করা হয় স্বভাবতই সেটির গঠন-পিটন ভিন্ন রকমের। এছাড়াও একতলা, দু'তলা ও তিন তলা, অর্থাৎ উপর-নিচে তিনটি সারিবদ্ধ প্রদীপের স্তর বিশিষ্ট টুসু খোলারও প্রচলন আছে। বাঁকুড়া জেলার রাজগ্রাম ও সোনামুখি প্রভৃতি এলাকার কুম্ভকার পল্লীতে এই টুসু খোলা তৈরি হয়ে থাকে। লাল ও কালো এই দু'রঙেরই টুসু খোলা দেখা যায়।

অনুরূপ, বাঁকুড়া জেলার মত প্রদীপ সজ্জার অন্য আর একটি নিদর্শন দেখা যায় উত্তর-বঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে। সেখানে দীপাবলিতে ঘটের উপরের কানায় বসানো হয় ছোট ছোট প্রদীপ। কখনও বা বড়সড়ো কোন ঘটের উপরে আর একটি মাঝারি এবং তারও উপরে আর একটি ছোট ঘট বসিয়ে এবং সে ঘটগুলির কানায় কানায় ছোট প্রদীপ সেঁটে দিয়ে এই প্রদীপ সজ্জার উপকরণটি প্রস্তুত করা হয়। এবার প্রদীপগুলিতে তেল-সলতে লাগিয়ে প্রজ্বলিত করা হলে সেগুলি একান্তই চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

ছ. বারা ঠাকুর

দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় পৌষ সংক্রান্তি বা মাঘ মাসের প্রথম দিকে গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে বনাঞ্চলের দেবতা দক্ষিণরায়ের, মতান্তরে ক্ষেত্রপালের

প্রতীক হিসাবে বারাঠাকুর নামে একটি লৌকিক দেবতার পূজার্চনা শুরু হয়। সে পূজায় মূর্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের ওল্টানো ঘট যাকে বারাঘট বলা হয়। পূজার্চনায় শুধু একটি বারাঘট নয়, ঐসঙ্গে নারায়ণীর প্রতীকরূপে পাশাপাশি আরও একটি বারাঘট রাখা হয়। এই দুটি ঘটকে অনেক সময় 'বারামুণ্ড' নামেও অভিহিত করা হয়।

এই বারাঘট নির্মাণের শিল্পীরা হলেন দক্ষিণবঙ্গেব কুম্ভকার সম্প্রদায়। লোকশিল্পানুসারী এই বারাঘটগুলির উচ্চতা বিভিন্ন রকেমর হয়; সাধারণত তিরিশ সেমি. উচ্চতার ঘটগুলিই বেশি দেখা যায় তবে কোন কোন স্থানে এগুলির উচ্চতা হয় প্রায় এক মি.।

প্রথমত একটি ঘট নির্মাণ করে সেটি উপুড় করে বসিয়ে কাঁচা অবস্থায় বটপাতার আকারে নির্মিত একটি মৃৎফলক ঐ ঘটের গায়ে লাগিয়ে এই মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য এই বারাঘটের গড়নে দেখা যায় ঘটটি উল্টে দেওয়ার দরুন ঘটের মুখের কানা অংশের নিচে গলা অংশটি দেখায় মানুষের গলার মত এবং ঘটের পেট অংশটির আকৃতি হয় মানুষের মাথার সদৃশ। এবার এই ঘট সদৃশ মুখমণ্ডলটিতে কাদামাটি দিয়ে জোড়া হয় দুদিকে দুটি কান ও সেইসঙ্গে উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয় চোখ, ঠোঁট, গোঁফ, চিবুক ও নাক। অন্যদিকে নারায়ণীর মূর্তিতে অবশ্য গোঁফ থাকেনা। এইভাবে কাঁচা মাটির মূর্তি গড়নের পর পোনে পুড়িয়ে নেওয়া হয় মূর্তিটিকে। এরপর রঙ লাগানোর পালা। প্রথমে খড়িমাটি গোলা রঙ লাগিয়ে চোখ আঁকা হয় কালো রঙে; সেইসঙ্গে চোখদুটির সমান্তরাল চোখের ভ্রূ, অর্ধগোলাকার ঠোঁট এবং চিবুক ঐ কালো রঙেই এঁকে দেওয়া হয়। এবার পাতার মত মাথার চূড়া অংশের চতুর্দিকে নানান দাগ টেনে বন্ধনী অলংকরণের পর মধ্যস্থলে আঁকা হয় এক প্রস্ফুটিত পদ্মের নকশা। প্রয়োজনমত কালো রঙের সঙ্গে লাল রঙেরও চিত্রণ করা হয়। বারাঠাকুরের সম্পূর্ণ এই মূর্তির আকৃতি ও নির্মাণশৈলী এক সার্থক বিমূর্ত রূপের হলেও, বনাঞ্চলের লোকদেবতার এই কল্পমূর্তিটি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের মূর্তি কল্পনা যে দীর্ঘদিন ধরেই অনুসৃত হয়ে আসছে তার নিদর্শন হিসাবে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকটে হরিনারায়ণপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেছে এই রকমের ক্ষুদ্রাকার বেশ কিছু প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি। সুতরাং হাল আমলের পূজিত এই বারামূর্তির প্রচলন যে বহুকাল পূর্ব থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বারাঠাকুর ঃ জয়নগর-মজিলপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেই নয় একসময়ে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত এই ধরনের পাতা সদৃশ শিরোভূষণ যুক্ত মৃৎভাণ্ড মূর্তিকে 'বারাঘট' নামে অভিহিত করা হ'ত।

জ. লক্ষ্মী-গণেশ ঘট

পৌষ সংক্রান্তিতে বা ইতু পুজোয় লক্ষ্মী ও গণেশ ঘট দেবার রীতি প্রচলিত। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় এই লক্ষ্মী ও গণেশের দুটি ঘট ব্যাপকভাবে প্রচলিত। স্থান বিশেষে এই ঘটের নির্মাণশৈলীর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আসলে এই ঘটগুলি হয় আট থেকে বারো সেমি. উচ্চতাবিশিষ্ট এবং সে ঘটের কানার কাছ বরাবর একটি মুখের আকৃতি সংযোগ করে লক্ষ্মী ঘট এবং অনুরূপ একটি শুঁড় সংযোজন করে গণেশ ঘট তৈরি করা হয়। কোথাও আবার চায়ের পেয়ালার আকৃতিগত একটি ঘট চাকে নির্মাণ করে তার উপর কাদার লেত্তি দিয়ে নাক-চোখ সেঁটে দিয়ে লক্ষ্মীঘট এবং সেইসঙ্গে শুঁড় সংযোগ করে গণেশঘট প্রস্তুত করা হয়, যা বিমূর্ত শৈলীর এক অপূর্ব উদাহরণ। অনেক স্থানের মৃৎশিল্পীরা উপুড় করা ঘটের উপরে সামান্য অর্ধবৃত্তাকার চূড়া এবং ঘটের গায়ে নাক, মুখ ও শুঁড় আলাদাভাগে কাদামাটির সাহায্যে উৎকীর্ণ করে যে ঘটগুলি নির্মাণ করেন তার আকৃতি হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারাঘট মূর্তির সদৃশ। কাঁচা অবস্থায় ঘট তৈরি করার পর তা শুকিয়ে নিয়ে তার উপর বনক রঙ লাগিয়ে যথারীতি পোনে পোড়ানো হয়।

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা এলাকার রাধাপুর ও সমষপুর, বাগনান থানার অন্তর্গত কালিকাপুর ও বাঁটুল এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক, মহিষাদল, ডেবরা ও পাঁশকুড়া থানার বিভিন্ন কুম্ভকার পল্লীতে নানান আকৃতিগত লক্ষ্মী ও গণেশ ঘট তৈরি হয়, যা লোকশিল্পের এক অনন্য উদাহরণ বলা যেতে পারে।

পরিশেষে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, এই ধরণের জোড়া ঘটমূর্তির প্রচলন যে বহুকাল থেকেই চলে আসছে, তার প্রমাণ হিসাবে দেখা যায়, হাওড়া জেলার একদা প্রবাহিত প্রাচীন কৌশিকী নদীগর্ভে বালি উত্তোলনের সময় উদ্ধার হওয়া এমন দুটি ক্ষুদ্রাকার মূর্তিযুক্ত ঘট; এ ঘটদুটির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রাচীনতর লক্ষণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আঞ্চলিক লোকনৃত্যে ব্যবহৃত মুখোশ শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে যেসব আঞ্চলিক লোকনৃত্যে মুখোশ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ছৌ নৃত্য, মালদহ জেলায় প্রচলিত গম্ভীরা নৃত্য এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রথাগত 'মুখা খেইল' অথবা 'মোখা' বা 'মুখা খেলা' প্রভৃতি নৃত্য। উল্লিখিত এইসব স্থানে নৃত্যের প্রয়োজনে যেসব মুখোশ তৈরি হয় সেগুলি কোথাও হয় চিত্রিত কাঠের, কোথাও বা কাগজ, মাটি ও কাপড়ের। লোকনৃত্যের আনুষঙ্গিক সাজসজ্জায় ব্যবহৃত এইসব মুখোশগুলি আমাদের গ্রামীণ শিল্পকলার এক বিশিষ্ট সম্পদ।

ক. ছৌ নৃত্যের মুখোশ

পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায প্রচলিত ছৌ নৃত্যে ব্যবহৃত হয় মুখোশ সজ্জা। চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর ছৌ নাচের শুরু এবং নিজেদের গ্রামের শিবমন্দির বা থানে বা আমন্ত্রণ পেলে অন্য স্থানে বৈশাখ মাস থেকে জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই নৃত্য চলতে থাকে। এখন এই 'ছৌ' কথাটির অর্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেউ বলেন 'ছৌ' কথাটির অর্থ মুখোশ, অর্থাৎ মুখকে যা আচ্ছাদন করে তাই হ'ল ছৌ। তবে পুরুলিয়া জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষজনের কাছে জানা যায়, এটি একটি আঞ্চলিক দেশি শব্দ, যার অর্থই হ'ল রঙ্গ বা কৌতুক। এ বিষয়ে পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ মানুষের কথাবার্তার মধ্যেও 'ছৌ' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কথাবার্তায় প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়ে থাকে, 'থাক্ থাক্ আর ছৌ করতে হবেনা' বা 'আর কত ছৌ দেখবো' ইত্যাদি। সেজন্যে দেব-দেবীর উপাখ্যানকে নৃত্যের মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কৌতুকাবহ করে তোলার কারণেই 'ছৌ' কথাটির প্রয়োগ, তাই নাম ছৌ-নৃত্য।

সে যাই হোক, আলোচ্য এই ছৌ নাচের বিষয়বস্তু মূলত রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ নৃত্যে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের অন্যান্য সাজসজ্জার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের আদলে তৈরি মুখোশ পরতেই হয়, যা এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। এক সময়ে বাগমুণ্ডির ভূস্বামীদের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত এই ছৌ-নাচের কেন্দ্রীভূত এলাকা ছিল ঐ বাগমুণ্ডি। তাই এই বাগমুণ্ডির কাছাকাছি চড়িদায় মুখোশ তৈরির শিল্পীদের বসতি গড়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য জয়পুর থানার এলাকাধীন ডুমুরদিহি গ্রামে মুখোস শিল্পীদের একটা অংশ উঠে এসে বসবাস করেন। আর এই দুটি স্থানেই তৈরি হয় একই গড়নের ছৌ-নৃত্যের নানান মুখোশ। চড়িদার মুখোশ শিল্পীদের বসবাস সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি যে, ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরির

জন্য বাগমুণ্ডির ভূস্বামীরা একদা অতীতে বর্ধমান জেলা থেকে যেসব সূত্রধর কারিগর আনিয়েছিলেন বর্তমান মুখোশ শিল্পীরা তাদেরই সুযোগ্য বংশধর। দীর্ঘদিন ধরে এইসব সূত্রধর শিল্পীগোষ্ঠী প্রথাগতভাবে ছৌ-এর যেসব চিত্র-বিচিত্র মুখোশ তৈরি করে চলেছেন সেসব মুখোশ নির্মাণের পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মধ্যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করেই ছৌ-নাচের পালাগুলি রচিত হয়। তাই সেসব পালার নৃত্যাভিনয়ের জন্য তৈরি করা হয় রাম, সীতা, হনুমান, রাবণ. ভীম, অর্জুন, অভিমন্যু, দুর্যোধন, পরশুরাম প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির মুখোশ। এছাড়া দুর্গা, কালী, গণেশ, কার্তিক, শিব, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মুখোশও তৈরি হয়। এই সঙ্গে জীবজন্তুর যেসব মুখোশ শিল্পীরা প্রস্তুত করেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল, সিংহ, বাঘ, ভালুক, বরাহ, হরিণ, ময়ূর ও ঘোড়া প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি শিল্পীরা মুখোশ তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। অন্য সময় তারা মুখোশের আদলে আজকাল ঘর সাজাবার উপকরণ হিসাবে মাঝি-মেঝান বা সাঁওতাল দম্পতি, টিয়া পাখি, ময়ুর, বাঘ, ফণাধারী শিব প্রভৃতির মুখোশ তৈরি করে থাকেন এবং এ বাদেও প্রতিমা নির্মাণ ও কাঠের কাজও করে থাকেন। এদের তৈরি কাঠের ক্ষুদ্রাকৃতি রানী পুতুলও বেশ আকর্ষণীয়।

মুখোশ তৈরিতে শিল্পীরা অতি সাধারণ উপকরণ, যথা আঠালো মাটি, কাগজ, পুরাতন পাতলা কাপড়, চকচকে পালিশের জন্য গর্জন তেল, আঠা, ধুনো, পাট, নকল চুল, পাখির পালক, রাংতা, পুঁতি, শলমা-চুমকি ও বিবিধ রঙ প্রভৃতি এবং সামান্য কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই অসামান্য শিল্পটি সৃষ্টি করে থাকেন। তৈরির পদ্ধতি হ'ল, প্রথমে কাদার তাল একটা তক্তার উপর রেখে যে মুখোশ তৈরি হবে তার একটা নমুনা মুখমন্ডলের ছাঁচ তৈরি করা হয়, যাকে শিল্পীদের পরিভাষায় বলা হয় 'ছাঁচা'। এবার ছাঁচা তৈরির পর এই মূর্তির কাঁচা মাটিটা একটু শুকিয়ে গেলে তার উপর মিহি ছাইয়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর খুব পাতলা ধরনের আঠায় মাপমত কাগজ চুবিয়ে নরম করে নিয়ে প্রস্তুত ঐ ছাঁচার উপর লেপটে দিতে হয় এবং এইভাবে আট-দশ পরদা আঠা ভেজানো কাগজ উপরি উপরিভাবে সেঁটে দেওয়ার নিয়ম। এবার ছাঁচার উপর মাটি দিয়ে চোখ, ভ্রূ, নাক, ঠোঁট ও থুতনির যথাযথভাবে রূপ দেওয়া হয়। তারপর একটি পাত্রে তরল কাদামাটির মণ্ডে পরিমাপমত পাতলা মিহি কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে ঐ মুখোশ ছাঁচাটির উপর টান টান করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই মিহি কাদার প্রলেপ লাগানোকে এরা বলে থাকেন 'কাবিজ লেপা'। এবার শিল্পীরা একটা বিশেষ ধরনের কাঠের মসৃণ কর্নিকের মত যন্ত্র দিয়ে ঐ মূর্তিটির উপর পালিশ করতে শুরু করেন, শিল্পীরা যার নাম দিয়েছে 'থাপি' বা 'থুপি' পালিশ। এই থাপি পালিশের কাজ শেষ হলে সেটিকে রোদে শুকোতে দেওয়া হয় এবং সামান্য শুকিয়ে যাবার পর ঐ মাটির ছাঁচা থেকে কাগজ ও কাপড়ের আস্তরণটি খুলে নেওয়া হয়। এখন যেটি পাওয়া গেল সেটাই মুখোশের প্রতিকৃতি এবং সেটির বাড়তি অংশ ছেঁটে যথাযথ আকারে আনা হয়। এবার মুখোশের গায়ে চোখের ও নাকের ফুটো রাখার জন্য যথাযথ ছিদ্র করে দেওয়া হয়। এখন মুখোশের কাঠামো তৈরি শেষ; এবার রঙ দিয়ে রূপারোপ করার পালা।

প্রথমে গোটা মুখোশটিতে খড়ি গোলা রঙ চড়িয়ে মুখোশের চরিত্র অনুযায়ী সেই সেই রঙ গোটা মুখোশটিতে লেপে দেওয়া হয়। এবার রঙ ও তুলির সাহায্যে চোখ মুখ গোঁফ ইত্যাদি আঁকার পালা। এরপর এ্যারারুটের পাতলা লেই প্রয়োগ করে তার উপরে লাগানো হয় গর্জন তেল, মুখোশটির যাতে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেশ্যে। রঙ লাগাবার কাজ শেষ হলে এবার শুরু হয় মুখোশটির সাজ-সজ্জার কাজ। প্রথমে কালো রঙে গাবানো শনের বা নাইলনের চুল লাগানো হয় এবং সঙ্গে রঙ করা পাখির পালক, ময়ূর পাখা, রাংতা, পুঁতি, শলমা-চুমকি ও জামির পাতা প্রভৃতি উপকরণগুলিকে শিল্পীর নৈপুণ্য অনুযায়ী তারের বাঁধনে বেঁধে যথাযথ রূপ দিয়ে মুখোশের মুকুট পর্বটি সমাধা করা হয়। এর মধ্যে বিশেষ আড়ম্বরে সেসব মুখোশের মুকুট অংশ সজ্জিত করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'পঞ্চখিলান' মুখোশ। বলা বাহুল্য, এ কাজটি বেশ কষ্টসাধ্য ও সবটাই নির্ভর করে শিল্পীর কলাকৌশলের মুন্সিয়ানার উপর।

দীর্ঘদিন ধরে প্রথাগতভাবে অনুশীলনে মুখোশ শিল্পীরা ছৌ-নাচের মুখোশ নির্মাণে যে দৃষ্টিনন্দন কারিগরি ও নির্মাণ কৌশলের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন তা অতুলনীয় এবং এমন বর্ণাঢ্য গ্রামীণ লোকনৃত্য দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার মূলে আছে লোকশিল্পের এই অনন্য নিদর্শন ছৌ-মুখোশের অবদান।

বর্তমানে ছৌ-নৃত্যে কাগজ ও কাপড়ে নির্মিত এই ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত হলেও, প্রসঙ্গত দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, একসময় মেদিনীপুর জেলার জামবনি থানার এলাকাধীন চিলকিগড় ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছৌনাচের উৎসব হ'ত, তাতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদানকারীদের জন্য নির্দিষ্ট মুখোশটি হত কাঠের তৈরি এবং চিত্রিত। আজও সেখানকার রাজবাড়ির ছৌ নাচে কাগজ ও কাপড়ে তৈরি মুখোশের সঙ্গে এই কাঠের মুখোসও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে অতীতে কি বাগমুণ্ডিতে অনুষ্ঠিত ছৌ-নাচে কাঠের মুখোশ ব্যবহৃত হ'ত এবং এই মুখোশ তৈরির জন্য বাগমুণ্ডির রাজপরিবার বর্ধমান থেকে সুদক্ষ কাঠের কাজের সূত্রধর শিল্পীদের আনিয়েছিলেন, যারা পরবর্তী সময়ে কাগজ ও কাদামাটি মাখানো কাপড়ে তৈরি এই ধরনের হালকা মুখোশ উদ্ভাবনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন!

খ. গম্ভীরা নৃত্যের মুখোশ

চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করেই মালদহ জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় গম্ভীরা গান ও গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় মুখা নাচ। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই প্রথাগত গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যটি অবশ্য একক নৃত্য, ছৌ-নাচের মত গোষ্ঠীবদ্ধ নৃত্য নয়। এ নৃত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখ্য হল, কালী, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা ও নরসিংহী প্রভৃতি। গম্ভীরা নৃত্যে যে মুখোশটি ব্যবহার করা হয় তা কাঠের তৈরি। ধর্মীয় দিক থেকে নিম ও ডুমুর কাঠ পবিত্র বলে গণ্য হওয়ায় ঐসব কাঠেই মুখোশ নির্মিত হয়। নির্মাণ পদ্ধতি হল, প্রথমে মুখোশের আকার অনুযায়ী শিল্পী-কারিগররা যথাযথভাবে এক কাঠের খণ্ডে নাক মুখ

গম্ভীবা মুখোশ
মালদহ

চোখ কান ইত্যাদি খোদাই করার সঙ্গে, মুখোশের মাথার উপর মুকুটসজ্জা হিসাবে বর্শার আকৃতিতে সারিবদ্ধভাবে ত্রিকোণাকার কাঠের ফলক সংযোগ করে দেন, যা এই মুখোশের এক বৈশিষ্ট্য। এবার তার উপর মুখোশের চরিত্র অনুযায়ী রঙ দিয়ে যথাযোগ্য চিত্রবিচিত্রিত করা হয়। দেখা যায়, অন্যান্য বিষয়ীভূত মুখোশের মধ্যে জিভ বের করা কালীর মুখোশই বহুল প্রচারিত। এ মুখোশের আর একটি ব্যতি ক্রম হল, মুখোশে চোখ দুটোর কাছে কোন ছিদ্র থাকে না। ফলে চোখ-মুখ ঢাকা অবস্থায় অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে ঢাকের তালে তালে শিল্পীকে নৃত্য করতে হয়।

গ. উত্তরবঙ্গের 'মুখা খেঁইল' অথবা 'মোখা' বা 'মুখা' খেলা নৃত্যের মুখোশ

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আষাঢ়ের অম্বুবাচী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত 'গমিরা' নৃত্যাগীতই হল স্থানীয়ভাবে মোখা বা মুখা খেলা অর্থাৎ মুখোশের খেলা। এখানের এ নৃত্যটি অবশ্য ছৌনাচের মত কাহিনীভিত্তিক, যা বিশেষ করে সঙ্গীতবহুল রামায়ণ কাহিনী নির্ভর। এছাড়াও আছে দশভুজা দুর্গার সঙ্গে অসুরযুদ্ধ বিষয়ক নৃত্য। বলাবাহুল্য, এই মোখা নৃত্যের পাত্রপাত্রীদের অতি অবশ্য স্ব স্ব চরিত্র অনুযায়ী মুখোশ পরে অভিনয় করার রীতি প্রচলিত। সেজন্য রামায়ণ কাহিনীর রাম-রাবণের ও অন্যান্যদের যথাযথ মুখোশ ছাড়া বাঘ, হরিণ, ভালুক, হনুমান, লৌকিক দেবতা বুড়া-বুড়ি, কালী, ভদ্রকালী প্রভৃতি মুখোশ এই মোখা খেলায় ব্যবহৃত হয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী মুখোশ হ'ল, শিকনি ঢাল নৃত্যের দানবাকৃতি ভয়ংকর দর্শন বিশালাকার এক মুখোশ।

মুখোশগুলি নিপুণভাবে কাঠ খোদাই করে তৈরি এবং সেইসঙ্গে যথাযথ রঙও চড়ানো হয়। প্রতি বৎসর নৃত্য শেষে মুখোশগুলিকে গচ্ছিত রাখা হয় দেবাংশী অর্থাৎ মোখা খেলার প্রধান পুরোহিতের বাড়িতে। আগামী বৎসরে নৃত্যের আগে মুখোশগুলিকে আর একবার রঙ লাগিয়ে সংস্কার করে নেওয়া হয়।

ঢোকরা কামারদের তৈরি লক্ষ্মীর ঝাঁপিকেন্দ্রিক শিল্প দ্রব্য

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়া জেলায় গৃহস্থবাড়িতে থাকতো লক্ষ্মীর ঝাঁপি। সে ঝাঁপি লক্ষ্মীব আরাধনায় মূলত পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপুজোয় খোলা হ'ত এবং পুজো শেষে আবার তুলে রাখা হত। আসলে এই ঝাঁপিতে থাকতো পিতলের তৈরি হাতির পিঠে চড়া লক্ষ্মী, নারায়ণের মূর্তি, কার্তিক গণেশ ও লক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্তি এবং তার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পেঁচা, ময়ূর, মাছ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণী ও আম, করলা প্রভৃতি ফলফলারি। এসব পিতলের তৈরি দ্রব্যগুলি হত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁপা ও হাল্কা ধরনের। দেখলেই মনে হবে যেন বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি সেসব দ্রব্য, যদিও কিন্তু তা পিতল ধাতুতে রূপান্তরিত। এক বিশেষ উপায়ে পিতলের লেত্তি জড়িয়ে তৈরি করা এই শিল্পবস্তুগুলির কলাকৌশল ও প্রকার বৈচিত্র্য একান্তই মনোমুগ্ধকর।

ঢোকবা কামাবদেব তৈবি লক্ষ্মীনারায়ণ

আলোচ্য এইসব পিতলের শিল্পদ্রব্যগুলির স্রষ্টা হলেন আমাদের দেশের ঢোকরা বা ডোকরা কামার সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এই পিতল ঢালাই শিল্পীরা নিজেদের মাল ও মালহার বলে পরিচয় দেন। আবার কেউ কেউ ঢোকরা বলে পরিচয় না দিয়ে তারা নিজেদের স্যাকরা বলে অভিহিত করে থাকেন। মেদিনীপুর জেলায় এদেরকে 'ঢেপ্পো' বলেও অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিহারে এই ধরনের কাজের শিল্পীদের বলা হয় 'মালর' এবং বিহারের দক্ষিণের জেলাগুলির চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা এই শিল্পীসম্প্রদায়কে স্থানীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে 'ঘুংঘুর ধাড়া', অথবা কখনও বলা হয় ঘন্টরা। ওড়িশাতে এদের বলা হয় 'সিথরিয়া' এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তারে এদের নাম 'ঘড়ুয়া'। অবশ্য এদের যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এরা মোমছাঁচ গলানো ধাতুশিল্পের কারিগর।

অন্যদিকে এরা যেসব পিতলের দ্রব্য তৈরি করেন, তার উপকরণ হল পিতল, মোম ও ধুনো এবং যে পদ্ধতিতে এরা এইসব শিল্পদ্রব্য তৈরি করেন তাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'লস্ট ওয়াকস্' পদ্ধতি, ফরাসি ভাষায় যার নাম 'শিরে পারদু'। অতএব বাংলায় এটিকে বলা যেতে

পারে মোমছাঁচ গলানো ধাতুশিল্প রীতি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'মধুচ্ছিষ্ট বিধানম'। শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থ 'মানসার', 'অগ্নিপুরাণ' ও মৎস্যপুরাণে এই ধাতুশিল্প রীতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

একদা এই ঢোকরা কামার শিল্পীরা ছিল পূর্বভারতে এক ভ্রাম্যমান যাযাবর শ্রেণীর ধাতুশিল্পী। পশ্চিমবঙ্গে এই সম্প্রদায়ের বসতি প্রধানত বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলায়। বর্তমানে বেশ কিছু শিল্পী সম্প্রদায় বাঁকুড়া থেকে চলে এসে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার এলাকাধীন দারিয়াপুর ও তার পাশাপাশি সাধুর বাগান এলাকায় সরকারি আনুকূল্যে গঠিত উপনিবেশে বসবাস করছেন। অনুরূপ বাঁকুড়া জেলার রামপুর থেকে অনেকে চলে এসে সরকারি পোষকতায় সৃষ্ট উপনিবেশ ঐ জেলার সদর থানার অন্তর্গত বিকনায় বসতি করেছেন। সুতরাং দারিয়াপুর ও বিকনার শিল্পীরা বর্তমানে সেযব শিল্পদ্রব্য তৈরি করে থাকেন, তার তালিকাটি হল, তিনপায়াযুক্ত ফুলদানি, হাতি (ছোট ও বড়), পঞ্চপ্রদীপ, প্রদীপ দেওয়া হাতি, লক্ষ্মীনারাযণযুক্ত হাতি, ময়ূর, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, জগন্নাথ, গন্ধমাদন নিয়ে হনুমান, রাবণ, সপরিবারে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, শিব (হাতে ডমরু মাথায় সাপের ফণা), পেঁচা, মুরগি, ঘুঙুর, সিঁদুর কৌটো, কাজললতা ও চালমাপা নানা ধরনের পাইকোনা প্রভৃতি।

এছাড়া বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার লক্ষ্মীসাগরে বসবাসকারী ঢোকরা কামারশিল্পীরা নানাবিধ পিতলের মূর্তি তৈরি করেন এবং শালতোড়া থানার বিন্দ্যজাম ও নেতকামলায় যারা বসবাস কবেন তারা দেবদেবী বা পশুপক্ষীর মূর্তির বদলে তৈরি করে থাকেন নানা আকারের চাল মাপার পাইকোনা, পায়ের মল, নূপুর ও ঘুঙুর প্রভৃতি।

বাঁকুড়া ছাড়া পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী এই শিল্পী সম্প্রদায় ঐ জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং তারা নিজেদের মাল বা মালহার বলেই পরিচয় প্রদান করেন। তাদের মুল বসতি হল নডিহা (থানা ঃ পুরুলিয়া), আকরো (থানা ঃ মানবাজার), পাবড়া-পাহাড়ি (থানা ঃ হুড়া), কুলাবহাল (থানা.ঃ পুরুলিয়া মফস্বল) ও নরকলি (থানা ঃ মানবাজার) প্রভৃতি স্থানে। এখানকার শিল্পীরা তৈরি করেন নানা আকারের চাল মাপার কুনকে, পাই-পাইলা, যার গায়ে অলংকৃত করা হয় লতাপাতা, মাছ ও জ্যামিতিক নক্সা এবং ঘুঙুর, সিঁদুর কৌটো প্রভৃতি। একসময়ে পিতলের অভাবে এখানকার শিল্পীরা এ্যালুমিনিয়াম ধাতুতে ঐসব শিল্পদ্রব্য তৈরি করে জীবন ও জীবিকাকে সচল রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

পুরুলিয়া জেলার পর মেদিনীপুর জেলায় বসতকারী এই ঢোকরা শিল্পীদের মধ্যে গড়বেতা থানার অন্তর্গত গুয়েদহ-কাঁচডহরি এলাকার শিল্পীরা পাইকুনকে, লক্ষ্মীর সাজ ও নানান দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন। এছাড়া ঐ জেলার খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বেল্যা গ্রামের কর্মকার-মাল সম্প্রদায় তৈরি করেন হাতি-ঘোড়া ও লক্ষ্মীর সাজ প্রভৃতি। কয়েক বৎসর আগেও এই থানা এলাকার আঁধারকুলি ও নিমপুরায় কয়েক ঘর মাল পরিবার বসবাস করতেন, কিন্তু বর্তমানে জীবিকার তাগিদে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন। পাশাপাশি কেশিয়াড়ি থানার আমদা গ্রামের মাল কর্মকাররা এখনও লক্ষ্মীর সাজ, চুনুটি (চুন রাখার পাত্র), ঘন্টা,

ঘোড়া-হাতি, পেঁচা-ময়ূর ও চাল মাপার পাইকোনা তৈরি করে থাকেন। শাঁকরাইল থানার কুলটিকরি গ্রামেও এই ধরনের কিছু মাল-কর্মকার সম্প্রদায় আছেন।

এই ঢোকরা কর্মকার বা মাল কর্মকার শিল্পীদের জাতিগত বিষয়টিও বিশেষ লক্ষণীয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এই ঢোকরা কামার সম্প্রদায়রা পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর পটুয়াদের মত না হিন্দু, না মুসলমান। পুরুলিয়া, উত্তর বাঁকুড়া এলাকার ও মেদিনীপুরের কতকাংশে ঢোকরা শিল্পীরা নিজেদের ইসলামধর্মী বলে পরিচয় দেন এবং নামকরণের ক্ষেত্রেও মুসলমানী নাম বহন করে থাকেন। অন্যদিকে দক্ষিণ বাঁকুড়া এলাকার ও বর্ধমানের ঢোকরা শিল্পীরা নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় প্রদান করে থাকেন এবং হিন্দু সমাজের রীতিনীতি অনুসরণে কোন দ্বিধাবোধ করেন না।

পরিশেষে মোম গলানো শিল্প দ্রব্যটির তৈরি পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে এই ঢোকরা শিল্পীরা স্থায়ীভাবে কোন স্থানে বসবাস করলেও, এক সময়ে এই শিল্পী সম্প্রদায় ঝোলা বা কাঁধের বাঁকে তাদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে কাজের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। গৃহস্থেরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা অন্যান্য গৃহশিল্প সামগ্রী তৈরি করার ফরমাশ দিলে, এরা সেখানে বসেই পিতল ঢালাই করে প্রার্থিত দ্রব্যটি তৈরি করে দিতেন। প্রথমে গৃহস্থকে দিতে হ'ত পিতলের ভাঙ্গা বাসন-কোশন। তারা ঐগুলিকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে সঙ্গে আনা একটি মাটির গোলাকার মুচিতে ভরতো। এবার কাছাকাছি কোন স্থানে একটা উনুন খুঁড়ে ঐপিতলভাঙাপূর্ণ মুচিটিকে তার মাঝখানে বসিয়ে আগুন লাগানো হ'ত এবং সঙ্গে থাকতো এই কাজের জন্য একটি ছোট হাপর। ততক্ষণে শিল্পীরা তাদের ঝুলির ভেতর থেকে মোমের তাল বের করে গালিয়ে নিয়ে এক জাঁতপুঙ্গিতে ঢালতে থাকে। জাঁতপুঙ্গি জিনিসটা দেখতে হ'ল, কাঠের নেবু নিংড়ানো যন্ত্রের মত, যার তলায় থাকে অসংখ্য ছিদ্র। বর্তমানে মোমের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে রজন বা ধুনোকে সরষের তেলে ফুটিয়ে তৈরি করা ক্বাথ, যার সঙ্গে সামান্য কিছু মোমও থাকে। এবার মোম ঢেলে উপরে জাঁতটি বসিয়ে চাপ দিলে সেখানে সুতোর লেত্তির মত মোম বের হয়। এখন যে দ্রব্যটি তৈরি হবে বালি কাদা দিয়ে তার একটা আকৃতি তৈরি করা হবে, যাকে শিল্পীরা বলে থাকেন 'কুটনা মাটি'। মোমের তৈরি সুতোগুলিকে ঐ প্রার্থিত দ্রব্যের বালিকাদার আকৃতির অর্থাৎ কুটনা মাটির উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে জড়িয়ে সেই আকৃতিটিকে নানান নকশার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মূর্তির রূপ দেওয়া হবে। এবার ঐ মোমের সুতো লাগানো মূর্তিটির উপর মোটা করে মাটি লেপে দেওয়া হবে। কেবলমাত্র উপরে ও নিচে দুটো ফুটো রেখে দেওয়া হয় এবং উপরের ফুটোর কাছে তেল ঢালা কুপির মত গড়ন করা হয়, যাতে গলানো পিতল ঢালতে কোন অসুবিধে না ঘটে। ততক্ষণে উনুনের আগুনে মুচিতে রাখা পেতল গলতে থাকে। পিতল গলে ক্ষীর হয়ে গেলে শিল্পীরা তখন সোহাগার ছিটে দেয়। তারপর মাটি ঢাকা ছাঁচটির কুপির মত স্থানে, সাঁড়াশি দিয়ে মুচিটিকে ধরে গলে যাওয়া পেতল ঢেলে দেওয়া হয়। এর ফলে নিচের তলার ফুটো দিয়ে গলানো মোম বের হতে থাকে এবং শূন্য স্থানে পেতল যথাযথভাবে স্থান লাভ করে। এবার জল ঢেলে ঠাণ্ডা করার পালা। তারপর মাটির আস্তরণটিকে ভেঙে ছাড়িয়ে প্রার্থিত জিনিসটিকে বের করা হয়। এবার নরুনের

মত বাটালি দিয়ে জড়ানো অংশের জটগুলি মেরে দেওয়া হয় এবং প্রথমে যে প্রার্থিত মূর্তির ছাঁচটির উপর মোমের লেত্তি জড়ানো হয়েছিল, প্রয়োজনে সেই ছাঁচটির মাটি ঠুকে ঠুকে বের করে দেওয়া হলেই প্রার্থিত শিল্পদ্রব্যটি পাওয়া যায়।

মোমগলানো পিতলের দ্রব্য তৈরির এই শিল্প পদ্ধতিটি যে প্রাচীন সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আজও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে এই লোকশিল্পটি এখনও সৃষ্টিশীল ও সজীব। দুঃখ, দারিদ্র ও অবজ্ঞার মধ্যে লালিতপালিত এই শিল্পী সম্প্রদায় কোনক্রমে এই শিল্পকাজটি চালিয়ে রেখে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।
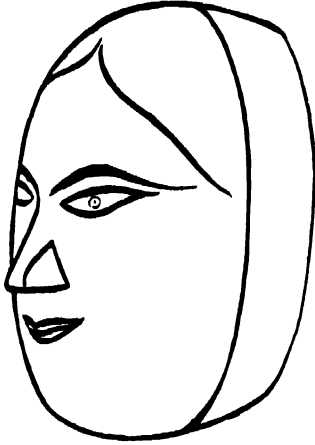
পিতলেব মুখ ডিবে ঃ পাত্রসায়েব, বাঁকুড়া

ঢোকরা কামার ছাড়া, গ্রামের কর্মকার সমাজও নিরেট পিতল ঢালাই বেশ কিছু গৃহশিল্পসামগ্রী তৈরি করতেন। শিল্পশুষমাসম্পন্ন সেসব দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নকশা করা পানের বাটা, বঙ্গনারীর মুখের আদলে দু'খোল পানের ডিবে. নকশাদার কাজললতা ও পিতলের জাঁতি, হুকোর রাখার পাত্র দুকোদান, চুনের কৌটো প্রভৃতি। একদা এসব দ্রব্যগুলি নির্মাণকাজে বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার কর্মকার সমাজের খ্যাতি ছিল সুবিদিত, দুঃখের কথা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পিতল ঢালাই এই কারুশিল্পটির অস্তিত্ব আজ আর নেই বললেই চলে।

পরিশিষ্ট-১

লোকশিল্পের প্রতীক ও বিষয়বস্তু

লোকশিল্পের রূপরীতির মধ্যে প্রতিভাত হয় এক শ্রেণীর প্রতীক ও 'মোটিফ'-এর অভিব্যক্তি। বিশেষ করে প্রথাগত ব্রত-আলপনা চিত্র, নকশি কাঁথার বুনন, চন্দ্রপুলি ও আমসত্ত্বের ছাঁচ, বালুচরী শাড়ি ও শীতল পাটির নকশা, সুতোর বুননে তৈরি হাত পাখা, কুলো ও পিঁড়ি চিত্র, কাঠখোদাই এবং পুতুলের গঠন ও চিত্রণের মধ্যে দেখা যায়, পদ্মকলি, পদ্মচক্র বা পদ্মলতা, কলমিলতা, ধানছড়া, শঙ্খলতা (যা শাঁখের চিত্র দিয়ে গ্রথিত), খুন্তিলতা (ঘর-গৃহস্থালির রন্ধনোপযোগী খুন্তির সমাবেশে রচিত), ঢেউ খেলানো বা পেঁচানো লতাপাতা, পদচিহ্ন, ময়ূর, পাখির সারি, পানপাতা, মাছ, খেজুর পাতা, কলকা, বুটি ও বরফি প্রভৃতির গতানুগতিক প্রতীকী চিত্রসজ্জা ও 'মোটিফ'। যে বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে এইসব প্রতীকী 'মোটিফ' গুলির উৎপত্তি, সেগুলির অধিকাংশ হ'ল নানান ধরনের লতা-পাতা, গাছ-গাছালি, ফুল-পাতা, নদ-নদী, পশু-পাখি, মাছ, গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ার, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ঘর-গৃহস্থালির উপকরণ প্রভৃতি।

এছাড়া, আলপনায় চিত্রায়িত প্রজনন ক্রিয়াচারের স্মৃতিবহ, আর একটি প্রতীকী চিত্র হ'ল, 'হাতে পো কাঁখে পো,' অর্থাৎ বহুসন্তান ক্রোড়ে জননীর প্রতিচ্ছবি। পাঁচমুড়ো (বাঁকুড়া) ও অন্যান্য স্থানের পোড়ামাটির ষষ্ঠী পুতুলের মধ্যেও এই 'মোটিফ'-টির যথার্থ রূপায়ণ দেখা যায়।

তমলুক (মেদিনীপুর) ও হরিনারায়ণপুর (দঃ ২৪-পরগনা) প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত খ্রিষ্টিয় দশ-বারো শতকের এই ধরনের প্রাচীন গোলাকার পোড়ামাটির মূর্তির গায়ে নিবদ্ধ হয়েছে বহু সন্তানের প্রতিকৃতি, যা লোকশিল্পের এই 'মোটিফ' টির এক সার্থক অনুকৃতি।

এই ধরনের নারীকেন্দ্রিক লোকচিত্র অনুপ্রাণিত বিশেষ যে 'মোটিফ' টি জনপ্রিয় হিসাবে আদৃত হয়েছিল, সেটি হল 'শিখী চঞ্চুপুটে সর্প', অর্থাৎ ময়ূরের দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরা সর্প। বিশেষ এই 'মোটিফ' টি যেমন দেখা যায় বঙ্গবালাদের নির্মিত চন্দ্রগুলি বা আমসত্ত্বের ছাঁচে উৎকীর্ণ খোদাই কাজে, নকশি কাঁথার বুননে এবং কাঠের লালরঙে রঞ্জিত সিঁদুর কৌটোর উপর এচিং খোদাইয়ে, তেমনি উৎকীর্ণ হয়েছে শেষ মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দিরে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলকে বা কাঠের দরজার পাল্লায়। শুধু তাই নয়, রাজস্থানী মিনিয়েচার এবং দেওয়াল চিত্রেও দেখা যায় এর অনুকৃতি। সবেচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ দেড়হাজার বছর পূর্বের এক ভগ্ন মৃৎপাত্রের গায়েও খোদিত হয়েছে অনুরূপ এই জনপ্রিয় মোটিফটি।

লৌকিক 'পদচিহ্ন' 'মোটিফ' টিও অনুসৃত হয়েছে যেমন লক্ষ্মীব্রতের আলপনায়, তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন প্রস্তর ভাস্কর্যেও এর রূপায়ণ দেখা যায়। এমন কি, গৌড়ের (মালদহ জেলা) কদমরসুল (১৫৩১ খ্রিঃ) স্থাপত্যটিও নির্মিত হয়েছিল পাথর খোদাই পদযুগল উপাসনাকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে জ্যামিতিক চৌকোণা বরফি 'মোটিফ' টি বিশেষভাবে দেখা যায় হাতপাখার বুননে, নকশি কাঁথায়, শীতলপাটির নকশায়, পিঁড়ি ও সরা চিত্রে এবং খেজুর পাতায় মোটিফটি কাঁথার বুননে ব্যবহৃত হলেও, কাঠের দরজার অলংকরণে বহুল ব্যবহৃত, যা 'খেজুর ছড়ি' খোদাই নামে খ্যাত।

'কলকা মোটিফ' টি যে মোরগফুল থেকে আহৃত তুর্কী 'কলগী' থেকে হিন্দিতে কলগা এবং বাংলায় 'কলকা' শব্দে রূপান্তরিত, তা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ উল্লিখিত। কিন্তু বহুস্থানে এটিকে আমের অবয়ব সদৃশ দেখা যায়, যা 'অজন্তা'র অলংকরণ চিত্রে প্রতিভাত। কোথাও আবার বালুচরী শাড়ির বয়নকাজে সেটির একত্র সমাবেশে তা শঙ্খলতার অনুরূপে দর্শিত।

'বুটি' মোটিফটি বয়নশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্যামিতিক ধরনের নকশা হলেও এটির উৎপত্তি ফুল ও পাতা থেকে; শাড়ি, নকশিশাঁখা, হাতপাখা, শীতলপাটি প্রভৃতির বুননেই এর বিশেষ ব্যবহার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আবহমান কাল ধরে গ্রাম জীবনের এই সব লৌকিক চিত্রকল্প জনমানসে এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রেও এইসব 'মোটিফে'র বেশ কিছু প্রভাব দেখা যায়। ঢেউ খেলানো লতাপাতার 'মোটিফ' টি অনুসৃত হয়েছে মন্দির মসজিদে উৎকীর্ণ 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ সজ্জায় এবং প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত পাথরের দ্বারপার্শ্ব বা দ্বারশীর্ষে, যা 'পত্রলতা' নামে খ্যাত। অনুরূপ, পদ্মচক্র বা পদ্মদল প্রভৃতি 'মোটিফ' -এর প্রতিরূপ দেখা যায় বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রস্তর ভাস্কর্যে, যা 'ফুলবল্লী' নামে অভিহিত। মন্দির দেওয়ালে ও কাঠের ভাস্কর্যেও এই মোটিফটি ছয়লাপ। এমন কি, এর প্রভাব দেখা যায়, মৌর্য-সুঙ্গ যুগের 'পাঞ্চমার্ক' ও 'কাস্ট কপার' মুদ্রায় এবং ঐ সময়ের বিভিন্ন মৃৎপাত্রের গায়ে ছাপ দেওয়া উৎকীর্ণ নকশায়।

পরিশিষ্ট-২

হাওড়া জেলার মাটির ঘর

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। এই ক্ষুদ্র জেলাটির শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা হয়নি; বরং উপেক্ষার দৃষ্টিতেই বেশি করে দেখা হ'য়েছে। অথচ বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের বা প্রবাহের কথা চিন্তা করতে গেলে, হাওড়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা চলে না। কেননা প্রায় সব জেলারই কিছু না কিছু আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই বঙ্গ সংস্কৃতি সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বুঝতে গেলেই প্রয়োজন হয় আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন এবং এই অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়, দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'হাওড়া জেলার লোক-উৎসব' গবেষণা গ্রন্থে

বর্তমান প্রবন্ধর লেখক এই জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে হাওড়া জেলার মাটির ঘর পর্যায়ে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মূল উদ্দেশ্য।

হাওড়া জেলার সামান্য মাটির ঘরের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কী উপাদান থাকতে পারে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রশ্নের আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয়ে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে চাই এবং তা হোল বর্তমানে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলির দ্রুত রূপান্তর হওয়া সম্পর্কে। আগের মত গ্রামীণ সংস্কৃতি স্থিতিশীল থাকছে না এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রাম্য সমাজের গড়ন এবং সেই সঙ্গে মানুষের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটছে। ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন ইতিহাস রচনার জন্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলায় আমরা বিগত কয়েক দশকের মধ্যে যে কয়টা মাটির বাড়ি দেখেছি, বর্তমানে তার অস্তিত্ব বহুস্থানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালে কয়েকবার ভয়াবহ বন্যায় ফলে এইসব মাটির ঘর বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে মাটির ঘরের স্থানে এসেছে পাঁচ ও দশ ইঞ্চি পরিমিত ইঁটের দেওয়ালের বাড়ি এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তা নির্মিত হয়েছে। অথচ আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে নির্মিত এই সব মাটির দেওয়ালের এক একটি বাড়ির পিছনে ঘরামি বা বাড়ুই মিস্ত্রিরা যে অধ্যবসায় ও কর্মনিপুণতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বর্তমানে এই জেলার মাটির বাড়িগুলি, যা এখনও অবশিষ্ট আছে তা বহুক্ষেত্রেই এখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যাও বা দু'একটি মাটির বাড়ি কোনরকমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, বিগত ১৯৭৮ সালের বন্যায় তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া জেলায় মাটির ঘর শীর্ষক আলোচনা, হাওড়া জেলার স্থাপত্যকীর্তির অংশবিশেষ হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে।

এই নদীবহুল দেশে পলিমাটির প্রাচুর্য যে শুধু তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা কাজে লেগেছে তা নয়; বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যকলার অন্যতম উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। পাথর দুর্লভ বলে নিম্ন-বঙ্গের অন্যান্য জেলার মতই হাওড়া জেলায় গৃহনির্মাণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাঁশ, কাঠ ও খড় প্রভৃতি। পোড়ামাটির বা ইঁটের ব্যবহার যে ছিলনা তা নয়— তবে তা জমিদার বা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইঁটের বাড়ি তৈরির বিষয়ে সামর্থ থাকলেই যে করা যেতে পারত—এমন নয়; এ বিষয়ে একটা গ্রাম্য সংস্কার ছিলো। 'ইঁট পোড়ানো সকলের সহ্য হয় না'— এই ধরনের একটা সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী হ'য়ে অনেকে ইঁটের বাড়ি তৈরি থেকে বিরত থাকতেন।

প্রাচীনকালে কোন মন্দির বা মূর্তি যেমন শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নির্মিত হোত তেমনি গ্রামাঞ্চলে কোনস্থানে গৃহনির্মাণের পূর্বে গৃহস্থেরা গৃহনির্মাণের যথাযোগ্য স্থান এবং গৃহের সম্ভাব্য গঠনাদি সম্পর্কে স্থানীয় আচার্য ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আচার্য ব্রাহ্মণেরা 'বাস্তুশাস্ত্র' বিষয়ক পুঁথি অবলম্বনে যথাযোগ্য পরামর্শ দান করতেন। তখনকার দিনে বলতে গেলে এই সব আচার্য ব্রাহ্মণেরা ছিলেন গ্রামীণ গৃহনির্মাণের এক এক জন ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি।

হাওড়া জেলার মাটির বাড়ি শুধুমাত্র একতল বিশিষ্ট নয়; দ্বিতল ছাড়া ত্রিতল বিশিষ্ট বাড়িরও অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গেছে। আজ থেকে তিনশো বছর আগেও হাওড়া জেলায় যে দোতলা বাড়ির অস্তিত্ব ছিল সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি জোড়হাট (আঁদুল) এলাকার প্রাচীন কবি হরিদেব শর্মার রচিত 'শীতলামঙ্গল' ও 'রায়মঙ্গল' পুঁথি থেকে। মাটির এই সব ঘরগুলির ছাউনি শুধুমাত্র দোচালা বা চারচালা ছিল না, বারান্দা সমেত আট চালাও ছিল। ছাউনির উপকরণ হিসেবে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য খড়, তালপাতা বা উলু ব্যবহার করা হোতো। বৃষ্টির সময় সহজেই যাতে জল গড়িয়ে যেতে পারে সেজন্যে চালগুলিকে পিরামিডের মতই উঁচু করা হোত। কিন্তু চতুর্দিকেই এর ঢালু চাল নিচের দিকে সোজা না হ'য়ে অর্ধবৃত্তাকার হিসাবে বেঁকে যেত। একটা নৌকোকে উল্টে দিলে যে আকার ধারণ করে, ঠিক সেইমত। এই ধরনের বাঁকা চাল তৈরির পদ্ধতিকে বলা হোত 'ভামর' দেওয়া। এর ফলে এই সব ঘরগুলির মধ্যে একটা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো এবং এই সব মাটির ঘরের অনুকরণেই বাংলা মন্দির নির্মাণ বহুলাংশে যে প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাটির এই সব দোচালা, চৌচালা ও আটচালা প্রভৃতি ঘরের অনুকরণে শিল্পীরা মন্দির ও দেবালয় নির্মাণ করেছেন। লোকগৃহ ও দেবগৃহের মধ্যে ব্যবধান তারা রাখেন নি।

হাওড়া জেলায় ঘরের যে মাটির দেওয়াল দেওয়া হোত, তা প্রায় তিন থেকে চার হাত পর্যন্ত পুরু হোতো। আশ্বিন-কার্তিক থেকে সুরু হত দেওয়ালের কাজ এবং কালবৈশাখীর আগেই শেষ করা হোত। পাকা ঘরের দেওয়ালের মতো মাটির ঘরের ভিত্ কিছুটা খুঁড়ে নিয়ে সেই ভিতের তলমাটি ভালোভাবে জলে ভিজিয়ে বা জাবকিয়ে নিতে হোত। এরপর দেওয়ালের পাটি তোলার কাজ শুরু।

যেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করা হবে তাকে বলা হয় 'জাবখানা'। জাবখানার মাটি দোআঁশলা হ'লেই ভাল হয়, এঁটেল মাটিতে ফাট ধরে। জাবখানার মাটি বেশ ভাল করে জল দিয়ে চার পাঁচ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর প্রস্তাবিত দেওয়ালের কাছাকাছি একটা জায়গায় লম্বাভাবে পনের থেকে কুড়ি সেমি. পরিমাপ ভিজে মাটি তুলে এনে ঐভাবে পনের সেমি. পরিমাণ পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মুগুরের আকারে বাবলা কাঠের তৈরি 'পিঠ্‌নে' দিয়ে সেই মাটিকে বেশ শক্তভাবে জমাট করে তুলতে হয়। এবার তিন সেমি. বা ছয় সেমি. পরিমিত মাটির চাপ কোদাল দিয়ে কেটে দেওয়াল তৈরি শুরু করা হয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন কাঁচা ইঁটের তৈরি বাড়ি। দেওয়ালগুলি সাধারণত পঁয়তাল্লিশ সেমি.র বেশি উঁচু করা হোত না। এইভাবে একতলা বা দোতলা বাড়ির দেওয়ালের কাজ পরিমাপ মত তুলে শেষ করা হোত।

দেওয়াল শেষ হওয়ার পর অসমতল দেওয়ালের গায়ে ঠিক তখনই কোন মাটির লেপন ইত্যাদি দেওয়া হোত না। কেননা ভিতরের মাটি কাঁচা থাকার জন্যে দেওয়ালের গায়ে কোন কিছুর লেপন দিলে তা পরে ফেটে যাবার বা ফুলে উঠবার সম্ভাবনা থাকতো। তাই আগামী শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোত।

শীতের সময় শুরু হোত উলুটির কাজ। হাওড়া জেলায় উলুখড়ের বন ছিল সর্বত্র। উলুবেড়িয়া ও কুশবেড়িয়া প্রভৃতি নামের মধ্যে অতীত দিনের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের

কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উলু ও মাটির সংমিশ্রণকেই বলা হয় উলুটি। খড়ের কাঠি যেমন ফাঁপা তেমনি উলুর কাঠি নীরেট। ফলে এই কাজে উলুর উপযোগিতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব ছিল বেশি। পচাপুকুরের এঁটেল মাটির পাঁক তুলে ছায়াশীতল স্থানে একদিনের জন্যে রেখে দেওয়া হোত। পরদিন পাঁচ সেমি. পরিমাণ উলু কুঁচি করে কেটে ঐ পাঁকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। হাতখানেক ব্যাসের একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়ে, সেই গর্তে ঐ পাঁক ও উলু মেশানোর কাজ পা দিয়েই করা হয়। যখন উলু ও পাঁক ভালভাবে মেশানো শেষ হয়, তখন দেওয়ালের গায়ে ঐ তৈরি মণ্ডটির ছোপ লাগানো শুরু করা হয়। ছোপ লাগানোর পূর্বে মাটির দেওয়াল ভালভাবে কোদাল দিয়ে ছুলে ফেলতে হয়—এতে মরা মাটি ঝরে পড়ে। এবারে দেওয়ালের গা অসমতল হ'লে এই ছোপের সময় আন্দাজমত নিচু জায়গায় পুরু ও উঁচু জায়গায় পাতলা করে কাদা ধরাতে হয়। ছোপ একটু টেনে গেলে ওলন ধরে একেবারে যথাযথ সমান মাপে পাটা দিয়ে চৌরস করতে হয়। এরও পরে যখন দেওয়াল আরও শুকিয়ে যায়, তখন উলুবিহীন পাতলা পাঁক দেওয়ালের গায়ে লেপে দিতে হয়। তারপর আট সেমি. পরিমাপ করে কাটা উলু ঐ পাতলা কাদার ওপর আস্তে আস্তে ঘন করে বসিয়ে দিতে হয়। এবারে মিস্ত্রির 'উসো' দিয়ে সমান করার কাজ চলে। গৃহের মধ্যে কোন মূর্তি, নকশা বা কার্নিস জাতীয় কিছু করার থাকলে, উলুটির ছোব সেই স্থানগুলোয় একটু উঁচু করে মাটি দিয়ে রাখতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলিতে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়।

উলুটির কাদা যখন শুকিয়ে যায়—তখনই শুরু হয় তুষুটি। ঢেঁকিভানা ধান থেকে তখন প্রচুর পরিমাণে তুঁষ পাওয়া যেত। এই তুঁষকেও ঐ ভাবে পচা পাঁকের সঙ্গে সামান্য গোবর মিশিয়ে পাতলা করে দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে পুনঃ পুনঃ মাজতে হয়। যত মাজতে পারা যাবে ততই শক্ত হবে। বেশ কিছুক্ষণ মাজার পর যখন একটা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়—তখন শেষ হয় তুষুটির কাজ।

তুষুটি পর্যায়ের পর শুরু হয় পেটুটির কাজ। পেটুটির কাজ সাধারণত বিত্তবানরাই করতেন। পেটুটির জন্য সাধারণত মাঠের এক ধরনের সাদা বালি ব্যবহার করা হোত। (সাধারণত এই অঞ্চলে ইঁট তৈরির জন্যে 'ধূলা বালি' নামে যে বালি ব্যবহার করা হয়)। পাটের কুঁচি প্রায় তিন সেমি. পরিমাপ করে কেটে নিয়ে ঐ বালি ও পাঁকের সঙ্গে মেশাতে হয়। পাট-মাটির পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে মাজতে হয়। আগেই বলা হয়েছে গৃহস্থ যদি ভিতরে বা বাইরের দেওয়ালে কোন মূর্তি বা নকশা করার ইচ্ছে করেন, তবে উলুটির সময় বা-রিলিফের নকশার উঁচু নিচু অসমাপ্ত কাজটি তুষুটির সময় শেষ করতে হয় এবং সর্বশেষে পেটুটির সময় সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হয়।

অনেক বিত্তবান পেটুটির পর তুলুটির কাজও করতেন। রেড়ির তেল, তুলো এবং পাঁক সহযোগে এক মণ্ড তৈরি করে, ঐ পেটুটির গায়ে 'উসো' দিয়ে লাগানো হোত। এর ফলে দেওয়াল এত চকচকে ও মসৃণ হোত যে, দেওয়ালের ওপর দিয়ে কোন পিঁপড়ে চলাফেরা করতে পারতো না।

অনেকসময় দেওয়ালে পেটুটির পাট বেরিয়ে থাকার জন্য পাতলা এঁটেল মাটির প্রলেপ লাগানো হ'ত। তারপর সামান্য সাদা রঙ ধরানোর জন্য তেঁতুল বিচি ভেজে গুঁড়িয়ে নিয়ে

তাকে ফুটিয়ে ক্কাথ বের করে তার সঙ্গে সামান্য খড়ি ও নীল রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়ালে লেপে দেওয়া হ'ত।

দেওয়ালের বাইরে অনেক সময় দেওয়াল চিত্র (Fresco) করা হোত। স্থানীয় পটুয়া বা সূত্রধরদের ডাক পড়তো সেই সব কাজে। বিশেষ করে ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার কাজ হাওড়া জেলার দু-এক স্থানে আমরা দেখেছি। উলুটি করা দেওয়ালের গায়ে অনেক সময় যে বা রিলিফে মূর্তি তৈরি করা হোত, তাতেও রঙ সহযোগে চিত্র বিচিত্রিত করা হয়েছে—এমনও নজরে পড়েছে।

হাওড়া জেলার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে, একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তা হোল যে, আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে, অজন্তা ও ইলোরা প্রভৃতি স্থানে পাথরের গায়ে যে দেওয়ালচিত্র প্রস্তুত করা হোত, তারও উপকরণ ও পদ্ধতি ঠিক মাটির ঘরের উলুটি তুষুটি ও পেটুটির মতই ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সেখানে পাথরের দেওয়াল গাত্রে পাঁচ সেমি. পুরু মাটি, তুষ ও গোবরের পলস্তারা তো ভাল ভাবেই লক্ষ করা যায়। বেশ বোঝা যায়, অতীতের সেই নির্মাণ-পদ্ধতির ধারা আজও গ্রামাঞ্চলে অনুসৃত হয়ে আসছে বছরের পর বছর। সুতরাং বাংলার এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় গৃহের দেওয়াল প্রস্তুতির বিবরণ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ থেকে যায়।

পরিশেষে, শিল্প ও সংস্কৃতি কোনদিন কোন একটা গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাই হাওড়া জেলার মাটির ঘর আলোচনার সময় এই জেলার ভৌগোলিক সীমানার কথা মনে করে বলা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলা হোল কাছাকাছি হুগলি, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা এই তিনটি জেলার সঙ্গমস্থান। সুতরাং ঐ সব জেলার সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশ্রণ দেখা যেতে পারে এই জেলার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে। তাই আপাতদৃষ্টিতে হাওড়া জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে পাশাপাশি জেলাগুলির সংস্কৃতির যে বহুলাংশে মিল থাকবে—একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ হাওড়া জেলা সংস্কৃতি সমন্বয়ের এবং সংস্কৃতি বিবর্তনের একটি উজ্জ্বল পটভূমি। সুতরাং বলা যেতে পারে এই অঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য আঞ্চলিক লোক চেতনারই গিরিনির্ঝর বিশেষ। (প্রবাসী, অগ্রহায়ন, ১৩৭৫)

পরিশিষ্ট-৩

শস্যভাণ্ডার ও ধানের গোলা

প্রাগৈতিহাসিক কালের ভারতবর্ষে শস্যভাণ্ডার কেমন ছিল, তা নিয়ে মোহেন-জো-দড়ো প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা লিখেছেন, 'শস্যভাণ্ডার যাহাতে স্যাঁতসেতে ভাব না হইতে পারে সেজন্য মধ্যে ফাঁক রাখিয়া সমান্তরাল দেয়াল দিয়া তদুপরি শস্যাগার নির্মাণ করা হইত এবং তাহাতে শস্যাদি রাখা হইত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হরপ্পাতেও এইরূপ নির্দশন পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগে পাহাড়পুর (রাজসাহী জেলা) ও

বাণগড় (দিনাজপুর জেলা) প্রভৃতি স্থানেও এই জাতীয় নির্দশন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে বর্তমান কালেও শস্যাদি রাখিবার জন্য ইঁট কিংবা মাটি দিয়া এই প্রকার শস্যাগার নির্মিত হইয়া থাকে (কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী ঃ প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো)। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের চিরুটিতে রাজবাড়িডাঙ্গায় খননকার্যের ফলেও সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে বারোশ' বছর আগের একটি অগ্নিদগ্ধ শস্যাগার।

কিন্তু সেকালের শস্যাগারের প্রকৃত স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য কি ছিল তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের ধারণায় মেহেন-জো-দড়োর সেকালেব সেই শস্যভান্ডার নির্মিত হয়েছিল কাঠের কাঠামো দিয়ে। (সেই আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশেও শস্য সংরক্ষণপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের শস্যভান্ডার ও শস্যাগার নির্মাণ করে। আর এই শস্যাগারের প্রয়োজনে তার আঞ্চলিক স্থাপত্যে এসেছে নানান বৈশিষ্ট্য। বাংলার শস্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে অনুসৃত সেই স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যই বাংলার প্রবহমান শিল্প সংস্কৃতিকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেখা যাচ্ছে, গ্রাম-গ্রামান্তরের দরিদ্র ব্যক্তিরা তাঁদের শস্য সঞ্চয় করে রাখেন মাটির পাত্রে, কলসিতে বা জালায়। সভ্যতার উন্মেষকালে মানুষ যখন ধীরে ধীরে বন্য তৃণজাতীয় গাছের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চাষবাসের রীতি আবিষ্কার করল, তখন শস্যকে রক্ষা করার জন্যে যে চিন্তাভাবনার উদয় হয়েছিল তারই পবিণত ফল হল মাটির পাত্র—হাঁড়ি-কুড়ি আর কলসি-জালার নির্মাণ। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে যে সব বড় বড় মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হযেছে, তার অধিকাংশই এই শস্য সঞ্চয়ের জন্যে ব্যবহৃত হ'ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
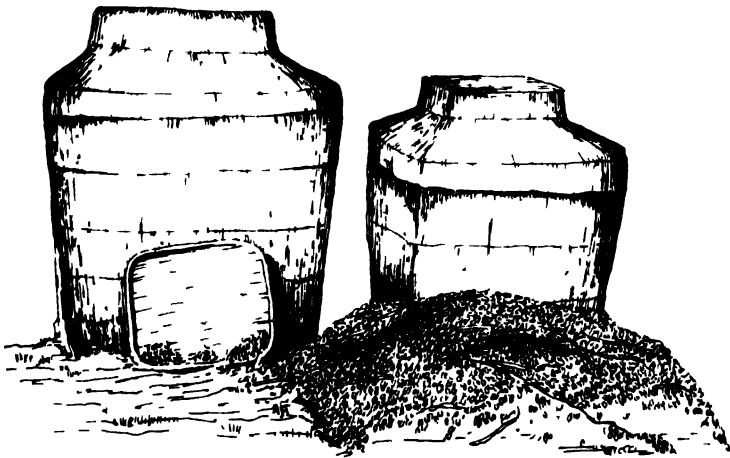
কাঁচা মাটিব জালা ঃ গৌর, পাণ্ডুয়া

নেই। এখনও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে সেই প্রাচীন পদ্ধতির ধারাবাহিকতা। এখনও শস্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে কুম্ভকারদের তৈরি

পোড়ামাটিব বড বড জালা। অল্প জমি-জাযগা যাঁদেব আছে তাঁদেব সেই জমিব উৎপন্ন ফসল দিযে তো কোন বড শস্যগোলা নির্মাণ কবা চলে না। তাই আশ্রয নিতে হয এমন সব ছোট-খাটো আধাবেব। আব সেই সঙ্গে এই সব আধাবগুলিও নির্মিত হয বিভিন্ন উপাদানে ও বিচিত্র গঠনভঙ্গিমায। সাধাবণভাবে মাটিব জালায শস্য সংবক্ষণ-পদ্ধতিব কথা ছেড়ে দিলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধবনেব যে সব শস্যভাণ্ডাব নির্মাণেব প্রচলন আছে, তাব বিববণও কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয। মালদহ জেলাব গৌড়-পাণ্ডুযা অঞ্চলে সাধাবণ গবিব গৃহস্থেব বাড়িতে শস্য সংগ্রহ কবাব জন্যে বড বড মাটিব জালা তৈবি কবা হয। এ মাটিব জালা কাঁচা মাটি দিযে তৈবি কবে শুকিযে নিযে ব্যবহাবেব উপযোগী কবে তোলা হয। শস্য যাতে ভালভাবে সংবক্ষিত হয তাব জন্যে সেই জালাব মুখেও মাটি দিযে তৈবি ঢাকনাও নির্মাণ কবে দেওযা হয। এব এক একটিব উচ্চতাও হয প্রায চাব থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত। তবে এই ধবনেব শস্য সংবক্ষণ ভাণ্ডাবেব বৈশিষ্ট্য হল এব নির্মাণপদ্ধতি। বাংলাব গ্রামাঞ্চলে মাটিব বাড়ি তৈবিব জন্যে মাটিব দেওযাল যেমন প্রথাগতভাবে একেব পব এক হাত খানেক উচ্চতায কাদামাটি দিযে গেঁথে তোলা হয, এক্ষেত্রেও এই সব শস্য বাখাব আধাবগুলিও কাদামাটি দিযে সদ্য সদ্য নির্মাণ না কবে সামান্য উচ্চতায ক্রমে ক্রমে নির্মাণ কবা হয। জালাব মত গোলাকাব আকৃতিব বদলে এই অঞ্চলে অনেকে আবাব চৌকো ধবনেব শস্যাধাবও নির্মাণ কবে থাকেন। উপবেব ঢাকনাটিও সেই মত চৌকো আকাবে নির্মাণ কবা হয কাদামাটি দিযে। এই সব পাত্রেব তলদেশ কোন কাবণে পবিষ্কাব কবাব দবকাব পড়লে পাতকুযাব বেড়েব মত আলাদা আলাদাভাবে খুলে ফেলা হয। তাবপব পবিষ্কাব শেষে খোলা বেড়গুলিকেযথাক্রমে পব পব বসিযে দেওযা যায।

মাটি দিযে তৈবি এই ধবনেব আধাব ছাড়া খড দিযে পাকানো কাছি—যাব স্থানীয নাম 'বড', তা দিযে গোলাকাব কবে জড়িযে জড়িযে আবও এক ধবনেব ধান বাখাব পাত্র বহু গ্রামাঞ্চলে দেখা যায। স্থানীযভাবে অনেক জাযগায এগুলিকে বলা হয মবাই। গৃহকোণে এই ধবনেব খড পাকানো মবাইযে গৃহস্থেবা ধান সংবক্ষণ কবে থাকেন। যাদেব শস্যেব পবিমাণ বেশি হয—তাবা বাড়িব উঠোনেব এক কোণে পাশাপাশি হাত দেড়েক উঁচু সমান্তবাল দু'টি প্রাচীবেব উপব একটা মাচা তৈবি কবে তাব উপবে ঐ খড পাকানো কাছি অর্থাৎ এই খড়েব 'বড' দিযে পাকিযে গোলাকাব ধবনেব মবাই নির্মাণ কবেন। এগুলিব আকৃতি দাঁড়ায লাট্টুব মত। বোদ জলেব হাত থেকে নিবাবণেব জন্যে এব উপব ছাউনি কবে দেওযা হয। সবশেষে এব উচ্চতা দাঁড়ায প্রায ছ'-সাত হাত পর্যন্ত। প্রযোজনমত ধান বেব কবাব জন্য এগুলিব কোন প্রবেশপথ বাখা হয না। প্রযোজনেব সময চাহিদামত ধান বেব কবে আবাব ছাউনি কবে দেওযা হয, কখনও বা সমস্ত ধান বেব কবে নেওযাব পব সে বছবে এই অস্থাযী মবাইযেব প্রযোজন শেষ কবে দেওযা হয। হুগলি জেলায এই ধবনেব খড দিযে তৈবি মবাই বহুস্থানে দেখা যায।

পশ্চিমবঙ্গেব যে সব স্থানে হোগলা বেশি জন্মায, সেখানে ধান ওঠাব সময নবম হোগলা গাছেব পাতা দিযে তৈবি একটা চৌকো আকৃতিব থলি তৈবি কবা হয। এগুলি প্রথমাবস্থায চটেব বস্তাব মতই ভাঁজ কবা থাকে। পবে যখন এগুলিতে ধান বোঝাই কবা হয

তখন এগুলি তার স্ব স্ব আকৃতি গ্রহণ করে। এগুলিও উচ্চতায় প্রায় চার-পাঁচ হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। হোগলা দিয়ে তৈরি শস্য সংরক্ষণের এই ধারটিকে স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'ডোল'।

মেদিনীপুর জেলায় যে অঞ্চলে বাঁশের আধিক্য সেখানে এই ধরনের গোলাকার 'ডোল' তৈরি করা হয় বাঁশের চ্যাঁচারি দিয়ে এবং অনেক সময় ভিতরে পাতলা করে মাটি বা গোবর লেপে দেওয়া হয়—যাতে শস্যকণা সামান্য ছিদ্র দিয়েও বেরুতে না পারে। এগুলি আকারে যে খুব ছোট হয় এমন নয়। এই ধরনের ডোলের উচ্চতা দাঁড়ায় তিন-চার হাত পর্যন্ত। ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ডোল হাটে-বাজারে ডোলশিল্পীরা নিয়ে আসেন স্বল্পবিত্ত গৃহস্থের একান্ত প্রয়োজনে।

এছাড়া মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলায় যেসব ছোট ছোট গোলাকার ধানের গোলা তৈরি করা হয়, স্থানীয়ভাবে তাকে বলা হয় 'কড়ুই'। বাঁশের বাখারি দিয়ে গোলাকার করে বা লাট্টুর মত আকৃতি কবে এগুলি নির্মাণ করা হয়। ভিতরে মাটি দিয়ে লেপা হয় এবং বাইরে প্রয়োজনবোধে কাদা লেপাও হয় বা অনেক সময় লেপা হয় না। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের আকৃতি হয় এই সব কড়ুইযের। অনেক সময আবার ডমরুর আকারেও এর গঠনভঙ্গিমা দেখা যায়। এই সব কড়ুইয়ের ভেতর প্রবেশ করার জন্যে উপরেব দিকে প্রবেশ পথ রাখা হয়। মাটির উঁচু উঁচু স্বল্প উচ্চতার চৌকো থামে বসানো হয় এই সব কড়ুই। এগুলির গোলাকার আকৃতির জন্যে খড়ের ছাউনি দিয়ে পরিপাটি কবে ছাওয়া হয়। নবান্নের সময় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হিসেবে গৃহস্থ বধূরা পিটুলিগোলা দিয়ে এর উপর আলপনাব নানান সাজ-সজ্জা ও অঙ্কিত করেন।

যে সব বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের উৎপন্ন শস্য অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়, তাঁরা 'কড়ুই' নির্মাণ করেন না। তাঁদের গোলা তৈরি করা হয় একটু বৃহৎ আকারের। স্থানীয়ভাবে এগুলির নাম দেওয়া হয় 'হামার'। 'হামার' নির্মাণ করা হয় বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের আকারে। মাটির থাম এতবড় হামারের ভার বহন করতে পারবে না বলে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইঁটের সিমেন্ট দিয়ে তৈরি থাম। যে অঞ্চলে ল্যাটারাইট বা ঝামাপাথর বেশি পাওয়া যায় সেখানে বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দু-তিন হাত উচ্চতার ঝামাপাথর ব্যবহার করা হয় হামার স্থাপনের থাম হিসেবে। বাইরে কাঠের কাঠামোর ভেতরে বাঁশের বাখারির বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। ওপরে চাপানো হয় খড়। স্থায়িত্বের জন্যে 'করোগেটেড্' সিটের টিন বা পোড়ামাটির টালি ব্যবহার করা হয়।

যুগের পরিবর্তনে আধুনিক রুচিসম্মত মরাই বা হামার তৈরি হচ্ছে গ্রাম গ্রামান্তরে অর্থবানদের দৌলতে। স্থায়িত্বের জন্যে, শস্য সংরক্ষণের সুবিধের জন্যে এবং সর্বোপরি চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যে চলন হয়েছে কংক্রিটের ঢালাই গোলা। কখনও তার উপর টিনের ছাউনি আর তেমন তেমন অর্থের বল থাকলে উপরে খড়ের চালার অনুকরণে কংক্রিটের ঢালাই।

এছাড়াও গ্রাম-বাংলায় আরও কতভাবে যে শস্যসংরক্ষণ কবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার বিবরণ আমাদের জানা নেই। এক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবে এবং জেলাওয়ারি এই ধরনের

গোলা, মরাই, কড়ুই, হামার বা ডোল প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করলে শস্য সংরক্ষণের একটি আঞ্চলিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যাবে সেইসঙ্গে উপলব্ধি করা যাবে বঙ্গ -সংস্কৃতির স্থাপত্য ধারার অন্তর্নিহিত রূপসৌন্দর্যের অবদান। (পশ্চিমবঙ্গ, ২৫.৫.১৯৭৩)

পরিশিষ্ট-৪

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া-চিত্রকর ঃ সামাজিক পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কতকগুলি জাতিসম্প্রদায় আছেন, যাঁদের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। রাজ্যের ভাঙাগড়ার যুগসন্ধিক্ষণে বিজয়ী রাজার প্রবল প্রতাপে তাঁরা হয়ত নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, সুস্থভাবে বাঁচার তাগিদে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু আবহমানকালের নিজস্ব আচার-ধর্মকে বিসর্জন দিতে পারেননি। তাই বর্তমানকালে তাঁদের সামাজিক ইতিহাস গবেষকদের কাছে একান্তই কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর সমাজ হোল এমনই একটি দৃষ্টান্ত। পেশা যদিও এঁদের হিন্দুদেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে পট-চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতসহ প্রদর্শন, পুতুল তৈরি ও প্রতিমা নির্মাণ, কিন্তু জাতি হিসেবে এরা বিচিত্র। না হিন্দু, না মুসলমান।

চিত্রকরদের আচার ও সংস্কার নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তার প্রায় সবই হিন্দু সমাজের, কেবল মুসলমান সমাজের বাইরের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য তার উপর আরোপ করা হয়েছে। এরা হিন্দু নাম বহন করেছে, নামের শেষে পদবী দিয়েছে চিত্রকর। এদের বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হোত একান্তই চিত্রকর সমাজের মধ্যে। বিবাহ অনুষ্ঠানে মৌলবি এসে ইসলাম ধর্মমতে কলমা পড়িয়ে যেতেন। কিন্তু বিবাহাদির অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে এই মৌলবিরা হস্তক্ষেপ করতেন না। এখানে অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান বলতে কি বলতে চেয়েছি, তা হোল বিয়ের সময় গায়ে হলুদ, বিবাহের পর হিন্দুরীতি মত সিঁথিতে সিঁদুর এবং শাঁখা-পরানো ইত্যাদি। মুসলমানদের দিনের বেলা বিয়ের বদলে, হিন্দুদের মত রাত্রিবেলায় এদের বিয়ে হোত। বিবাহের পর গ্রাম্য হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে নব বিবাহিত বর-বধূ প্রণাম জানাতো। ছেলের অন্নপ্রাশনে মুসলমান রীতিতে 'সুন্নত' করানো হোত। হিন্দু ঠাকুর-দেবতা নিয়ে কাজ-কারবার—তাই এদের গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। নামাজ পড়ার রীতিও ছিল, কিন্তু তাও আবার মুসলমানদের মসজিদে ছিল প্রবেশ নিষেধ। মেয়েরা শাঁখা-সিঁদুর পরে লক্ষ্মীপুজোও করেন। চিত্রকররা নিজের 'বিশ্বকর্মার' পুত্র বলে পরিচয় দেন—তাই বিশ্বকর্মা পূজা আরাধনা করতে হয়। মুসলমানের কিছু কিছু রীতিনীতি পালন করলেও তাঁরা চিরদিন হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কথা শুনিয়েছেন, পট এঁকে, পট দেখিয়ে; আবার মূর্তিও গড়েছেন। সুতরাং চিত্রকর সমাজের জাতি নির্ণয় মধ্যপথে এসে থেমে রইলো—হিন্দু সমাজে পুরোপুরি তার যেমন স্থান হোল না অচ্ছ্যুৎ বিধর্মী হিসেবে; আবার মুসলমান সমাজের মধ্যে নিজেদের একাত্ম করে দিতে পটুয়ারা পারলো না। এই হল সংক্ষেপে পটুয়াদের জাতিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ও আর্থিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের বংশানুক্রমিক পেশারও পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু পেশার পরিবর্তন নয়, সামাজিক বিভিন্ন

কারণে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে এই সব পটুয়া-চিত্রকররা কিভাবে তাদের জাতিগত সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করেছেন তার উদাহরণ দেবার জন্যে বিভিন্ন জেলার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই।

হাওড়া জেলার প্রশস্থ গ্রামের পটুয়ারা না হিন্দু, না মুসলমান। জাতিগত অবস্থা নিয়ে, কিভাবে সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তা জানা যায় বেচু চিত্রকরের কথায়। প্রশস্থ গ্রামটিতে ছ'-সাত ঘর চিত্রকর-পটুয়ার বাস। এঁদের কেউ আর পট আঁকেন না বা পট দেখিয়ে গানও করেন না। এঁরা পুরোপুরি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণের মধ্যে নিজেদের উপজীবিকার সাশ্রয় করেছেন। জাতিগত সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে বেচু চিত্রকর জানালেন যে, আগে তাঁরা হিন্দুর নিয়মকানুন পালন করতেন এবং মুসলমানদের মতো নামাজ পড়তেন। কেন এই অবস্থা হয়েছিল তা নিয়ে, তাঁরা তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছেন যে, আদিতে তাঁরা ছিলেন হিন্দু-চিত্রকর; মুসলমান রাজত্বকালে নবাব-বাদশার লোকেরা হারেমে তাদের ডেকে নিয়ে যেতো বেগমদের তসবির তৈরির জন্যে। এই সময় মুসলমানদের সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশার জন্যে অন্যান্য হিন্দু সমাজের লোকেরা ঘৃণাভরে তাদের দেখতে থাকে—অপরদিকে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা হওয়ায় তাদের প্রভাবে অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা 'সুন্নত' ও পাঁচোক্ত নামাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্দরের মেয়েদের তো দরকার হয়নি আপস রফার। তারা যেমন কালী, দুর্গা, মনসা-শীতলার পূজার্চনা করেছে তেমনিই চালিয়ে এসেছে। তাই শাঁখা-সিঁদুর পুরোপুরি বজায় ছিল। কবর ও দাহ দুইই সে সময় চলিত ছিল। নামাজ পড়া হয়, অথচ হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে আঁকা পট দেখানোতেও কেউ আপত্তি করেনি। এই সাবেকি অবস্থাই পূর্বপুরুষ থেকে বহুদিন ধরেই চলে এসেছে। মানিকপীরের দরগায় সিন্নি দিয়েছে; হাজামরা সুন্নত করেছে ছেলেদের—নামাজও পড়া হয়েছে প্রথামত। আবার সিঁথেয় সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরে মেয়েরা পুজো দিয়েছে মা মাকড়চণ্ডীর থানে। মাকড়চণ্ডীর অন্নকূট পুজোর দিনে ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন মেদিনীপুর, হাওড়া-হুগলি ও ২৪-পরগনার মধ্যে।

বেচু চিত্রকরের কথায়, এ অবস্থায় প্রথম ধাক্কা এলো বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে। ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলিম লিগ শাসনের সময়ে মুসলমান হাজামেরা আপত্তি জানালো 'সুন্নত' করতে। পুরোপুরি মুসলমান না হলে তারা আসবে না এদের ঘরে। অথচ পুরোপুরি মুসলমান হলে এদের জাতপেশা পটুয়ার কাজ ছেড়ে দিতে হয়। তবে লিগ আমলের মুসলমান কর্তাব্যক্তিরা এঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, হিন্দুয়ানি-কাফেরবৃত্তি ঐ সব পট আঁকা বা ঠাকুর তৈরি ছেড়ে দিলে রাজসরকারে তাদের চাকুরি দেওয়া হবে। লিগ আমলের দলনেতারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃতিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে দেখিয়েছিলেন যে, তপসীলভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের বেলায় কীভাবে তাঁরা চাকরি-বাকরি দিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে গেছেন। প্রশস্থ গ্রামের চিত্রকররা লিগের কর্তাব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। যদিও নামাজ আর সিন্নি দেওয়া বজায় রইলো নিজেদের অভ্যেস আর বিশ্বাসে ভর করে। বিবাহ অনুষ্ঠানে এরপর কোন মোল্লা-পুরুত আর আসেনি।

ঠিক এরপরই এলো প্রাক-স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কারণ প্রশস্থর চারিদিকেই হিন্দু বসতি থাকার জন্যেই এবার আপত্তি এলো হিন্দুদের তরফ থেকে। তাই তাদের দাবি প্রবল হল—হয় পুরোপুরি মুসলমান হও, নয়ত শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে পড়; মাঝপথে আর থাকা চলবে না। এরপর পটুয়াদের এলাকায় এলাকায় শলা পরামর্শ চললো। অবশেষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজিরা এসে শুদ্ধিযজ্ঞ করে প্রশস্থর পটুয়াদের পুরোপুরি হিন্দু করে দিলেন। বেচু চিত্রকরের কথায়, সব জায়গার পটুয়াদেরই শুদ্ধি হয়ে গেল, কিন্তু বাদ হয়ে গেল কেবল নাড়াজোল, দাসপুর আর তমলুক অঞ্চলের পটুয়া গোষ্ঠী।

শুধু দাঙ্গার জন্যেই কি প্রশস্থ গ্রামের পটুয়ারা পুরোপুরি হিন্দু হয়ে পড়লেন—এই প্রশ্নের জবাবে বেচু চিত্রকর জানালেন যে, প্রশস্থ গ্রামের প্রতিমা নির্মাণের নামডাক এমন হয়েছিল যে, এর নাম হয়েছিল 'আঁদুলের কুমোরটুলি।' তাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই গ্রামে মরশুমের সময় এসে প্রতিমা নির্মাণের ব্যবসা শুরু করেন। ফলে দুর্গোৎসবের সময় বাড়িতে ঠাকুর তৈরির জন্যে চিত্রকর সমাজের আগে ডাক আসতো না। এই সব আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে তারা পুরোপুরি হিন্দু হয়ে যাবার জন্যে এত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ো থানা এলাকার কেশববাড়ের উদাহরণে আসা যাক। এখানে ছ'ঘর পটুয়া বাস করেন। এদের মধ্যে তিনজন এখনও পট দেখিয়ে গান করে বেড়ান এবং এদের বাড়ির মেয়েরা পুতুল তৈরি করে। বাকি দু'ঘর এখন পুতুল ও প্রতিমা তৈরি করেন। অন্যদের তুলনায় এদের অবস্থা একটু ভাল বলে মনে হয়। বাকি একজন চিত্রকর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তাঁর উপযুক্ত ছেলে এখন যাত্রাদলের উদ্যোক্তা; বর্তমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দৌলতে তিনি এখন হয়েছেন পি. চিত্রকর, এইচ এম বি।

কেশববাড়ের পটুয়াদের জাতিগত সমস্যার কথা তুলতে প্রবীণ সতীশ চিত্রকর জানালেন যে, বছর কুড়ি আগে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় কোলকাতার বালিগঞ্জ থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরমানন্দ গোস্বামী এসেছিলেন চিত্রকরদের শুদ্ধি করার জন্যে। কেশববাড় হাটের উপর হোমযজ্ঞ করে তাদের শুদ্ধি করিয়েছিলেন। শুদ্ধিতে এখানের সব চিত্রকররাই যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এক ঐ সতীশ চিত্রকর ছাড়া আর কেউ এই গ্রামে হিন্দু থাকে নি; এখানে বাকি পাঁচঘর আগের মতই আধা হিন্দু আর আধা মুসলমান হয়েই রয়েছেন। অন্যেরা আবার শুদ্ধি করে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেল কেন—এই প্রশ্নের জবাবে সতীশ চিত্রকর জানালেন যে, এরা নেশা ভাং করতো বলে ঠিক ভদ্র হিন্দুদের মত হতে পারলো না; তাই শুদ্ধি হয়ে যাওয়া চিত্রকর সমাজের লোকেরা এদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি হল না। এই সব অসুবিধের জন্যে এরা সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেল। কোন্ কোন্ জায়গার সঙ্গে হিন্দু মতের চিত্রকরদের সঙ্গে সতীশ চিত্রকরদের বৈবাহিক সম্পর্ক আছে, এই প্রশ্নের জবাবে জানালেন যে, প্রশস্থ, চণ্ডীপুর, সোনারপুর, আকুবপুর ও চৈতন্যপুর—এই সব এলাকার মধ্যেই শুদ্ধি হয়ে যাওয়া চিত্রকররা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে তাদের হিন্দু সমাজভুক্ত হবার জন্যে গর্বভরে জানালেন, 'গরমেন্টের

(গভর্নমেন্টের) বকসিস পাওয়া রজনী চিত্রকর এই হিন্দু হয়ে যাওয়া চিত্রকর সমাজ নিয়ে বহু আলোন দোলন (আন্দোলন) করেছেন। আর এখন দেখুন তাঁরই ছেলেরা আবার চিত্রকর পদবী পাল্টিয়ে 'পাল' পদবী নিয়েছেন।' অপর দিকে কেশববাড়ের অন্যান্য চিত্রকররা জানালেন যে, হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার জন্যে তাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে; দাঙ্গার সময় আশপাশের মুসলমান ভাইরা তাদের সাহায্য করেছে, কিন্তু হিন্দুরা তাদের ভয় দেখিয়েছে। তাই তারা পরবর্তী সময়ে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে নেমকহারামি করে নি; তারা সেই পুরানো অবস্থায় ফিরে গেছেন।

হাওড়ার চন্ডীপুরের পটুয়ারা ঘন মুসলমান বসতির ভেতর বাস করেন। মুসলিম লিগ আমলের সময় কুলগাছিয়া স্টেশনের জনৈক সহকারী স্টেশন মাস্টার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পটুয়াদের শুদ্ধি আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বাধা পেয়েছিলেন, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের দোর্দন্ড প্রতাপশালী মুসলমান প্রেসিডেন্টের দ্বারা। মুসলিম লিগের সমর্থক এই প্রেসিডেন্ট মশাই রেলকোম্পানিকে দরখাস্ত দিয়ে এই স্টেশন মাস্টারটিকে বদলি করার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পটুয়াদের একেবারে মুসলমান হয়ে গিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা বন্ধ করে দেবার জন্যে অনেক ভীতি প্রদর্শনও করেছিলেন। কিন্তু চণ্ডীপুরের পটুয়াদের মূল জীবিকা ছিল প্রতিমা নির্মাণ ও পুতুল তৈরি এবং এর থেকে দু'-পয়সা রুজি রোজগার হয় বলেই এত সব ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও এরা পরে শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে গেছেন। চৈতন্যপুর ও আকুবপুরের সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।

২৪-পরগনা জেলার আখড়াপুঞ্জি গ্রামের ছ'ঘর পটুয়ার মধ্যে তিন ঘর শুদ্ধি করে হিন্দু হয়েছেন বটে, কিন্তু সবাই দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরি করে বেহালার বাজারে বিক্রির জন্যে আনেন। পুরোপুরি হিন্দু ছাড়া যারা আগের অবস্থায় আছেন তাঁদের ঝোঁক পুরোপুরি মুসলমান হওয়ার দিকে। তাই আখড়াপুঞ্জির যিনি কামাল চিত্রকর তিনি প্রতিমা বিক্রয়ের খাতিরে বেহালাতে পরিচিত হন কমল চিত্রকর হিসেবে। এই গ্রামেই শুদ্ধি হয়ে যাওয়া এক ভাই হিন্দু অবস্থায় এবং অন্য ভাই সেই আগের মত অবস্থায় থাকাকালীন যখন বৃদ্ধ পিতা পরলোকগমন করেন, তখন দু'পক্ষের রীতিমত বিবাদ শুরু হয়—মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি নিয়ে। অবশেষে যখন রফা হয়, তখন দেখা যায় হিন্দু হয়ে যাওয়া পুত্র পিতৃদেবের মুখাগ্নির পর মৃতদেহ অন্য ভাইকে সমর্পণ করেন কবর দেওয়ার জন্যে। একজন এরই ভিত্তিতে কালীঘাটে এসে শ্রাদ্ধ-শান্তি করেন এবং অন্যজন মৌলভি ডেকে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

মেদিনীপুরের আমদাবাদের পটুয়াদের মধ্যে পরেশ চিত্রকর ও নগেন চিত্রকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দের উদ্যোগে শুদ্ধি করে হিন্দু হন। কিন্তু ঐ দুই প্রধান চিত্রকরের মৃত্যুর পর মুসলমান কাজি ও মুন্সিরা আমদাবাদের পটুয়াদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেন; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের পট আঁকা বা প্রতিমা নির্মাণ বন্ধ করে দিতে পারেনি।

বীরভূমের পাকুড়হাঁস গ্রামের বৃদ্ধ দ্বিজপদ চিত্রকর (যাঁর কাছ থেকে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় পট ও পটুয়া সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন) জানালেন যে, তাদের ছেলেরা কেউ পট আঁকায় বা এই উপজীবিকা গ্রহণে উৎসাহী নয়। আমাদের আলোচনার সময় তাঁর তরুণ পুত্র পিতার দ্বিজপদ চিত্রকর নামের পরিচয় দেওয়ায় পিতাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তোমার নাম তো আবদুল শোভান মোল্লা—তবে কেন তুমি ঐ পুরোনো নামে পরিচয় দিচ্ছো—' ইত্যাদি।

মোটামুটি এই হোল বিভিন্ন জেলায় পটুয়া সমাজের সামাজিক পরিবর্তনের একটা চিত্র। সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে তা হোল, পশ্চিমবঙ্গে মুসলীম লিগের সূচনায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরিস্থিতিতে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা খুবই প্রকটতর হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গা ইন্ধন যুগিয়েছে এই সব সাম্প্রদায়িক সমস্যার। ফলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দলনেতা ধর্মের আদর্শে পটুয়াদের দলে আনতে চেয়েছেন। ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে একদিকে এবং অন্যদিকে সুবিধে-সুযোগের লোভ দেখানো হয়েছে। কিন্তু সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় পটুয়া সমাজের এই হিন্দু হওয়া বা মুসলমান থাকা সমস্যার মূলে ধর্মীয় আদর্শের বুলি যতটা না কাজ করেছে—তার চেয়ে বেশি করেছে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাব।

প্রশস্থ ও চন্ডীপুরের পটুয়ারা হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে প্রতিমা তৈরির ব্যবসা করা লাভজনক মনে করে একেবারেই হিন্দু হয়ে গেছেন। কেশববাড়ের পটুয়ারা আর্থিক অবস্থা ফেরাতে না পারায় এবং নেশাভাং করার ফলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারেনি। তাই বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অসুবিধে দেখা দেওয়ায় শুদ্ধি হয়ে যাবার পরেও তাঁরা সেই পুরোনো সমাজে ফিরে গেছেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে সেই অর্থনৈতিক সমস্যাটি রয়েছে এর মূলে।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, যাঁরা পুরোপুরি হিন্দু হয়েছেন তাঁরা পট আকেন না বা পট দেখান না—পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করে পেট চালান। পট আঁকেন এবং পট দেখিয়ে গান করেন যাঁরা, তাঁরা মুসলমান প্রভাবের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। এঁদের মধ্যে তরুণ সম্প্রদায়রা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। বীরভূম জেলার পাকুড়হাঁস এবং মেদিনীপুর জেলার শিউড়ির পটুয়া সম্প্রদায়ের তরুণদের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তত আমার এই ধারণাই জন্মেছে। তাহলে কি, এ থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে, একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি নেই, অর্থাৎ হিন্দুর ছেলে হয়ে যেমন আমরা বহুক্ষেত্রেই আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিমুখ, অন্যদিকে পটুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে পাঁচোক্ত নামাজ পড়ায় এবং অন্যান্য মুসলমানি আচার-অনুষ্ঠানে যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে এসেছে—তারই প্রভাবে মুসলমানি আচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান হওয়ার দিকে এই ঝোঁক বেড়েছে। মনে হয়, পট আঁকা ও প্রতিমা নির্মাণের পেশা যখন এই পটুয়ারা ত্যাগ করবেন এবং উপজীবিকার ক্ষেত্রে অন্য পেশা গ্রহণ করবেন, তখন তাঁরা অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান চিত্রকর আর থাকবেন না—পুরোপুরিই মুসলমান হয়ে যাবেন।

পরিশিষ্ট-৫

চিত্রকর-পটুয়া সমাজের বিভিন্ন দাবিতে গণ-প্রতিনিধি প্রেরণ

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৬.৮.১৯৫০)

বাংলার পল্লীচিত্রকরদের দাবী

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সহিত প্রতিনিধিদের সক্ষাৎ

(স্টাফ রির্পোটার প্রদত্ত)

মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কালীঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকাস্থিত ৩০ খানি গ্রামের পল্লীচিত্রকর সম্প্রদায়ের ১৫ জন প্রতিনিধি গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী ও অনগ্রসর হিন্দুগণের বিশেষ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট উক্ত সম্প্রদায়ের বিবিধ দাবী উত্থাপন করেন।

চিত্রকর সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নোক্তরূপ দাবীসমূহ উত্থাপিত হয় ঃ—

(১) ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সামাজিক অসুবিধা দূরীকরণ আইন" নামে যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় তাঁহাদিগকেও সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকারসমূহ ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক;

(২) চিত্রকরগণের জন্য স্থানে স্থানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল ও কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য চিত্রকর ছাত্রগণকে সরকারী বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হউক;

(৩) চিত্রকরের শ্রেণী স্বভাবশিল্পী। এই কারণে তাহারা যাহাতে উন্নত প্রণালীতে প্রতিমা গঠন ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বিশেষ শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠা ও সরকারী শিল্প বিদ্যালয়সমূহে তাঁহাদিগকে সুযোগ ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হউক;

(৪) আগামী লোকগণনার সময় চিত্রকরগণকে "বর্ণ হিন্দুর" অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদার ঐসকল দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা হইবে বলিয়া চিত্রকরগণকে আশ্বাস দেন।

পরিশিষ্ট-৬

বাংলার রূপকথার পট

আমাদের গ্রাম-বাংলায় এক শ্রেণীর পটুয়া চিত্রকর ছিলেন, তাঁরা পট আঁকতেন লম্বাভাবে কাগজের উপর। তারপর সেই অঙ্কিত পটের দু'প্রান্ত কাঠিতে জড়িয়ে গুটিয়ে রাখতেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে সেই পট ধাপে ধাপে গানের সহযোগে খুলে দেখাতেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত দক্ষিণাস্বরূপ চাল-পয়সা ইত্যাদি দিয়েই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হ'ত। সেজন্য এইসব পটুয়া ধর্মীয় ও সামাজিক পট তো আঁকতেনই, তদুপরি একসময়ে রূপকথাশ্রয়ী পট অঙ্কন করে সেই কাহিনী গানের সঙ্গে যে বর্ণনা করতেন, এ বিষয়টি নিয়ে

তেমন কোন আলোচনা হয়নি। অথচ এইসব অঙ্কিত পটের মধ্যে রূপকথার কাহিনী নিয়ে সৃষ্ট এমন অনেক লোকগীতি ছিল, তা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলতে বসেছি। কিন্তু একসময়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা যাঁবা এই গাথা-গীতিকাব বিষয়বস্তু নিযে রচিত একটি পট দেখিয়ে বেড়াতেন, তা ছিল বাংলার গ্রামীণ গীতিকাব্যের এক গিরিনির্ঝর বিশেষ। আর এই বিষয়ীভূত যে উল্লেখযোগ্য পটটি সঙ্গীতসহ দেখাতেন সেটির শিরোনাম হ'ল 'মনোহর ফাঁসুড়ে র পট। এ পটের কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায়,আঠার শতকের মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার কলাইকুণ্ডু গ্রামের এক কবি শঙ্কর 'মনোহর ফাঁসুড়ের পালা' নামে যে কাব্যটি রচনা করেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

পটের সে বিষয়বস্তুটি বেশ চমকপ্রদ ও সেটি রূপকথাশ্রয়ী। কাহিনীটিব শুরু সুরদশ নামে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। পটুয়ারা তাই গাইতেন, ''সুরদশ গ্রামখানি দেখিতে সুন্দর, মনোহর ফাঁসিরা বুড়ো দেশে করে ঘর। /পঞ্চাশ ভাগিনা বুড়োর বেটা সাত, যোল নাতি, কাটিতে পরের গলা ভাবে দিনরাতি।'' গানের মধ্যে বেশ বোঝা যায়, ঐ সুরদশ গ্রামে মনোহর ফাঁসিড়া নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন এবং ঐ ফাঁসিড়া যখন তখন লোককে খুন করে সর্বস্ব অপহরণ করতেন। তার সাতটি পুত্র এবং রাহুতি নামে একটি কন্যা। মনোহর খড়ি পেতে জানতে পারতো যেসব লোকজনের আগমন হ'ত তাদের অর্থ বা ধনরত্ন কিছু আছে কিনা। এমন সময় মদন দত্ত নামে এক বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে বহুদূর থেকে এসে এক পুকুর পাড়ে বিশ্রাম করছিল। তখন মনোহর তার ছেলেদের পাঠালো মদনকে ভুলিয়ে আনার জন্য। ছেলেরা মদনকে বললো, কাছেই শ্বশুরবাড়ি তুমি এখানে কেন বসে আছো বোনাই। মদন কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু তাদের কথায় প্রলোভিত হয়ে মনোহরেব বাড়ি গেল। বাড়িতে রাত্রিতে মনোহরের মেয়ে রাহুতি একটি ছুরি নিয়ে মদনকে খুন করতে গেল। পটুয়ারা ছবি দেখানোর সঙ্গে গানের মধ্যে বলতে থাকে রাহুতির বক্তব্য, ''মনে কি করেছ তুমি শ্বশুরের ডেরা, আমার বাপের নাম মনোহর ফাঁসিরা। / মনোহর ফাঁসিরা কন্যা নাম রাহুতি কুমারী, কাটিব তোমার গলা এই দেখ ছুরি।'' কিন্তু রাহুতি তো এদিকে মদনের রূপে মুগ্ধ আর মদন জান বাঁচাবার তাগিদে নানারকম প্রলোভন দিতে ব্যস্ত। রাহুতি অবশেষে বলে, ''কর সত্য সদাগর তবে প্রত্যয় বাঁচি, কৃপা করি অভাগীরে যদি কর দাসী।'' সদাগর মদন রাহুতিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুজনে ঘোড়ায় চেপে সেই রাত্রেই পালাল। এদিকে মনোহর জানতে পেরে তার সাত ছেলেকে ধরে আনতে পাঠালো, কিন্তু ঐ সাত পুত্রই মদনের সঙ্গে লড়াই করে মারা পড়ল। অবশেষে মনোহর ফাঁসিড়াও যখন ছুটে গেল ধরে আনার জন্য, তখন সেও অবশেষে মারা পড়ল। পটুয়াদের গানে তাই শোনা যায়, ''মরিল ফাঁসিড়া বুড়া পড়িল জমিনে, তরুতলে ঘোড়া বেঁধে বসিল দুজনে।''

এর পরের কাহিনীটিও বেশ মর্মস্পর্শী। রাহুতিকে এক গাছতলায় বসিয়ে রেখে মদন এক সরোবরে স্নান করতে গেল। সেখানে এক মালিনী তাকে পান খাইয়ে যাদুমন্ত্রবলে ভেড়ায় পরিণত করলো। রাহুতি তখন অসহায় অবস্থায় স্বামীর খোঁজ সন্ধানের উদ্দেশ্যে, পুরুষের বেশ ধরে সেখানকার রাজার দরবারে এক চাকরিতে বহাল হল। রাহুতিও তার পিতার মত মন্ত্রবলে জানতে পেরেছিল তার স্বামীকে মালিনীর বাড়িতে ভেড়া করে রাখা হয়েছে। এই

সময় সেখানে এক গণ্ডারের উপদ্রব হওয়ায় পুরুষবেশী এই রাহুতি সেই গণ্ডারকে বধ করলো। সেই কারণে সেই দেশের রাজার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো রাহুতি এবং অর্ধেক রাজ্য ও কন্যা বিবাহ দিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাজা তৎপর হল। কিন্তু যুবকবেশী রাহুতি বললো যে, আমি আগে কালীপূজোয় একটা ভেড়া বলি দিয়ে তবে রাজকন্যা গ্রহণ কববো। তখন রাজার লোকেরা মালিনীর বাড়িতে রাখা মদন দত্তরূপী ভেড়াকে নিয়ে এল। সেখানে মালিনী ভীত হয়ে অবশেষে, ''ভয়েতে মালিনী মালা খুলে নিল, মালা খুলে নিতে মদন স্বরূপ হইল।'' এবার রাহুতি আনন্দাশ্রুর মধ্যে রাজাকে সব কথা খুলে বললো এই বলে, ''পুরুষ নয় আমি রাহুতি কুমারী, পুরুষ হইয়া আমি নিলাম চাকরী। /রাহুতি বলেন শুন রাজা মহাশয়, ইহার লাগি বাপ ভাই সবংশে কাটিয়া দেশান্তরী হইয়াছি ইহারে লইয়া। /ইহার জন্য যে আমি গণ্ডারে মারিয়া, তোমার কন্যা রাজত্ব দিয়ে আমায় দিলে বিয়া। /এই দুই কন্যা তুমি উহারে দিবে, তবে ত আমার মনে শান্তি জন্মাইবে।'' অবশেষে রাজা খুশি হয়ে তার কন্যা ও রাহুতিকে মদন দত্তের হাতে সম্প্রদান করলেন। পরিশেষে রাহুতির কর্মতৎপরতার জন্যই মদন দত্ত রাজার অর্ধেক রাজত্ব ও দুই পত্নী নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে লাগলো।

এই হল রাহুতি ও মদনের প্রেমকাহিনীমূলক দীর্ঘ গীতিকাব্য, যদিও সবটা উল্লেখ করা এই ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। একদা গ্রাম্য পটুয়ারা এই বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা পট দেখিয়ে এই দীর্ঘ গীতিকাটি সুরেলা কণ্ঠে গ্রামগঞ্জে পরিবেশন করতেন, যা ছিল একান্তই গ্রামের মানুষের কাছে চিত্তাকর্ষক। মা ঠাকুরমা দিদিমার কাছে যেমন শিশুরা রূপকথার গল্প আগ্রহভরে শুনতেন, তেমনি এই পটের ছবি ও গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে সেই রূপকথা বলার মেজাজটি ফুটে উঠতো। কিন্তু দুঃখের কথা, আজ এ গানটিও ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। যদিও পটুয়াদের কেউ কেউ এ গান গায়, তাহলেও দীর্ঘ গানটি আর তাদের স্মরণে না থাকায়, সামান্য অংশ তারা গেয়ে থাকেন। এ বিষয়ে আঁকা পটগুলিও ক্রমশ বিলীন হয়ে গেছে এবং এখন যাও বা দু'একটি দেখা যায়, সেগুলির অঙ্কন প্রণালীর মধ্যে কোন মুন্সিয়ানা নেই, কোনরকম দায়সারা গোছের সে চিত্রগুলি। সে দিক থেকে রাহুতি ও মদনের এই প্রেম ও সংগ্রামের কাহিনীটি একদা জনসমাজে লোকগীতিকা হিসাবে যথেষ্ট আদৃত ছিল। কিন্তু কালের ধারায় তা আজ ক্রমশ অস্পষ্ট এবং পট বিষয়ক গবেষকরাও এ বিষয় উদাসীন বললেই চলে।

রূপকথা বিষয়ক মনোহর ফাঁসিড়ার এই পট ছাড়াও বহু পূর্বে পটুয়ারা আরও যে অনেক কিংবদন্তিমূলক এবং উপকথা আখ্যানমূলক পট আঁকতেন এবং সেগুলি যথারীতি গেয়ে বেড়াতেন তারও এক প্রমাণ পাওয়া যায়, বিলেতের ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এমন একটি উপকথামূলক আখ্যানযুক্ত পটের সংগ্রহ দেখে। উনিশ শতকে অঙ্কিত সে জড়ানো পটের আকার ও রীতিপ্রকৃতি পুঁথির পাতার চিত্র অনুসারী। সে পটের সবটা দেখার সুযোগ অবশ্য মেলেনি তবে যেটুকু দেখা গেছে তার এক অংশের ছবিতে অঙ্কিত হয়েছে চার বেহারার পাল্কিতে চলেছেন সম্ভবত এক রাজকন্যা। পাল্কির ঠিক নিচে অগ্রসরমান একটি কুকুর। পরের দৃশ্যে দেখা যায়, পালঙ্কে ঘুমন্ত এক রাজকন্যা এবং তার পাহারায় রয়েছে পা এবং মাথার দিকে প্রহরারত দুটি বৃহৎ বাঘ ও দুটি উদ্যত ফণাসহ সাপ। এ যেন সেই

রূপকথার জীয়নকাঠি-মরণকাঠি গল্পের মত। বেশ বোঝা যায়, এ চিত্রটিও ছিল সে সময় কোন আখ্যানমূলক পটচিত্র, যার হাল হদিস আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেজন্য বলা যায়, পট ও পটুয়া নিয়ে আজ যে গবেষণা চলছে, তা ওপর ওপরে ভাসাভাসা, গভীরে যাওয়ার কোন চেষ্টা নেই। ফলে এই ভাবেই আমাদের অবহেলা ও অনাদরের জন্যই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এই পটুয়া লোকচিত্র ও লোকসঙ্গীত ধীরে ধীরে ক্রমশ হারিয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও হারিয়ে যাবার পথে।

পরিশিষ্ট-৭

বাংলার চিত্রশিল্প ঃ চিত্রিত পুঁথির পাটার শিল্পী সন্ধানে

বাংলায় ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে ছিল হাতে-লেখা পুঁথির চলন। গ্রামীণ সমাজে এসব পুঁথির সংগ্রহ সে সময়ে ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। তাই হাতে নকল করা পুঁথি হলেও যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। অর্থবানরা ভাল নকলনবিশদের দিয়ে শুধু পুঁথি নকলই করাতেন না, ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য পুঁথির আয়তন অনুযায়ী দু'পিঠে কাঠের তক্তার মলাটও লাগাতেন। এর ফলে পুঁথির পাতায় যেমন ভাঁজ ধরত না, তেমনি বিভিন্ন পুঁথিকে স্বতন্ত্রভাবে খুঁজে নেওয়াও সহজ হত। বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাযুক্ত পুঁথিগুলির প্রতি অনুরাগবশত কাঠের মলাটে উৎকীর্ণ করা হত আকর্ষণীয় রঙিন চিত্র। এক্ষেত্রে মলাট চিত্রণের জন্য ডাক পড়ত স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের। তাঁরা তাঁদের মুন্সিয়ানা অনুযায়ী সেসব কাঠের মলাট চিত্র-বিচিত্রিত ক'রে দিতেন। মনোরম সেসব মলাট অতঃপর পুঁথির দু'পিঠে লাগিয়ে সংরক্ষিত হত খেরো কাপড়ের বাণ্ডিলে, আজ আমাদের কাছে যা চিত্রিত পুঁথির পাটা হিসেবে পরিচিত।

ছাপাখানা চালু হওয়ার পর বটতলার ছাপা নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ ও জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-লেখা এসব পুঁথির কদর কমতে থাকে। পরে, অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, পুঁথির মালিকরা এসব হাতে-লেখা গ্রন্থগুলিকে অপ্রয়োজনীয় মনে ক'রে গুদামজাত ক'রে রাখেন। অনেকে কীটদষ্ট পুঁথিগুলিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাদের কর্তব্য সমাধা করেন। পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন মনীষী ও উৎসাহীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এইসব পরিত্যাজ্য পুঁথিগুলি উদ্ধার ক'রে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে যেসব পুঁথিতে চিত্রিত পাটা যুক্ত ছিল, সেগুলি চলে আসে চিত্রকলাবিষয়ক সংগ্রহশালায় এবং অবশিষ্ট পুঁথিগুলি স্থান পায় এই ধরনের পুঁথির সংগ্রহশালায়। যেসব পুঁথির পুষ্পিকায় (অর্থাৎ, ইংরেজিতে যাকে 'কলোফোন' বলা হয়) পুঁথি নকলের তারিখ উল্লিখিত ছিল, সেই তারিখই অনেক সময় পুঁথির পাটা চিত্রণেরও তারিখ বলে ধরা হয়েছে। আবার অনেকক্ষেত্রে আসল পুঁথি থেকে পাটাচিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চিত্রশৈলীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলির অনুমানভিত্তিক তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে। এইভাবেই দেখা যায়, বাংলার প্রথাগত চিত্রশিল্পের পরিচায়ক এইসব পুঁথির চিত্রিত পাটার বেশ কিছু নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালা, গুরুসদয়

মিউজিয়াম, বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বীরভূম-শান্তিনিকেতনের কলাভবন, হাওড়ার আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা এবং ঝিখিরার কেরানি-রায় পরিবারের সংগ্রহ ও মেদিনীপুরের রামগড় রাজার সংগ্রহে।

বাংলায় পুঁথির পাটাচিত্রণের রেওয়াজ চলে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে দেখা যাচ্ছে মহীপাল দেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে অঙ্কিত (৯৮৬ খ্রিঃ) 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথির মলাট দু'টিই চিত্রিত, যা বাংলার প্রাচীনতম পাটাচিত্রের নিদর্শন। এখানে রেখা ও রঙের ব্যবহারে যে মার্গরীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তা গুপ্তযুগের অজন্তা ও বাঘ গুহাচিত্রের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য পালযুগে এই ধরনেব চিত্রশোভিত আরও যেসব পাটাচিত্র পাওয়া গেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী তাঁর 'পালযুগের চিত্রকলা' গ্রন্থে।

পাল রাজবংশের পতন ও ইসলাম বিজয়ের পর পুঁথি নকলের প্রচেষ্টা থাকলেও, সম্ভবত পুঁথির পাটায় চিত্রসজ্জার রেওয়াজ কমে যেতে থাকে। পরবর্তী পুঁথিব চিত্রিত পাটার নিদর্শন পাওয়া গেছে বিষ্ণুপুর থেকে, যা খ্রিষ্টীয় পনের শতকের একেবারে শেষদিকে তালপাতায় লেখা 'বিষ্ণুপুরাণ' পুঁথির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ পুঁথির পাটায় অঙ্কিত ছিল দশাবতারের বেশ কয়েকটি মূর্তি, যার অঙ্কনশৈলী সম্পর্কে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে, এটি মধ্যযুগীয় চিত্রকলার পূর্বভারতীয় ঘরানার অন্তর্ভুক্ত বিহার থেকে প্রাপ্ত পনের শতকের 'কারণ্ডব্যূহ' পুঁথির পাটার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত। ঠিক এইসময়েই বা পরবর্তী শতকে চিত্রিত 'গোষ্ঠলীলা' সংক্রান্ত এক পুঁথির পাটা পাওয়া গেছে মেদিনীপুর থেকে, যার মধ্যে বাংলার শেষ মধ্যযুগীয় চিত্রকলার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আঠার শতকের প্রথম থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে অঙ্কিত এমন বেশ কিছু পাটাচিত্র পাওয়া গেছে বিষ্ণুপুর থেকে। এছাড়া আঠার শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে চিত্রিত (মেদিনীপুরের রামগড় রাজার সংগ্রহে রক্ষিত পাটাচিত্রগুলি, ১২০৫, ১২২৫, ১২৫৭, ১২৫৮, ১২৮৫ ও ১২৮৬ বঙ্গাব্দে অনুলিপিকৃত পুঁথির সঙ্গে যুক্ত) বেশ কয়েকটি পাটাচিত্র পাওয়া গেছে বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম ও মেদিনীপুর থেকে। বিষয়বস্তু সাধারণত রাম, কৃষ্ণ, শিব ও চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। এছাড়া দু'একটি পাটাচিত্রে বৈষ্ণবভক্ত হিসাবে স্থানীয় শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীদেরও চিত্রিত করা হয়েছে। এযাবৎ সংগৃহীত সমস্ত পাটাচিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব না হলেও পুর্বোল্লিখিত সংগ্রহশালাগুলিতে এসব নিদর্শন সহজেই দেখা যেতে পারে। সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যায়, বাংলায় পুঁথির আবরণ হিসাবে পাটাচিত্রণের ধারাবাহিকতা ইসলাম বিজয়ের পর কিছুটা ছিন্ন হলেও পরবর্তী পনের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত অটুট ছিল।

পুঁথির এসব পাটা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে পাতলা কাঠের উপর সরাসরি চুনের প্রলেপে পাতলা সাদা রঙের আস্তর দিয়ে প্রথমে জমিটি তৈরি ক'রে নেওয়া হয়েছে। তারপর পরিকল্পিত ছবিটি প্রয়োজনমাফিক নানান উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত কবা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে আদ্রতার দরুন কাঠের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে ছবির ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনায় শিল্পীরা কাঠের মলাটের উপর

মোটা ধরনের কাপড় দিয়ে তার উপর ছবি এঁকেছেন। এই পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর অঙ্কনের প্রয়োগকৌশল আজও আমরা গ্রামাঞ্চলে কাঠের রথের গায়ে দেখে থাকি।

বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এযাবৎ সংগৃহীত এসব বিচিত্র পুঁথির পাটায় অঙ্কিত চিত্রগুলির কলাকৌশল ও শৈলী যে একই রীতির নয়, তা বলাই বাহুল্য। আশুতোষ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত বেশ কিছু পাটাচিত্রের সঙ্গে রাজস্থানী এবং পাহাড়ি, বিশেষ ক'রে বুঁদি ও মেবার অঞ্চলের চিত্রশৈলীর বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত এমন কেটি পাটাচিত্রে 'গোপিনীদের খাটো চোলি, বর্ণাঢ্য ঘাঘরা ও স্বচ্ছ ওড়না পরা বেশভূষায়, গাছপালা, ফুল-লতাপাতার বিন্যাসে, রাধাকৃষ্ণ ও গোপিনীদের মুখের ডৌলে, বর্ণানুলেপনে ও সামগ্রিক শিল্পরীতিতে এই সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্ণীয়।' অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং রাজস্থানের জয়পুর মিউজিয়ামের তদানিন্তন অধিকর্তা ড. অশোককুমার দাস উভয়েই এইসব পাটা রাজস্থানি শিল্পশৈলীর অনুসরণে আঁকা বলে মনে করেন।

সুতরাং এ প্রভাবের মূলে হতে পারে, ষোল শতকের শেষদিকে মোগল সেনাপতি মানসিংহের বাংলা-বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার সুবাদে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাজস্থানের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্রতা। অন্যদিকে বাংলা ও রাজস্থানি সংস্কৃতির যোগসূত্রের আর এক সম্ভাব্য কারণ হল, একদা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের টানে রাজস্থান থেকে জৈন ধর্মাবলম্বী বেশ কিছু শ্রেষ্ঠী মুর্শিদাবাদে বসবাস করার ফলে সেখানকার শিল্প-সংস্কৃতিও যে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আমদানি হয়, তা নিশ্চিত এবং বিষয়টি যে শুধুমাত্র অনুমানভিত্তিক নয়, তারও লিখিত প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত এমন একটি মুর্শিদাবাদি ঘরানার চিত্রে বিদেশি সেই শিল্পীর নামের সঙ্গে খোদাই করা রয়েছে তার পূর্বতন নিবাসের সঙ্গে বর্তমান ঠিকানা। যথা—'সাং জয়পুর হাল সাং বালুচর, জেলা মুর্শিদাবাদ।'

অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানার অন্তর্গত রামগড় গ্রামে রামগড় রাজবাড়িতে রক্ষিত বেশ কয়েকটি পুঁথির পাটায় বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে প্রখ্যাত লোকচিত্রকলাবিদ্ প্রয়াত সুধাংশু কুমার রায় মন্তব্য করেছেন যে, গুজরাট থেকে আগত এখানকার রাজবাড়ির পূর্বপুরুষ বৈষ্ণবসাধক প্রভু শ্যামানন্দের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে কালক্রমে কার্ষ্ণেয়-চৈতন্য বাঙ্গালা-গুজরাটি আর্টের জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, "গুজরাটি বা প্রাদেশিক রাজস্থানী চিত্রকলার প্রভাব এখানে ক্রিয়াশীল হওয়ায় 'রামগড় স্কুলে'র পুঁথির পাটার আর্টের রহস্যময় সৃষ্টি বাংলায় সম্ভব হয়েছিল।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাজস্থানি শৈলী প্রভাবিত এইসব পাটাচিত্রের অধিকাংশই পাওয়া গেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকা থেকে। অতএব অনুমান করা যায় যে এই ধরনের আঙ্গিকে আঁকা পাটাচিত্রের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে উঠেছিল তদনীন্তন শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র ক'রে। এ অনুমান কিন্তু একেবারেই বৃথা নয়।

আমরা যদি সতের শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ভাস্কর্যশৈলী অনুধাবন করি, তাহলে বিষয়বটি স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে। সেখানে মন্দিরে উৎকীর্ণ 'টেরাকোটা'-ফলকের মেটিফগুলির মধ্যেও দেখা যায় মোগল ও রাজস্থানি চিত্রকলার যথেষ্ট প্রভাব। মনে হয় ঐসব ঘরানার ছবির আদলে যেন নতোন্নত পদ্ধতিতে এখানে খোদাই কাজ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন যে, আমাদের ঐ ছবিতে ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে মোগল রাজপুত সংস্কৃতির প্রভাব কি তাহলে এইভাবেই যথানিয়মে পড়েছে এবং যদি পড়েই থাকে, তাহলে তার ধরন-ধারণ ঠিক কী রকমের? যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐসব এলাকার বিদেশাগত শিল্পীদের দ্বারাই ঐ শৈলী প্রভাবিত ছবিগুলি অঙ্কিত, তাহলে বাংলার প্রথাগত অঙ্কনশিল্পের ধারাবাহিকতাকেই অস্বীকার করা হয়। পরিবর্তে, যদি ভাবা যায় যে এসব পুঁথির পাটাচিত্র বা মন্দির-ভাস্কর্যের শিল্পীরা ছিলেন একান্তই দেশীয় শিল্পী, তাহলে কিন্তু বাংলার আবহমান কালের প্রথাগত শিল্প ও শিল্পীর প্রতি সুবিচারই করা হবে। এদেশিয় শিল্পীরা বিদেশাগতদের ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কৃতিকে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র, যা কিনা মোগল-রাজস্থানি প্রভাবের ফল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। এবিষয়ে আরও একটি স্বচ্ছ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মন্দির-'টেরাকোটা'য় রূপায়িত ইউরোপিয় সাহেবদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত ফলকগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে, এদেশিয় শিল্পীরা ও তাদের কাজে বহিরাগতদের সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের (বিষ্ণুপুর) পরিচিতি পুস্তকে যথার্থই বলা হয়েছে, ".... কিন্তু এ অঞ্চলের চিত্রশিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে বহিরাগত যে-প্রভাবই পড়ুক না, একটি আঞ্চলিক লোকশৈলী সব অবস্থাতেই এখানে চিত্রশিল্পে আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে, কখনও সুস্পষ্ট আবার কখনও বা অস্পষ্টভাবে।"

রাজস্থানি চিত্রশৈলী অনুসারী ঘরানার এইসব পাটাচিত্র ছাড়া পাটাচিত্রের আর এক শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে সেগুলি আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গিতে ওড়িশা চিত্রধারার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যযুক্ত। অবশ্য এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পের মধ্যে ওড়িশা ও বাংলার লৌকিক চিত্রধারাটি সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব চিত্রশৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ওড়িশার পূর্বতন এলাকা একসময়ে বাংলায় যে প্রর্যন্ত বিস্তিত ছিল, বর্তমান ঘরানা সেই এলাকাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠায় ঐ সব পাটাচিত্রে ওড়িশা শৈলীর প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। ওড়িশা চিত্রশৈলীর প্রভাব পড়লেও এ হল বাংলারই আঞ্চলিক এক নিজস্ব ঘরানা, যেমনটি আমরা বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ওড়িশা স্থাপত্য-অনুসারী শিখর ও পীঢ়া-দেউলের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। অর্থাৎ, ওড়িশা-মন্দিরশৈলী প্রভাবিত শিকরমন্দিরগুলির স্থাপত্য এ জেলায় এমনই এক সরলীকৃত রূপে এসে পৌঁছেছে, যা বাংলার নিজস্ব চালারীতির মন্দিরের মতই স্বতন্ত্র এক আঞ্চলিক শৈলীর নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে।

পরবর্তী আরও যে-ধারায় পাটাচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেসবই যে খাঁটি বাংলার প্রথাগত লৌকিক পটচিত্র ধারার অনুসারী, তা নিশ্চিত। ঐসব পাটার অঙ্কনশৈলী, রঙের বিন্যাস ও সুডৌল মূর্তির লীলায়িত ভঙ্গি প্রভৃতি দেখলে স্পষ্টই তা বোঝা যায়।

বাংলার পাটাচিত্রের এসব ঘরানার শ্রেণীবিন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্গশিল্প চর্চার বদলে লোকশিল্পের ধারাটিকেই যেন বিশেষভাবে অনুসরণ ক'রে এসেছেন। বিত্তবান গৃহস্থ ও ধনবান ভূস্বামীদের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় লোকশিল্পীরা আবহমানকালের ঐতিহ্যে বংশগত পেশার অধীনে জীবিকার তাগিদে এইসব ছবি এঁকেছেন। 'তাদের সৃষ্টি করা শিল্পে রূপবিন্যাসের সঙ্গে ভাবাবেশের এমন সার্থক সম্মিলন ঘটেছে যে শিল্পতত্ত্ব বিচারে তা মহৎ সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে'।

দুঃখের কথা, বাংলাব এই প্রথাগত চিত্রশিল্পের ধারাকে যারা তাদের সুনিপুণ তুলির টানে টিকিয়ে রেখেছিলেন, তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্তত পাটাচিত্রের শিল্পীদের পরিচয় সম্পর্কে চিত্রবিদ্যার বিদ্বজ্জনেরা কেউই তেমন আলোকপাত করেননি। তবে লোকশিল্প বিশারদ সুধাংশুকুমার রায় এ সম্পর্কে যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, "....অধিকাংশ পাটাই সূত্রধরদের অঙ্কিত বলে আমি মনে করি। তবে চিত্রকরদের হাতে পড়েনি কোথাও এমন নয়। বীনপুরের পাশে ষাঁড়পুর গ্রামের বৈষ্ণববাড়ীর দু'খানা পাটা স্থানীয় যাদুপটুয়ার অঙ্কিত তাতে সন্দেহ নেই। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে পাটার আর্টের জন্য আমরা সূত্রধরদের কাছেই ঋণী, যেমন মন্দিরগঠন ও মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলির জন্যও প্রধানত তাদের কাছেই ঋণী।" সুধাংশুবাবুর অনুমান যথার্থ। একদা 'কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃত্তিকা-চিত্র'—এই চার মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টির কাজে যাঁরা একান্তই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন এই সূত্রধর শিল্পীসমাজ। বাংলার এইসব পাটাচিত্রের মূল কেন্দ্রস্থল বিষ্ণুপুরে সতের শতকের পাথর ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যসমন্বিত মন্দিরগুলির নির্মাণে যে সেখানকার সূত্রধর শিল্পীরাই নিয়োজিত ছিলেন, এমন ধারণা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়। তার কারণ বিষ্ণুপুরের এই সূত্রধর-স্থপতিরাই পরবর্তীকালে নানাস্থানে যে বহু মন্দির-দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন, তেমন লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান।

বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি গড়বেতা এলাকার সূত্রধর-সমাজ একদা কাঠখোদাইয়ের কাজেও যে তাঁদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমন উদাহরণও যথেষ্ট রয়েছে। লোকশিল্পের নিদর্শন হিসাবে এখনও তাদের তৈরি পুতুলগুলিতে বর্ণোজ্জ্বল রঙের প্রলেপ ও তুলির টান তাদের প্রথাগত চিত্রশিল্পের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আলোচ্য এই সূত্রধরসমাজ তাদের প্রচলিত শিল্পমাধ্যমগুলির মধ্যে আবহমানকালের চিত্রশিল্পের ধারাটিকে যে আজও টিকিয়ে রেখেছেন, তার প্রমাণ হল বিষ্ণুপুরের দশাবতার ও নকশ তাস এবং চৌকো পটচিত্র। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের পরিচিতি পুস্তকে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, "....বিচিত্র রঙের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়নলোভন ব্যবহার খুব কমই চোখে পড়ে। বিষ্ণুপুরের ফৌজদাররা (স্থানীয় সূত্রধর-শিল্পী) 'রামরাজা', 'দুর্গা' ইত্যাদির চৌকোপট তাঁদের নিজস্ব শৈলীতে আজও এঁকে চলেছেন, পটের প্রচলন বহুল পরিমাণে এই সেদিন পর্যন্ত মল্ল রাজধানীতে ছিল--আজও রাজাদের দুর্গাপূজায় পটের প্রচলন উল্লেখযোগ্য।" বর্ধমান জেলার সূত্রধর-শিল্পীরা চিত্রবিদ্যার দৌলতে একদা বর্ধমান থেকে পুরুলিয়ায় দেশান্তরী হয়েছিলেন

ছৌনাচের মুখোশ অঙ্কনের তাগিদে। বীরভূমের হাটসেরান্দির সূত্রধর-শিল্পীরা পটের উপর দুর্গামূর্তি অঙ্কন ক'রে বাংলার লোকচিত্রের ধারাটিকে আজও অব্যাহত রেখেছেন। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে রথের গায়ে নানাবিধ চিত্রাঙ্কনে সূত্রধর-শিল্পীরা যে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তেমন তথ্যও আছে। সূত্রধর-কৃত চিত্রশিল্পের আর এক বড় নিদর্শন হল হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার খ্রিস্টিয় আঠার শতকে নির্মিত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেসকোর ব্যবহার, যেখানে ফুললতাপাতাব নকশি অলঙ্করণের সঙ্গে নানাবিধ মূর্তি চিত্রিত। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বহড়ু গ্রামে শ্যামসুন্দরের দালান মন্দিরের দেওয়ালে অনুরূপ আর এক ফ্রেসকো শিল্পী হিসাবে নাম পাওয়া যায় 'দুর্গারাম ভাস্করেন চিত্রকরেন'। বেশ বোঝা যায়, শিল্পী পেশায় ভাস্কর হলেও চিত্রবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। এ সমস্তই স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার প্রথাগত সূত্রধর-শিল্পীদের কথা, যারা কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র এই চার মাধ্যমের কাজেই সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আলোচ্য এই সূত্রধর-শিল্পীরা যে একদা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তার এক বিবরণ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের রচনায়। তিনি লিখেছেন ঃ ''ছুতার পুরের মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে কেহ চিত্র করয়ে নির্মাণ।'' অন্যত্র খোদাইয়ের কাজে এই সম্প্রদায়ের মুন্সিয়ানা সম্পর্কে কবি লিখেছেন, ''হুদ্দরার চৌকাঠে সূত্রধর চিত্র গঠে সবপু সমান কপাট।'' প্রায় চারশো বছর আগে রচিত মুকুন্দরামের এই বর্ণনায় সে সময়ের সূত্রধর সমাজের শিল্পীজীবনটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা এক মূল্যবান সামাজিক দলিল বলেই বিবেচিত হতে পারে।

সুতরাং এইসব দিক বিবেচনা ক'রে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, পুঁথির পাটাচিত্রণের মূলে ছিলেন এদেশীয় সূত্রধর সম্প্রদায়, যাদের হাতে পড়ে মন্দির-টেরাকোটা ভাস্কর্যও মোগল-রাজস্থানি শৈলীর সদৃশ হয়ে উঠেছে। পাটাচিত্রের মধ্যে রঙ, রেখা ও উপস্থাপনার টানে যে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে, তা স্থানীয় এক একটি এলকার শিল্পগত ঘরানার বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে, যেমন আমরা মন্দির-স্থাপত্য ও মন্দির-অলংকরণ সজ্জার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন ঘরানাব পরিচয় পাই।

সুধাংশুবাবু পাটাচিত্র অঙ্কনে স্থানীয় পটুয়া শিল্পীদের অংশগ্রহণের এক সম্ভাব্য কারণ দেখিয়েছেন। কিন্তু অনুমান যে, চৈতন্যের ভক্তিবাদে সেসময় দেশ প্লাবিত হয়ে গেলেও সেকালের গ্রামজীবনে ছুঁৎমার্গতা কোনরকমেই হ্রাস পায়নি। তাই অর্ধেক-হিন্দু ও অর্ধেক-মুসলমান পটুয়া সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চজাতিভূক্ত বিত্তবান পরিবারের পক্ষে পাটাচিত্র অঙ্কনের ফরমাস দান কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা চিন্তার বিষয়।

মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তনের ফলে উনিশ শতকের পর থেকে প্রথাগত পাটাচিত্র অঙ্কনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ায় বাংলার এই লোকচিত্রটি এখন সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে।

(পট, মে, ১৯৮৬)

পরিশিষ্ট-৮

লোকচিত্রধর্মী বহুবর্ণরঞ্জিত মহিষাদল পুঁথি

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমাব অন্তর্গত মহিষাদল রাজবাড়ির একটি বহুবর্ণ চিত্রিত হাতে লেখা তুলসীদাসী রামায়ণ 'রামচরিত মানস' পুঁথি বর্তমানে শিল্প-ঐতিহাসিকদের কাছে এক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। পুঁথিটির ভাষা পশ্চিমবিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত সংস্কৃত ঘেঁষা 'অবধি'র অন্তর্গত, কিন্তু অক্ষরগুলি নাগরী হলেও সেটির ছবিগুলি যে প্রথাগত লোকচিত্রধর্মী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন ঐ পুঁথির লেখন ও চিত্রণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে, ঐ পুঁথিতে উৎকীর্ণ রঙিন চিত্রগুলি কি দেশের বঙ্গীয় শিল্পীর হাতে আঁকা, না এটি মহিষাদল রাজবাড়ির পূর্ববসতি উত্তরপ্রদেশান্তর্গত কোন এক শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো? তবে সে যাই হোক্, মেদিনীপুর জেলার বা সুদূর উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী অজ্ঞাত কোন শিল্পীব সে ছবিগুলি আঁকা হলেও, সেগুলি যে লৌকিক চিত্রকলার এক উজ্জ্বল নিদর্শন তা প্রথম দর্শনমাত্রেই উপলব্ধি করা যায়।

পুঁথির মধ্যে রূপায়িত চিত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনার পূর্বে পুঁথি প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিল্পকলা বিষয়ক সংগ্রহশালা আশুতোষ মিউজিয়ামে এই চিত্রিত পুঁথিটি সংগৃহীত হয় মুর্শিদাবাদ থেকে। ঘুরপথে সংগ্রহের ইতিহাসটি হল, পুঁথিটি রাখা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থানার এলাকাধীন রামানুজ সম্প্রদায়ের মস্তারাম আউলিয়া প্রতিষ্ঠিত সাধকবাগ বৈষ্ণব আখড়ায় এবং সেখানকার মহন্ত রামদাস আউলিয়ার মারফৎ এটি ১৯৪২ সালে আশুতোষ মিউজিয়ামের জন্য সংগ্রহ করেন সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ। উল্লেখ্য যে, এ পুঁথিটির বৈশিষ্ট্য হল প্রতি পাতায় রামায়ণ বিষয়ক চিত্রের উপর-নিচে মূল পাঠ নাগরী অক্ষরে লিখিত এবং ৩৪৩টি পৃষ্ঠাযুক্ত সাতকাণ্ড অধ্যায় বিশিষ্ট তুলসীদাসী রামায়ণ। অধ্যাপক ঘোষ সেজন্য উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বহুবর্ণ চিত্রিত রামায়ণ সংক্রান্ত এইটিই একমাত্র পুঁথি।

সেকালের হাতে লেখা পুঁথিপত্রের শেষদিকে 'পুষ্পিকা' অংশে রেওয়াজমাফিক লেখা হ'ত পুঁথির মালিকের নাম সহ পুঁথি নকলকারকের পরিচয়। সুতরাং এ পুঁথিটির পুষ্পিকা অংশে বিবৃত হয়েছে, শ্রী ইছারাম মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মহিষাদল পরগনার অন্তর্গত কমলপুর গ্রামে শ্রীমতী রানী জানকীর পঠন-পাঠনের জন্য এই রামায়ণ পুঁথিটি রচনা করেছেন। পুঁথির এই অংশে বিভিন্ন সাল তারিখে যে এক একটি কাণ্ডের অংশ নকল করা হয়েছে তারও বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে, ১১৮০ বিলায়তি সালে এটির নকল করার কাজ শুরু হয়ে ১১৮২ বিলায়তি সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ লঙ্কাকাণ্ড অধ্যায়ে শেষ করা হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় হ'ল, পুঁথির নকলনবিসের নাম উল্লিখিত হ'লেও রঙিন চিত্রগুলির চিত্রকরের নাম উহ্য থেকে গেছে। সুতরাং মনে করা যেতে পারে পুঁথির অনুলিপিকারক ইছারাম মিশ্রই হয়ত ছবিগুলি এঁকেছেন বলে চিত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি; অথবা স্থানীয় গ্রাম্য চিত্রকরদের সে সময় সামাজিক কোন মর্যাদা না

থাকায তাব নামোল্লেখে সম্মানহানিব ভযে তাব নাম উচ্চাবিত কবাব প্রযোজন হযনি, তাই সব কৃতিত্ব ইছাবাম মিশ্রেব পক্ষেই চলে গেছে।

এখন পবিষ্কাব হ'ল, মহিষাদল পবগনাব কমলপুবে বসে বানী জানকীব পঠন-পাঠনেব জন্য লিখিত এই পুঁথিব পুষ্পিকায যা উক্ত হযেছে তা থেকে চিনতে কোন অসুবিধে হযনা যে, এটি একদা মেদিনীপুব জেলাব মহিষাদলেব পূর্বতন ভূস্বামী উপাধ্যায পবিবাবেব উত্তবাধিকাবী অপুত্রক আনন্দলাল উপাধ্যাযেব বিধবা সহধর্মিণী বানী জানকীই হ'লেন পুঁথিতে উল্লিখিত সেই ধর্মপ্রাণা বমণী। যদিও কমলপুব নামে এই থানা এলাকায একটি মৌজা বর্তমান, কিন্তু পুঁথিতে উল্লিখিত কমলপুব যে বর্তমানেব গড কমলপুব মৌজাকেই নির্দেশ কবছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই গড কমলপুব মৌজাব অন্তর্ভুক্ত ছিল উপাধ্যায আমলেব পুবানো বাজবাডিটি। বানী যে একান্তই ঈশ্ববমতি ছিলেন তা এই বামাযণ পুঁথিটি ছাডাও তিনি তাঁব জমিদাবীব অন্তর্গত নন্দীগ্রাম, বামবাগ, দেউলপোতা গ্রামে মন্দিব নির্মাণ বাদেও নিজ গডবাডিতে গোপালেব সুউচ্চ নববত্ন মন্দিবটিও নির্মাণ কবেছিলেন, যা ঐসব মন্দিবেব প্রতিষ্ঠালিপিতে প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে নাম প্রকাশিত। যেহেতু তিনি ছিলেন উত্তবপ্রদেশ থেকে আগত, সেজন্য তুলসীদাসেব বচিত বামাযণপুঁথি 'বামচবিত মানস' পঠনেব জন্য বহু অর্থব্যযে এই মূল্যবান পুঁথিটি লিপিকব ও চিত্রশিল্পীকে দিযে প্রস্তুত কবিযে নেন।

এখন পুঁথিব মালিকেব যথার্থ হদিশ যখন পাওযা গেল তখন প্রশ্ন থেকে যায, পুঁথিটি মুর্শিদাবাদেব সাধকবাগ আশ্রমে কি কবে পৌঁছোলো? অধবচন্দ্র ঘটক তাঁব বচিত 'নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ কবেছেন যে, 'মুর্শিদাবাদেব সাধকবাগ আখডাব মোহান্ত ভবত দাস আউলিযাব সময খ্রীষ্টীয অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুমগুড পবগণাব কালিচবণপুব গ্রামে একটি শাখামঠ স্থাপিত হইযাছিল। ঐ সময গঙ্গাসাগবেব সাগব তীর্থক্ষেত্রটি উহাদেব অধিকাবে ছিল। মোহান্তেব শিষ্য গৌবীবাম দাস আউলিযা পৌষ সংক্রান্তিব মাসাধিক কাল পূর্ব হইতে আসিযা এই মঠে অবস্থান কবিযা গঙ্গাসাগব তীর্থে গমন কবিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইযা চৈত্রমাস পর্যন্ত এখানে থাকিতেন।' উদ্ধৃতিব এই অংশ থেকে বেশ বোঝা গেল, মহিষাদল জমিদাবিব অন্তর্ভুক্ত নন্দীগ্রাম থানাব এলাকাধীন কালিচবণপুবে একসমযে সাধকবাগ আখডাব শাখা মঠ স্থাপিত হওযাব কাবণে মহিষাদল বাজবাডিব পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ঐ মঠ কোনক্রমেই বঞ্চিত হযনি এবং সেইসূত্রে স্বভাবতই মহিষাদল বাজ পবিবাবেব সদস্যেবা এই মঠেব শিষ্যত্ব যে গ্রহণ কবেছিলেন এমন অনুমান মোটেই অমূলক নয।

বানী জানকীব মৃত্যুব পব যথাযথ ওযাবিশ না থাকায পববর্তী পর্যাযে গর্গপবিবাব মহিষাদল জমিদাবিব অধিকাব লাভ কবেন। এই পবিবাবেব সঙ্গেও যে সাধকবাগ আখডাব যোগসূত্র বজায ছিল তা একটি সংবাদে জানা যায। ঐ মঠেব প্রাচীন কাঠেব বথটি বিনষ্ট হলে মহিষাদল ভূস্বামী সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপালপ্রসাদ গর্গেব অর্থসাহায্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সাধকবাগ মঠেব রথটি পুনর্নির্মিত হয়। সুতরাং সাধকবাগ আশ্রমেব সঙ্গে পরবর্তী উত্তবাধিকাবী গর্গ পবিবাবেবও যে সম্পর্ক ছিল তা এই তথ্য থেকেই পবিস্ফুট হয। অন্যদিকে স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা গড়ে তোলায সাহায্য কবে যে, মহিষাদলের রানী-জানকীব পঠনার্থ এই বামচবিত মানস পুঁথিটি সম্ভত তাঁব মৃত্যুব পর গর্গ পরিবাবেব পক্ষ থেকে এই

মঠে প্রদত্ত হয়ে থাকবে এবং পরে এটি মুর্শিদাবাদের ঐ মঠ থেকে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়। পুঁথিটির পুষ্পিকায় মহিষাদল পরগনার কমলপুরের রানী জানকীর নাম উল্লিখিত ছিল বলেই পুঁথিটির মহিষাদল থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায় হস্তান্তরের আনুপূর্বিক ইতিহাসটি জানতে পারা গেল। নাম ঠিকানা উল্লিখিত না থাকলে পুঁথিটির আসল স্থান পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকেই যেত।

যদিও বর্তমান নিবন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়ভাবে রচিত উল্লেখযোগ্য এক লোকচিত্রের নিদর্শন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু পুঁথিটির যথাযথ স্থান থেকে অন্যত্র স্থানচ্যুত হওয়ার ইতিহাসটি ঠিকমত প্রকাশ করা না গেলে যে বিষয়টির খামতি থেকে যেত সেটি পূরণের উদ্দেশ্যেই এই ধান ভানতে শিবের গীত পর্যায়ের অবতরণিকা।

এবার পুঁথির ভিতরের পাতায় উৎকীর্ণ চিত্রগুলির আলোচনায় আসা যাক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুঁথির প্রতিটি পাতায় রামায়ণ বিষয়ক বহুবর্ণবিশিষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মোটামুটি সেসব চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল, শিব বিবাহ, ভগীরথের গঙ্গা অনয়ন, রামের হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বিবাহ, মারীচ বধ, জটায়ুর রাবণের রথ আক্রমণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, রাম সমীপে গুহক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, তাড়কা বধ, মরীচ বধ, সূর্পণখার নাসিকাছেদন, লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ, মহীরাবণবধ ইত্যাদি রামায়ণ কাহিনীর যাবতীয় রূপায়ণ, অর্থাৎ ৩৪৩ পৃষ্ঠার প্রতি পাতায় ঐ সংখ্যকেরও অধিক রঙিন চিত্রে ছয়লাপ। পুঁথির প্রতিটি পৃষ্ঠার আকার ৩০.৫ সে. মি. x ২৪.৭ সে. মি.। যদিও এটিকে আমরা হাতে লেখা পুঁথি বলে উল্লেখ করেছি, কিন্তু আসলে এটি ছিল প্রথাগত লম্বাটে ধরনের পুঁথির বদলে বর্তমানকালের চওড়া পুস্তক সদৃশ আয়তাকার। সেকালে মোগল আমলে সৃষ্ট বহুবর্ণ চিত্রিত হস্তলিখিত পুঁথির মতই ছিল এটির আকার।

পুঁথির চিত্রগুলি নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় প্রতি পাতায় বিষয়ীভূত চিত্রগুলি আগে এঁকে নিয়ে পরে শূন্যস্থানে তুলসীদাসী রামায়ণের বাখানটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া কোন কোন পাতার গোটা অংশ জুড়েই বেশ কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শিল্পী ছবির কাঠামোটি আগেই তৈরি করে নিয়ে সেটির উপর প্রার্থিত বিভিন্ন রঙের প্রলেপ দিয়েছেন, তারপর কালো রঙের সরু তুলি দিয়ে সে রঙের প্রলেপ অংশটির চতুর্দ্দিক বেষ্টনী করে ছবিটিকে যথার্থ রূপদানে সচেষ্ট হয়েছেন। পরে ছবিটিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে খয়েরি রঙের বেষ্টনী এবং সে বেষ্টনীর দুদিক জুড়েই কালো তুলির টানে সেটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। তদুপরি যে রঙের প্রয়োগ করা হয়েছে তা দেশজ পদ্ধতিতে তৈবি, যা গাছের শুকনো পাতা, ভুষোকালি ও আকরিক দ্রব্য থেকে সংগৃহীত। লক্ষ করার বিষয় ছিল যে, ছবিগুলির প্রেক্ষাপটে অন্যান্য ছবির মত অন্য কোন রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়নি; স্থানগুলি ফাঁকা থেকে গেছে। তবে চিত্রের সৌকুমার্যের খাতিরে বহু ক্ষেত্রে দৃশ্যমধ্যস্থিত ঐসব শূন্যস্থানগুলিতে নানাবিধ বৃক্ষলতা অথবা ইমারতি স্থাপত্য বিষয়ক অঙ্কন দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। ছবিগুলিতে তিনটি মূল রঙ ব্যবহৃত হয়েছে, যথা নীল, লাল ও হলুদ এবং স্থান বিশেষে শাদা কালো রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত রঙও যে প্রযুক্ত হয়নি এমন নয়। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেগুলি অধিকাংশই আঁকা হয়েছে দ্বিমাত্রিক হিসাবে এবং কখনো কখনো মুখোমুখি।

যদিও ছবিতে গ্রামীণ চিত্রকলার প্রথাগত ধারাবাহিকতার অণুসরণে শিল্পী রঙের কোন আভাযুক্ত মাত্রা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পুঁথিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির শিল্পশৈলী একেবারেই লোকচিত্র অনুসারী। আশুতোষ মিউজিয়ামের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ এই পুঁথি চিত্রগুলির শিল্পগত ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, মহিষাদল পুঁথিচিত্রগুলি যাঁরা অঙ্কন করেছেন তাঁরা মেদিনীপুরেরই স্থানীয় লোকচিত্র অঙ্কনশিল্পী এবং এঁরাই ছিলেন জেলার বর্তমানে দেশীয় পটচিত্র অঙ্কনকারীদের পূর্বসুরি। এছাড়াও তিনি মন্তব্য করেছেন, ঐ পুঁথির 'ছবিগুলির কোন কোন জায়গায় মুঘল শিল্পরীতির শেষ স্বাক্ষরেরও পবিচয় পাই কিছু কিছু।' কিন্তু তা হলেও, এ পুঁথির ছবিগুলিতে ওড়িশা চিত্র শৈলীর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। কারণ ছবিতে উৎকীর্ণ পাত্র-পাত্রীর চেহারা যেভাবে আড়াআড়ি ও মুখোমুখিভাবে আঁকা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সে মূর্তিতে যেভাবে কানের গোড়া পর্যন্ত টানাটানা চোখগুলি রূপায়িত করা হয়েছে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় ওড়িশার তালপাতায় আঁকা ছবিতে। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক ঘোষের কথায়, যেভাবে রাজকীয় স্থাপত্যের বিন্যাস ও ইমারতের শীর্ষচূড়ায় পতাকা সংস্থাপন করা হয়েছে তা ওড়িশার সমসাময়িক তালপাতায় চিত্রাঙ্কনের বিষয় ও শৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মহিষাদল পুঁথিটির চিত্রগুলি অঙ্কনকারী যে স্থানীয় শিল্পী, এ সম্পর্কে অধ্যাপক ঘোষের এই অভিমত সঠিক নয় বলেই পরবর্তী সময়ে মন্তব্য করা হয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামের পরবর্তী অধ্যক্ষ পদাধিকারী ড. নিরঞ্জন গোস্বামী কর্তৃক রচিত এক পুস্তকে। মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে এই পুঁথি সম্পর্কে 'ক্যাটালগ অফ পেনটিংস অফ দা আশুতোষ মিউজিয়াম-- ম্যানসক্রিপ্ট অফ দা রামচরিত মানস' শিরোনামে যে গ্রন্থটি (১৯৮১) প্রকাশ করা হয়েছে তাতে পুঁথির চিত্রকর সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে। ডঃ গোস্বামী মহিষাদলের এই পুঁথি চিত্রের আঁকার ভঙ্গি ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিন্যাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন খ্রিষ্টিয় পনের শতকে চিত্রিত পশ্চিমভারতীয় চিত্রকলা ঘরানার বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'হোর চন্দ্রানী' নামে একটি বহুবর্ণ চিত্রিত পুঁথির সঙ্গে, যেটি জৌনপুরে অঙ্কিত এবং মহিষাদল পুঁথির মতই 'অবধি' ভাষায় নাগরী অক্ষরে লিখিত। এক্ষেত্রে ড. গোস্বামী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, বিশিষ্ট চিত্রশিল্প-বিষয়ক পণ্ডিতবর্গের মতে, খ্রিষ্ট্রিয় পনের-ষোল শতকে জৌনপুর একসময়ে যখন ছিল এই ধরনেরই চিত্রিত পুঁথিপুস্তক রচনার এক বড় কেন্দ্র। মহিষাদল পরিবারের পূর্বতন বাসস্থান উত্তরপ্রদেশ হওয়ায় সেখানকার যোগসূত্রের দরুন জৌনপুর থেকে পুঁথিটির চিত্রণ ও লেখনের কাজ সম্ভবত করিয়ে আনা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, পনের-ষোল শতকের এই চিত্রাঙ্কন কেন্দ্র কি মহিষাদল পুঁথির সময়কাল আঠার শতকের শেষ দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল? সম্ভবত ছিল না, তিনশো বছরের এই ব্যবধান জৌনপুরের শিল্পকেন্দ্রের এই যুক্তির বিরুদ্ধেই চলে যায়। কিন্তু সে যাই হোক্, দুই শিল্পবোদ্ধাই স্বীকার করেছেন যে, পুঁথিটির অঙ্কনশৈলী লোকচিত্রাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত যে, পুঁথিটির চিত্রশৈলীতে ওড়িশার অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাব থাকলেও এটি যে স্থানীয় লোকচিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত তা অধ্যাপক ঘোষের বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না। পুঁথিটিতে বিলায়তি যে

সাল তারিখ দেওয়া আছে, তা ওড়িশাতেই প্রচলিত ছিল এবং সেদিক থেকে কাছাকাছি ওড়িশা শৈলীর চিত্রধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তেমন অনুমান করা যেতে পারে। এছাড়া একটি পৃষ্ঠাচিত্রে শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান দেবী কালীর মূর্তির সম্মুখে হনুমান প্রার্থনারত--এই দৃশ্যটির মধ্যে আমরা যতটা বঙ্গীয় ভাবধারার পরিচয় পাই, বাংলা ছাড়া অন্যত্র পুঁথি চিত্রণে এই কালীমূর্তির রূপায়ণ কি তেমনভাবে দেখা যায়?

পশ্চিমবঙ্গের মহিষাদল এলাকা একদা ওড়িশার প্রায় সন্নিকটবর্তী ছিল বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে পরস্পব দুই ঘরানার মিলন-মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত এক শৈল্পিক প্রভাব যে এতদঞ্চলের চিত্রশিল্পে প্রভাবিত হবে না এমন নয়। কেননা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরের রামগড় ও গড়বেতা এলাকায় প্রাপ্ত দেশীয় চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত বেশ কয়েকটি পুঁথির পাটাচিত্রের সঙ্গে এই মহিষাদল পুঁথি চিত্রটির রঙ, রেখা ও চিত্রাংকন ভঙ্গির বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্ণিত স্থানের রঙিন পাটাচিত্রগুলিতেও ওড়িশা চিত্রশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির গাত্রে খ্রিষ্টিয় সতর শতক থেকে উনিশ শতক অবধি যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক দেখা যায় সেগুলির খোদাই কাজে দেহভঙ্গিমা, অঙ্গসঞ্চালনের বৈশিষ্ট্য, পোশাক-পবিচ্ছদ, অন্যান্য ইমারতি স্থাপত্য ও যানবাহনের উপস্থাপনের সঙ্গে মহিষাদল পুঁথি চিত্রে অঙ্কিত পোশাক পরিচ্ছদের ধরন, রাম বা রাবণের রথের আকৃতি, ইমারতের খিলেন বিন্যাস প্রভৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ায় এ পুঁথিচিত্রটি ওড়িশার সংলগ্ন বঙ্গীয় কোন চিত্রশিল্পীর আঁকা বলেই দৃঢ়ভাবে মত পোষণ করা যায়। বেশ বোঝা যায়, আঠার শতক বা তারও পূর্বে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এই দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় কাষ্ঠ-পোষণ-মৃত্তিকা-চিত্র এই চার মাধ্যমের কাজে নিযুক্ত শিল্পীরা যে বেশ সক্রিয় ছিলেন, মহিষাদলের এই রামায়ণ পুঁথি চিত্রগুলি তারই স্বপক্ষে এক জোরালো প্রমাণ। হায়, বাংলার এমন ঐতিহ্যপূর্ণ কত শিল্প ও শিল্পীই যে আজ কালের কপোলতলে হারিয়ে গেছে কে তার খোঁজ রাখে!

পরিশিষ্ট-৯

বাংলার লোকশিল্প—কাঠের পুতুল ঃ নতুনগ্রাম থেকে কালীঘাট

কালীঘাটের মন্দিরে যাবার আগেই রাস্তার উপর পড়ে অনেক মনিহারি দোকান। ঘর গৃহস্থালির অনেক অনেক জিনিসের মধ্যে ছেলেপুলেদের রঙবেরঙের খেলনাই সেখানে আলো করে থাকে। এই আলো করা পুতুলের মধ্যেই পাওয়া যায় ছোট ছোট কাঠের পুতুল। মিশরের মামির মত দেখতে বলে শিল্পরসিকেরা কোন কালে হয়ত এর নামকরণ করেছিলেন মমি ডল, আর তাই আজ কালীঘাটের এই মনোহারী দোকানদারের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মামি পুতুল'।

এ পুতুল বিক্রি হচ্ছে কালীঘাটের দোকানে—তাই এর বাজার চলতি নাম 'কালীঘাটের পুতুল'; কিন্তু এগুলো তৈরি হচ্ছে সেই বর্ধমান জেলার একপ্রান্তে বহু দূরের সেই পূর্বস্থলীর নতুনগ্রামে। সেখানের সূত্রধর সমাজের এই কারুকৃতি আজ পাইকিরি ব্যবসাদারদের হাত

দিয়ে এসে পৌঁছচ্ছে এই চোখ ধাঁধানো শহরের আলোয়। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ আজ এইভাবে অনাদরে, অবহেলায় তার প্রথাগত ঐতিহ্যকে কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছে। শহুরে আমজের এমন দিন আসছে, যেদিন আর কালীঘাটে খুঁজে পাওয়া যাবে না এই কালীঘাটের পুতুল—যা আসতো অনেক ঘাম ঝরানো সূত্রধর শিল্পীদের রঙিন তুলির স্পর্শ পেয়ে আর সূত্রধর বউদের হাতের সোহাগ নিয়ে সেই নতুনগ্রামের পল্লী থেকে।

* * *

কালীঘাটে এসে এ পুতুল হাতে নিয়ে অনেক কথা মনে হচ্ছে। সামান্য একটা কাঠের পুতুল, কিন্তু কত শিল্পীর দু-বেলা দুমুঠো পেটের ভাত জোগাবার দায়িত্ব এঁর। আসলে এই কালীঘাটের পুতুল যা মন ভোলানোরূপে তৈরি হয় বর্ধমান জেলার নূতনগ্রামে। এখানে যেতে হলে কাটোয়া লাইনের পাটুলি বা অগ্রদ্বীপ স্টেশনে নেমে যেতে হবে। এ গ্রামে এখনও সতেরো ঘর পরিবার আছেন, তার মধ্যে চোদ্দ ঘর পরিবার এই পুতুল তৈরি করেন। বাদ বাকি পরিবার অন্য সব নানান ধরনের কাজকর্মে নিয়োজিত আছেন।

কালীঘাটের এই কাঠের পুতুলকে হয়ত এখানে এক-কালে রূপকথার গল্পের মতই রানীপুতুল বলতো। কারণ 'রাজা', এখনও তো এখানে পাওয়া যায়। আর এখানে পাওয়া যায় পেঁচা পুতুল। লক্ষ্মীর বাহন দিয়ে গৃহস্থের মঙ্গল কামনার জন্যেই হয়ত লক্ষ্মীপেঁচা পুতুলের সৃষ্টি। আর আছে নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের এবং তার ভক্তবৃন্দের বৈষ্ণবধর্মের লীলাক্ষেত্র গোটা কাটোয়া এলাকা জুড়ে, তাই তার প্রভাবে কাঠের গৌর-নিতাই পুতুল। এ সবই এখানের সূত্রধর শিল্পীরা তৈরি করেন। পাইকেরি খদ্দেররা তা শ'দরে কিনে নিয়ে চালান দেয় নবদ্বীপের পোড়ামাতলার মনিহারি দোকানে। তবে বেশির ভাগটাই চালান আসে কালীঘাটে। কেননা এখানেই তো প্রতিদিনই অনেক অনেক ভক্তের আনাগোনা; বলতে গেলে বছরের বার মাসেই যেন মেলা। তাই ঘর-গেরস্থালির জিনিসের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের খেলার পুতুল, লক্ষ্মীর মঙ্গল কামনায় সুন্দর করে তৈরি পেঁচা আর তার সঙ্গে ঠাকুরঘরে রাখার জন্যে গৌর নিতাই—এ সবই একদিন কালীঘাটের দোকান আলো করে থাকতো। আর তার সঙ্গে একদা থাকতো পট-কালীঘাটের পট। তখন চিত্রকর-পটুয়ারা এইসব পট এঁকে আনতো, কালীর ছবি থেকে শুরু করে অনেক অনেক রকমের ছবি। যুগ বদলেছে—এখন পাওয়া যায় ছাপাখানায় ছাপা কালীঘাটের পটের ছবি। তাই কালীঘাটের পটুয়াদের অন্ন গেছে; কিন্তু নতুনগ্রামের সূত্রধরদের অন্ন মারতে পারেনি। ছেলেপুলেদের খেলনা পুতুল ছাড়াও অন্য চাহিদা এসেছে; যুগের পরিবর্তনে রুচিও বদলেছে। কাঠের পুতুল শিশুদের খেলনায় নাই হোক্, গৃহস্থ বধূদের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লক্ষ্মী পেঁচা নাই থাকুক, বা ভক্তের আরাধ্য গৌর-নিতাই তার সাধনভজনের কাছাকাছি না থাকুক—বঙ্গ কৃষ্টির সমঝদারিতে আজকালের ড্রইংরুমের অবদানকে কে ছাড়ায়! পাঁচমুড়োর ঘোড়া, দরিয়াপুরের ঢোকরা কামারদের তৈরি পিতলের পুতুল আর নতুনগ্রামের তরফে কালীঘাটের কাঠের পুতুল—এ সবের সজ্জাতেই তো ঘরদোরের রুচি বিকশিত হয়। তাই রুচিবানদের কাছে তার এই চাহিদা।

আর কীই বা করবে বাংলার শিল্পীরা! তখন ছিল জমিদার আর ধনবানদের পুণ্যলাভের আশায় বায়না মত কাঠের রথ তৈরির কাজ আর সেই সঙ্গে অপরূপ সব রথের পুতুল

তৈরির কাজ ও রথের গায়ে ছবি আঁকার কাজ, বা মন্দির তৈরি বা পোড়ামাটির ভাস্কর্য বা মন্দির দরজায় কাঠ খোদাইয়ের ভাস্কর্য সৃষ্টির কাজ—এমন সব হরেক রকম অসামান্য কৃতিত্বের কাজ করে তারা দিন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন পুজো-পার্বণ থাকলেও, তার নিয়মবিধির অনেকটাই উঠে যাওয়ায় রথ তৈরি বা মন্দির গড়নের জন্যে অথবা মন্দির দ্বারে কাঠের উপর অলংকরণের জন্যে কেউ আর ডাকে না এইসব সূত্রধরদের। তাই তারা যান কোথায়? পেটের তাগিদে নতুনগ্রামের সূত্রধরদের এই কাঠের পুতুল তৈরি করতে হয়। পুরুষেরা জিওল কাঠ, ছাতিম, আমড়া, শিমুল ও শ্যাওড়া কাঠ সংগ্রহ করে আনে। টুকরো টুকরো করে পুতুলের মাপে কেটে নিয়ে বাটালি দিয়ে খোদাই করে তৈরি করে 'মামি ডল্'। যন্ত্র আর কিই বা লাগে—করাত, বাটালি, উকো এই সবই।

সূত্রধরদের বউরা তখন চিঁড়ে কুটতো, অবসর সময়ের কাজ হিসেবে পুতুলও বানাতো। এখন ধান চালের বাজার আক্রা আর সেই সঙ্গে রুটি বিস্কুটের আভিজাত্যে চিঁড়ের কদর কমেছে—অন্যদিকে ঢেঁকির বদলে চিঁড়ে কোটার মেশিন এসেছে। তাই সূত্রধর রমণীরা এখন এই কাঠের পুতুল তৈরিতেই সময় দেন বেশি। অবসর সময়ে রঙ চড়ায় এইসব কাঠের পুতুলের গায়ে। এজন্যে দেখাশোনা হেফাজত তাদেরই করতে হয় বেশি করে।

কাঠ খোদাইয়ের কাজ শেষ হলে আর কাঠটাও ভালভাবে শুকিয়ে গেলে রঙ ধরানোর পালা শুরু হয়। তেঁতুল বীচির আঠায় মেশানো হয় লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো আর মেটে রঙ। এবার পর পর পুতুলের গায়ে রঙ ধরিয়ে যাওয়া হয়। একজন হয়ত রঙ দিয়ে কাপড়ের অংশটুকু আঁকলো সব পুতুলে, আর একজন কাপড়ের পাড় করলো—চোখ আঁকলো কালো রঙ দিয়ে—এইভাবেই কাজের ভাগাভাগি করে এঁরা পুতুলে রঙ চড়ায়। এখন আবার এইসব রঙ কিনতে যেতে হয় পাটুলিবাজারে—কেমিক্যাল রঙ কিনা! কিন্তু আগে দিশি প্রথায় অনেক রঙ তৈরি করা হতো। যেমন হরতুকী, হিঙ্গুল, নীল, চকখড়ি ও ভুষোকালী। রঙ লাগানোর আগে রঙটা ভালভাবে ধরাবার জন্যে তেঁতুল বীচির কষ থেকে তৈরি প্রলেপ ধরানো হয়—যেন বার্নিশ লাগাবার কাজ আর কি। ছেলেপুলেরা খেলা করবে তো—তাই দেখতে হয় রঙ যেন ভাল হয়।

এবার পুতুল তৈরির পর ঝুড়িতে করে সাজিয়ে রাখা হয় বিক্রির জন্যে। আগে ছিল ছ'টাকা করে শ' লক্ষ্মীপ্যাঁচা—তারপর দর চড়ে গিয়ে হয় দশ টাকা, এখন আবার সেটি হয়েছে একশো টাকা। চাল ধানের দর বাড়ছে—অন্যান্য সামগ্রীর দর বাড়ছে, চড়া দরে কেমিক্যাল রঙ কিনতে হচ্ছে—তাছাড়া বাবুদের ড্রইং রাখার জন্যে বা বিদেশে চালান দেওয়ার জন্যে দর না বাড়ালে চলবে কি করে নতুনগ্রামের শিল্পীদের?

তবু চলে না আর পুতুল বিক্রিতে। তাই নতুনগ্রামের সূত্রধর শিল্পী গরুর গাড়ির চাকা তৈরি করছেন দরজা-জানালা প্রস্তুত করছেন আর পর্বে পর্বে প্রতিমা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু শিল্পীদের জীবন ও প্রতিভা তো নষ্ট হবার নয়। তাঁদের বংশানুক্রমিক রক্তের ধারায় সেই শিল্প প্রেরণা ঠিকই বয়ে চলেছে, তাই নিখিল ভারত হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট্‌স বোর্ডের উৎসাহে এখানে নতুনগ্রামের সূত্রধর সমাজ দেখিয়ে দিলেন কাঠের উপর রিলিফের

খোদাই কাজ করে, রাম, রাবণ, নৃসিংহ—প্রথাগত শিল্প ধারার মূর্তি তৈরি করে; এখানেরই শম্ভু সূত্রধর রাবণের কাঠখোদাই মূর্তি তৈরি করে জাতীয় পুরস্কার লাভ করল সসম্মানে। এখন তাই সূত্রধর পদবী বদল করে গ্রহণ করেছেন তিনি ভাস্কর উপাধি।

আজকের নতুনগ্রামের পুতুল আর তার কাঠ খোদাই অপরূপ মূর্তি-ভাস্কর্য দেখে মনে পড়ে বর্ধমান জেলার সূত্রধর শিল্পীদের সেই ঐতিহ্যবাহী দারু তক্ষণ শিল্পের কথা, যার অনেক স্মৃতিচিহ্নই আজ মিউজিয়ামের বদ্ধ খুপরির মধ্যে রয়েছে। সেইসব কাঠের কপাটের ভাস্কর্যে আর চন্ডীমন্ডপের খুঁটিতে ও রেলিংয়ের ভাস্কর্যেই এই সূত্রধর সমাজ যেন একালের বিশ্বকর্মার পরিচয় রেখে গেছেন। আরও তার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের কাঠের মূর্তি তৈরিতে। কাটোয়া-নবদ্বীপ অঞ্চলে বহু শ্রীপাঠে ও বহু গ্রাম গ্রামান্তরের মন্দিরে বিরাজিত এইসব দারু মূর্তির মধ্যেও সেকালের সূত্রধর সমাজের শিল্প নৈপুণ্যের স্পর্শ রয়েছে। আজ সেই পৃষ্ঠপোষকতা নেই, তাই এদের অনবদ্য কাজের নমুনাও হারিয়ে গেছে।

সুতরাং দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পল্লীবাংলার শিল্প-মানসে সূত্রধর সমাজের অবদান যে কত ব্যাপৃত ছিল তার অবশেষ আজও রয়েছে নতুনগ্রামের সূত্রধর সমাজের মধ্যে তাদের তৈরি কাঠের পুতুল, লক্ষ্মী পেঁচা আর গৌর-নিতাই পুতুলের মধ্যে, যা বাংলার একান্তই লোকশিল্পের সামগ্রী হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনাকে মহত্তর করে তুলেছে।

(পশ্চিমবঙ্গ ১.৩.১৯৭৩)

পরিশিষ্ট-১০

মাটির পুতুল তৈরির পদ্ধতি

১. হাতে টেপা পুতুল

পুতুল তৈরির উপযোগী কাঁচামাটির তাল থেকে, যে পুতুলটি তৈরি করা হবে সেটি তৈরিতে যে কাদামাটি লাগবে সেই প্রয়োজনমত কাদা নিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে টিপে পুতুল শিল্পী তার মুন্সিয়ানামত সেটিকে যথাযথ রূপদান করে। সাধারণত এই পুতুলগুলি নিরেট ধরনের হয়ে থাকে এবং শিল্পীর রূপসৃষ্টির দক্ষতা অনুযায়ী নির্মিত সে পুতুলগুলি স্ব স্ব আকৃতি গ্রহণ করে।

২. ছাঁচে তোলা পুতুল

ক. ছাঁচ তৈরি

প্রথম হ'ল ছাঁচ তৈরি। শিল্পী প্রথমেই তার প্রার্থিত পুতুলটি তৈরি করে নেন নিরেট ভাবে। এবার সেটিকে শুকিয়ে বা পুড়িয়ে নেবার পর (যদি গোলাকার ধরনের পুতুল হয় তবে) সেই পুতুলের সামনের দিকের অংশে একটা কাদা মাটির মোটা প্রলেপ লাগিয়ে ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। এরপর পরবর্তী পিছনের অংশের জন্য ঐভাবে ছাঁচ তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এখন ছাঁচ তোলার পর ছাঁচের এই দুই অংশটির মধ্যে যে অনাবশ্যক অংশ থাকে তা বাঁশের চাঁচারি

দিয়ে চেঁছে তা সমান করে নেওয়া হয়, যাতে ঐ দুখোল অংশ বিশেষ পরস্পরের জোড়া লাগে। ছাঁচ তৈরি হলে যথাযথভাবে পুড়িয়ে নেওয়া হয় তার স্থায়িত্বের জন্য।

খ. ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরি

এবার ছাঁচে তোলা পুতুলের গড়নে, প্রথমে নরম কাদা যাতে ফাট ধরবে না এমন ধরনের মাটি সংগ্রহপূর্বক সেটিকে কাদা করে নিয়ে, সেই মাটির পরিমাণমত অংশ রুটি বেলার মত মাটির রুটি তৈরি করে নেওয়া হয়। এবার ছাঁচের উপর মিহি বালির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে ছাঁচে তোলার পর সেটি জড়িয়ে না যেয়ে ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা। এবার দু'খোল পুতুলের বেলায় তৈরি ঐ মাটির রুটিটিকে ছাঁচের এক খোল গর্তের মধ্যে ফেলে আঙুলের চাপ দিয়ে ছাঁচের অবয়বের সঙ্গে এক করে ফেলতে হয়, যাতে কোন ফাঁক না থেকে যায়। এর পর ছাঁচের গা বেয়ে মাটির যে অনাবশ্যক অংশ বেরিয়ে থাকে তা বাঁশের চাঁচারি দিয়ে চেঁছে সমান করে নেওয়া হয়। এরপর ছাঁচ থেকে বের করা দু'খোল অংশ সামান্য শুকিয়ে গেলে দুটিকে জুড়ে দেওয়া হয় সামান্য জল লাগিয়ে। সবশেষে নিচের দিকের অংশ ফাঁক থাকার জন্য সামান্য মাটির রুটি দিয়ে সেই ফাঁকা অংশটিতে জুড়ে দেওয়া হয়—এই হ'ল দু'খোল ছাঁচে তৈরি পুতুল গড়নের কারিগরি।

অন্যদিকে ফলক ধরনের পুতুল তৈরিতে দুখোল ছাঁচ লাগে না, একটি ছাঁচই যথেষ্ট। এবার ছাঁচে মিহি বালি ছড়িয়ে কাদা ভরাট করে তুলে নিলেই হ'ল। অধিকাংশ সময়ে ফলক ধরনের পুতুলে রুটির মত মাটির পাতলা অংশ দেওয়া হয় না। সোজাসুজি কাদামাটি ছাঁচে প্রয়োগ করে ফলক ধরনের পুতুল তৈরি করে নেওয়া হয়।

এবার খড়কুড়ো বা শুকনো পাতা দিয়ে শিল্পীরা তাদের তৈরি ছোট ভাটিতে, তৈরি করা শুকনো পুতুলগুলি পুড়িয়ে নেয়। কুম্ভকার যে পুতুলগুলি তৈরি করেন, সেটি তাদের অন্যান্য মৃৎপাত্র ভাটিতে পোড়ানোর সময় তৈরি করা সে পুতুলগুলিকে ঐ সঙ্গে পুড়িয়ে নেয়।

সবশেষে প্রয়োজনমত রঙ লাগাবার পালা।

পরিশিষ্ট-১১

মজিলপুরের (জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা) মৃৎশিল্পীদের কৃত পুতুলের তালিকা

মাঝারি ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি আকারের পুতুল

১. কৃষ্ণ	৬. গণেশ জননী	১১. সাহেব
২. রাধা	৭. কলিকাতার বাবু	১২. পর্তুগীজ মেমসাহেব
৩. বলরাম	৮. আহ্লাদী (বড়াই)	১৩. গয়লানি
৪. নারায়ণ	৯. নন্দী	১৪. পরী
৫. গণেশ	১০. ভৃঙ্গী	১৫. খোকা

১৬. সুবল
১৭. যশোদা
১৮. বিড়াল
১৯. সরস্বতী
২০. শিব
২১. জগন্নাথ
২২. বলরাম
২৩. সুভদ্রা
২৪. রাধাকৃষ্ণ (যুগল)
২৫. দক্ষিণ রায়
২৬. নারায়ণী
২৭. কালী
২৮. হাতি
২৯. গরু
৩০. সিংহ
৩১. খরগোস
৩২. টিয়াপাখি
৩৩. কাকাতুয়া
৩৪. বুলবুলি
৩৫. হাঁস

ছোট ৪ ইঞ্চি আকারের পুতুল

৩৬. রাধা
৩৭. কৃষ্ণ
৩৮. বেনে
৩৯. বেনে বৌ
৪০. দক্ষিণ রায়
৪১. নারায়ণী
৪২. গয়লানি
৪৩. মেম
৪৪. জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা
৪৫. লক্ষ্মী
৪৬. উড়ন্ত পরী
৪৭. বিষ্ণু

বড় ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি আকারের পুতুল

৪৮. কৃষ্ণ রাধা (যুগল)
৪৯. কৃষ্ণকালী
৫০. কালীয়দমন
৫১. জগদ্ধাত্রী
৫২. গয়লানি
৫৩. গণেশ জননী
৫৪. ভাল্লুক
৫৫. ঘোড়ায় চড়া বিবি
৫৬. মাতাল
৫৭. বিষ্ণুপ্রিয়া
৫৮. গৌরাঙ্গ
৫৯. জগন্নাথ
৬০. পরী ব্রাকেট
৬১. রাধাকৃষ্ণ ব্রাকেট
৬২. ঘোড়া
৬৩. গোপাল
৬৪. গাইবাছুর

পরিশিষ্ট-১২

মৃৎশিল্পের রঙ 'বনক' ঃ উপকরণ ও পদ্ধতি

বাংলার শিল্পী-কারিগর সমাজ তাদের শিল্পবস্তুকে মনোরম ক'রে তোলার জন্য প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রস্তুত বিভিন্ন রঙের প্রলেপ লাগাতেন। আবহমানকাল ধরে সেই সব রঙ প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদ থেকে আহরণ ক'রে তারা ব্যবহার করেছেন এবং স্বভাবতই তার প্রস্তুতপ্রণালী ছিল খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। রাসায়নিক রঙ আমদানির সঙ্গে সঙ্গে দেশি প্রথায় রঙ তৈরির কলাকৌশল আজ বহু ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হ'লেও এখনও বেশ কিছু শিল্পী-কারিগর প্রাচীন পদ্ধতির সে রঙ ব্যবহার ক'রে থাকেন। প্রস্তুতপ্রণালীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীসমাজের ঘরানা ও গোষ্ঠীর পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

তবে দেশজ এসব রঙই যে পাকা হবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না, যথাযথ প্রয়োজন এবং শিল্পবস্তুর তারতম্য অনুযায়ী রঙ কাঁচা বা পাকা করা হতো। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ

করা যায় আমাদের দেশের পটুয়া শিল্পীসমাজ, যারা পট আঁকেন, পুতুল তৈরি করেন, তাঁরা যে-সব দেশজ রঙ ব্যবহার করেন তা মোটেই পাকা রঙ নয়। অন্যদিকে সূত্রধর সমাজ রথের গায়ে বা দশাবতার তাসে যে চিত্রাঙ্কণ করতেন, তার রঙ পাকা হ'লেও অন্যান্য মাটি বা কাঠের পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে কাঁচা রঙ ব্যবহার করতেন। আমাদের দেশের আর এক কারিগর বাইতি সম্প্রদায়, যাঁরা একসময় মাদুর বোনার দক্ষ শিল্পী ছিলেন, তাঁরা মাদুরকাঠি যে গোলাপি রঙে ছুপিয়ে নিতেন, তা পাওয়া যেত 'রাঙ্' নামক এক ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ থেকে। কীভাবে 'রাঙ্' গাছ থেকে নিষ্কাশন ক'রে তা পাওয়া যেত, তার কারিগরি বর্তমানে জানা না গেলেও মাদুরকাঠির সে রঙ ছিল বেশ টেঁকসই।

তবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের শিল্পবস্তুতে প্রধানত পাকা রঙ ব্যবহার ক'রে আসছেন দেশের কুম্ভকার সম্প্রদায়। এঁদের কাজে যে লাল রঙের ব্যবহার দেখা যায়, তা কিন্তু আসলে একধরনেব হলদে মেটে রঙ, যা পোড়ানোর পর রূপান্তরিত হয় পাকা রঙে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে বালির গুঁড়ো থেকে প্রাপ্ত 'সিলিকা' ও লোহার একত্র মিশ্রণে তৈরি এই রঙ পোড়ানোর পর লালচে হয়ে যায়। আবহমানকাল থেকে তারা এই দেশজ রঙটি যেভাবে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করেন, তার পদ্ধতিও বড় বিচিত্র।

প্রথমত কুম্ভকার কারিগররা মাটির হাঁড়ি-কলসি তৈরি শেষ ক'রে সামান্য শুকিয়ে নেওয়ার পর সেগুলির উপরের অংশে একধরনের হলুদ বর্ণের প্রলেপ দেন, যা বনক নামে পরিচিত। তারপর হাঁড়ি-কলসি পোড়ানোর চুল্লী 'পোয়ান' বা 'পোনে' পোড়ানোর পর দেখা যায় 'বনক' রঙ লাগানো অংশটি বেশ টকটকে লাল হয়েছে। অবশ্য অঞ্চলভেদে বিভিন্ন কুম্ভকার-সমাজের রঙের গুণমান পৃথক হতে দেখা যায়। তার কারণ ভালো ধরনের মাটি সংগ্রহ ও প্রস্তুতপ্রণালীর উৎকর্ষের উপর এই রঙের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। এখন এই 'বনক' মৃৎশিল্পীরা কীভাবে সংগ্রহ করেন?

'বনক' কথাটি এসেছে 'বর্ণক' শব্দটি থেকে, যার আভিধানিক অর্থ হলো লেপদ্রব্য। সাধারণত এটি পাওয়া যায় কুম্ভকার-বসতির আশপাশের এলাকায় মাটির নিচে। তাই মৃত্তিকাগর্ভে লুকানো সে রঙ সঠিকভাবে চেনার তো অভিজ্ঞতা থাকা চাই। তবে পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কুম্ভকার-গোষ্ঠী তাঁদের স্ব-স্ব প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে এই রঙ সংগ্রহ করলেও বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে এই মেটে রঙ নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট আড়ঙ্গ গড়ে উঠেছে। এইসব আড়ঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা এলাকা। ডাক চন্দ্রকোণা হ'লেও এ থানার এলাকাধীন টোকাহেদুয়া, বাচকা, ডালিমবাড়ি, কুমরগঞ্জ ও হরিসিংপুর গ্রাম এলাকায় এই 'বনক' রঙ তৈরির শিল্প কেন্দ্রীভূত। উঁচুনিচু লাল কাঁকুরে মাটি ঢাকা এসব গ্রামের জায়গায় জয়গায় যেখানে বর্ষার ঢল নামে, এমন দশ থেকে পনেরো ফুট মাটির গড়ানে গভীর গর্ত ক'রে এই রঙমাটি তুলে আনা হয়। এরপর নিষ্কাশনের পালা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেদিনীপুর জেলার ঐ সব এলাকা ছাড়া গড়বেতার বহড়াশোল এবং তমলুক থানার কাঁসাই নদী তীরবর্তী টুল্যা, অনন্তপুর, বেগুয়ান, রসিকপুর প্রভৃতি বেশ কিছু গ্রামে এইভাবে দেশি প্রথায় 'বনক' তৈরির আড়ঙ্গ গড়ে উঠেছে।

প্রথমে গর্ত থেকে তোলা এই মাটিকে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া হয়, তারপর কোন একটি অগভীর গর্ত বা চৌবাচ্চায় রেখে জল দিয়ে ভিজতে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকদিন পর মাটি ভালোভাবে ভিজে গেলে পরিমাণমতো আরো জল ঢেলে পা দিয়ে মাড়ানো হয়। এবার বালি-কাঁকরযুক্ত কাদা অংশ নিচে থিতিয়ে যাবার পর উপরের তরল অংশ ছোট ছোট মাটির সরায় ভর্তি ক'রে রোদে শুকনো করতে দেওয়া হয়। সরায় জলীয় অংশ শুকিয়ে যাবার পর যে তলানিটুকু পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করা হয় এবং এটাই হলো প্রার্থিত 'বনক' রঙ।

স্থানীয় প্রস্তুতকারীরা এই মেটে রঙটিকে একজায়গায় মজুত ক'রে রাখেন বিক্রয়ের জন্যে। প্রয়োজনে মৃৎশিল্পীরা যেমন সহজেই তা সংগ্রহ করার সুযোগ পান, তেমনি কলকাতা ও বহরমপুর থেকে চালানিদাররাও আসেন। আজকাল ঘর-ছাওয়া মাটির টালির কদর বেড়েছে; সেজন্য টালির রঙে লালবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার প্রয়োজনে 'বনক' রঙে চুবিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। তাই বর্তমানে এ রঙের বেশ চাহিদা হয়েছে বলা চলে। তবে দামের ক্ষেত্রে তেমন ভালো কিছু নয়। আগে ৭০ কেজি বস্তার দাম ছিল তিন থেকে চার টাকা, পরে সে জায়গায় হয়েছে মাত্র ষোলো-সতেরো টাকা। এখন দু'শো থেকে আড়াইশো টাকা। শীত ও গ্রীষ্ম এই রঙ তৈরির সময় বলে বেশ কিছু পরিবারে যখন কাজ থাকে না, সে সময় এই রঙ তৈরির কাজে নিযুক্ত থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

মৃৎশিল্পীরা এই মেটে 'বনক' সংগ্রহ করে প্রয়োজনমতো জলে গুলে রঙ তৈরি ক'রে নেন, তারপর ন্যাকড়ার নুটি বা তুলি নিয়ে মৃৎপাত্রের উপর প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রঙ মিশ্রণের জল। পুকুর-ডোবা বা নলকূপের জলে মেশালে এ রঙ পোড়ানোর পর সেরকম গাঢ় ও উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করে না। সেজন্য কুম্ভকার মৃৎশিল্পীরা 'বনক' রঙ তৈরিতে বৃষ্টির জলই বেশি পছন্দ করেন। তাই বৃষ্টির জল ধরে রাখা একান্তই আবশ্যক বিধায় তাঁরা যাবতীয় মৃৎপাত্রে বর্ষার সময় বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। পাকা ও উজ্জ্বল রঙের জন্য মৃৎশিল্পীদের আবহমানকালের এই কৌশল যে দীর্ঘদিনের শ্রমসাধনার ফল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কাঁচামাটির উপর 'বনক' রঙ প্রয়োগের ফলে পোড়ানোর পর মৃৎপাত্র লালচে রঙ ধারণ করে। অন্যদিকে দেশের কুম্ভকার সমাজ পোড়ানো লালচে রঙের পাত্র ছাড়া কালো রঙের পাত্রও নির্মাণ ক'রে থাকেন। এসব কালো রঙের পাত্র ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ প্রয়োজনে এতদিন ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একদা তেল বা ঘি রাখার পাত্র হিসাবে এই ধরনের কালো রঙের ভাঁড়, যা 'দোনী' নামে পরিচিত, গ্রামীণ জীবনে বহুল প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এখনও আমরা যে-কালো রঙের জলের কুঁজো ব্যবহার ক'রে থাকি, তাও এই জাতীয় মৃৎশিল্পের উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে টিন, কাঁচ ও পোর্সিলিনের আধার আমদানি হওয়ায় এধরনের পাত্রের ব্যবহার ক্রমশই লোপ পেতে চলেছে। বলা বাহুল্য, দেশীয় মৃৎশিল্পীদের এসব পাত্র কালো রঙের হ'লেও তাতে কোনরকম কালো রঙ প্রয়োগ হতো না, কেবলমাত্র পোড়ানোর কৌশলেই ঐ রঙ ধারণ করত। এখানে মৃৎশিল্পী চিরাচরিত প্রথামত কাঁচা অবস্থায় মৃৎপাত্রে 'বনক' তো প্রয়োগ করতেনই, উপরন্তু পোয়ানে

সেগুলি পোড়ানোর সময় ধোঁয়া যাতে কোনক্রমে পোয়ান থেকে বাইরে বেরতে না পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এর ফলে পোনের ভিতর ধোঁয়া থেকে যাওয়ায় পোড়ানোর পর পাত্রগুলির যে-অংশে 'বনক' লাগানো হতো, তা হ'য়ে উঠত চক্চকে কালো এবং নিচের অংশ যাতে বনকের প্রলেপ থাকত না, তা হতো ফিকে কালো।

কালো রঙের কলসি-হাঁড়ির চলন গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ কমতে শুরু করলেও এখনও মেদিনীপুর, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলার কুম্ভকাবগণ এই রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করে থাকেন। এ বিষয়ে ভালো একটি উদাহরণ হলো বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়োর কুম্ভকার শিল্পীদের উজ্জ্বল কালো রঙের হাতিঘোড়া ও মনসার চালি নির্মাণের ধারাবাহিকতা। এখানে মৃৎশিল্পীরা যে-হলদে 'বনক' সংগ্রহ করেন, তাকে এঁরা স্থানীয়ভাবে বলে থাকেন 'গাদমাটি', যা হয়তো 'গঁদ' কথাটি থেকে এসেছে। সুতরাং 'গাদ' বা 'গঁদে'র অর্থ যাই হোক না কেন, এটি যে প্রলেপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য এই গাদমাটি পাওয়া যায় কাছাকাছি জয়পাণ্ডা নদী তীরবর্তী জামবেদিয়া, দেউলভিড়্যা ও জাঁকেরশোল, নতুনগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম থেকে। নদী ও খালের তীরবর্তী স্থান থেকে প্রায় ১/২ মিটার গভীর গর্ত করে এই মাটি সংগ্রহ করা হয়। মৃৎশিল্পীরা গরুর গাড়ি করেই এই মাটি সংগ্রহ করেন এবং প্রতি পরিবারপিছু একগাড়ি করে বছরে এই রঙ লাগে। সংগ্রহের উপযুক্ত সময় অগ্রহায়ণ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস। রঙ প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ববর্ণিত চন্দ্রকোণার আড়ঙ্গের মতোই। মেটে রঙ দিন-সাতেক জলে ভিজিয়ে তারপর পরিমাণমতো জল দিয়ে তা ঘুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থিতিয়ে গেলে বালিকাঁকর মেশানো তলানি বাদ দিয়ে উপরের ঘোলা জলের অংশ ছোট ছোট মাটির পাত্রে ধরে রাখা হয়। দিন-পনেরো পরে এইসব পাত্রে জল শুকিয়ে গেলেই পাওয়া যায় প্রার্থিত রঙ।

পাঁচমুড়োর কুম্ভকাররা মাটি থেকে নিষ্কাশিত এই হলদে রঙের গাদমাটিই শুধু ব্যবহার করেন না, এই রঙের উপরে আরো একটি সামান্য কালচে রঙের প্রলেপ দেন। পরবর্তী এই রঙটিকে এঁরা অবশ্য বলে থাকেন 'বনক' রঙ। এ রঙটিও তারা সংগ্রহ করেন কাছাকাছি নতুনগ্রাম ও আমজোড় গ্রামের খালের ধার থেকে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা এখান থেকে কালচে ধূসর বর্ণের মাটি সংগ্রহ করে আনেন এবং উপরিবর্ণিত 'গাদমাটি' নিষ্কাশনের মতোই রঙ মাটি থেকে পৃথক ক'রে নেন।

পরবর্তী ধাপে পাঁচমুড়োর কুম্ভকার শিল্পীরা শুকনো অবস্থায় হাঁড়ি-কলসি বা হাতিঘোড়ার উপর ন্যাকড়ার ন্যাতা বা প্রয়োজনে তুলি দিয়ে 'গাদমাটি'র রঙ লাগিয়ে দেন এবং শুকিয়ে গেলে তার পরের ধাপে লাগানো হয় একপ্রস্থ ধূসর-কালো বনকের প্রলেপ। এই দু'রকম রঞ্জক ব্যবহারের দরুন পোড়ানোর পর তা বেশ উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে কালো রঙের ক্ষেত্রেও ঐ দু'রকম হলদে গাদমাটি ও কালো 'বনকে'র প্রলেপ দেওয়া হয় এবং পোয়ানে ধোঁয়া বের হতে না দেওয়ার ফলে সেগুলি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ধোঁয়াকে পোয়ান থেকে বেরতে না দিয়ে কালো রঙের মৃৎপাত্র নির্মাণের এই প্রাচীন পদ্ধতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রঙের ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে মাটির উপাদান ও উপযুক্ত রঙের প্রলেপের উপর। সেজন্য দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুর জেলার ভুঁএ্যাহাতার (বেলিয়া) কুম্ভকারগণ প্রথাগত মাটির হাঁড়ি-কলসির সঙ্গে পাঁচমুড়োর মতোই বেশ বড় আকারের হাতিঘোড়াও নির্মাণ করেন এবং তাঁরাও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হলুদ ও কালো রঙের মাটি থেকে লেপদ্রব্য রঞ্জক প্রস্তুত ক'রে ব্যবহার করেন। কিন্তু সম্ভবত এলাকাগত পার্থক্যে মাটির উপাদান ও 'বনক' রঙের তারতম্যের জন্য তাঁদের কাজ পাঁচমুড়োর মতো জেল্লাদার হ'য়ে ওঠে না।

দেশীয় কুম্ভকার-শিল্পীগণ এই পাকা রঙের ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য পুতুল-খেলনা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে-ভিন্ন রঙ ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুতুল-খেলনা নির্মাণ অবশ্য সমাজের এক নারীভিত্তিক উদ্যোগ বলা যেতে পারে। শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় ও মনোরঞ্জক ক'রে তোলার জন্য কুম্ভকার পরিবারের মেয়েরা তাঁদের সৃষ্ট পুতুলে 'বনক' লাগানো ছাড়াও আর যে-রঙটি প্রয়োগ করেন তা হলো তেঁতুল বীজের কষের সঙ্গে অভ্র মেশানো রঙ। তেঁতুলবীজ গুঁড়ো ক'রে সামান্য ফুটিয়ে নিলে তা সামান্য আঠালো হ'য়ে ফিকে লালবর্ণ ধারণ করে এবং এর সঙ্গে অভ্রের গুঁড়ো মিশিয়ে এই রঙ প্রস্তুত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মেয়েরা সাধারণত তাঁদের তৈরি পুতুল-খেলনায় এই রঙ ব্যবহার ক'রে থাকেন। তেঁতুলবীজ থেকে প্রাপ্ত এ রঙ শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের কাঠের কাজের কারুশিল্পীরাও এধরনের আঠা ও রঙ ব্যবহারে পারদর্শী। অতএব দেখা যায়, আবহমানকাল ধরে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রথায় এই রঙ প্রস্তুত ও ব্যবহার-প্রণালী নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হ'য়ে এসেছে, যা আমাদের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়বাহী। কিন্তু রাসায়নিক রঙের আমদানিতে আমাদের গ্রামীণ শিল্পীদের নানাবিধ দেশজ রঙ প্রস্তুতপ্রণালীর বিবরণ আজ বিস্মৃতির পথে এবং এসব নথিবদ্ধ না করলে বঙ্গ-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ এইভাবে যে হেলায় হারিয়ে যাবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

(পট, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬)

পরিশিষ্ট-১৩

দুর্গোৎসব : অগণিত শিল্পী ও কারিগরের জীবিকার উৎস

ভাদ্র পেরিয়ে আশ্বিন পড়লেই গ্রাম-গ্রামান্তর চঞ্চল হয়ে ওঠে— পুজো তাহলে আসছে। একটা খুশির আমেজ যেন ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশ জুড়ে। আসন্ন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের কাজকর্মের তাগিদে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই সুত্রে যে কর্মচাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা দেখা যায় তা বিশেষ করে সীমাবদ্ধ থাকে বাংলার সামাজিক বৃত্তি বা পেশাধারী নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে।

দশভুজা উপাসনার মূল অনুষঙ্গের মধ্যে আছে প্রতিমা নির্মাণ। কাঠামো নির্মাণে প্রয়োজন পড়ে কাঠ আর বাঁশের। তারপর প্রতিমার মেড় তৈরিতে খড় এবং মাটির প্রলেপে লাগে

তুষ। গ্রামের দিকে এ সব মাল-মশলার জোগানদার হয় স্থানীয় কৃষিজীবী সম্প্রদায়। খড়ের উপরে কাদা লেপার জন্য চাই এঁটেল আর বালি মাটি। গ্রামাঞ্চলে মূর্তিশিল্পীরা প্রয়োজনমত মাটি সংগ্রহ করে নেন এধার-ওধার থেকে, কিন্তু শহরের কেন্দ্রীভূত মূর্তি শিল্পালয়গুলিতে মূর্তি নির্মাণের উপযোগী এঁটেল মাটি আমদানি করা হয় গ্রাম থেকে। এই কলকাতার শহরাঞ্চলের জন্য বিশেষ ধরনের এঁটেল মাটি আসে নদীপথে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার অদূরবর্তী ভাগীরথী তীরবর্তী বাগান্ডা ও রাঙামাটি গ্রামে এই বিশেষ উপযোগী মাটি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এই বিশেষ ধরনের মাটি আসে ডায়মন্ডহারবাবের কাছে ভাগীরথী তীরবর্তী এক চর থেকে। মূর্তির এক মেটের পব দোমেটের কাজে লাগে বালি মাটি। এ মাটিও নদী-তীরবর্তী নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে মূর্তিশিল্পীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেশ কিছু লোক নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। একমেটে ও দোমেটের পর পৃথকভাবে মূর্তির হাত ও পায়ের আঙুল ও প্রয়োজনমত মাটির অলংকার সাঁটা হয়। এরপর প্রথম পর্যায়ে মূর্তির গায়ে খড়িমাটির প্রলেপসহ মূর্তির চক্ষুদান ও বিভিন্ন রঙের প্রলেপ লাগাবার পর আসে অঙ্গসজ্জার পালা। যেখানে প্রতিমার কাপড়, অলঙ্কার মায় সাজসজ্জা হয় মাটির ভাস্কর্যে, সেখানে আবশ্যক মত বঙের প্রলেপ পড়ে। কিন্তু যেখানে দেবীমূর্তির অঙ্গসজ্জায় কাপড়ের ব্যবস্থা, সেখানে সেঁটে দেওয়া হয় রঙিন সার্টিনের কাপড়। অনেক ক্ষেত্রে সাটিনের উপর সোনালি জরির কাজ করা কাপড়ও পরানো হয়। আজকাল আবার কোথাও কোথাও সাটিন কাপড়ের উপর পৃথকভাবে শোলার কাজ লাগিয়ে সেটিকে বেশ নয়নাভিরাম করে তোলা হয়।

এবারে লাগানো হয় চুল। আগে চুল তৈরি করা হত শনের তন্তু থেকে। এখন শনের দুষ্প্রাপাতায় এসেছে পাটের চুল। গরম জলে কালো রঙ গুলে তাতে চুবিয়ে নেওয়া পাটের এ চুল তৈরি হয়ে প্যাকেটে করে চালান আসে কেন্দ্রীভূত শিল্পশালাগুলিতে। প্রতিমার এই চুল তৈরির কাজে মুসলমান কারিগরদের অবদান অস্বীকার করা চলে না। এখনও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, বড়গাছিয়া ও পাঁচলা এলাকার মুসলমান কারিগরদের তৈরি করা চুল আমদানি হয়ে আসছে। বলতে গেলে, এ কাজটি তাদের একেবারে একচেটিয়া। এখন আবার শন বা পাটের চুলের বদলে রেওয়াজ হয়েছে চকচকে নাইলনের তন্তু দিয়ে তৈরি চুল।

দুর্গা ও তার পাশপুতুলে মাটির বা সার্টিনের পোশাক ছাড়া পরানো হয়ে থাকে শোলার বা ডাকের সাজ। শোলার সাজের মুকুট ও তার অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি নির্মাণের বিখ্যাত কেন্দ্র হল, বর্ধমানের কাটোয়া, নদিয়ার নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশপুর এবং কলকতার দমদম প্রভৃতি এলাকা। অন্যদিকে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে শোলা শিল্পের নানা কারুকর্ম। বলতে গেলে এ রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শোলা শিল্পীরা তাঁদের পূর্বপুরুষের বৃত্তিগত এই শিল্পকর্মের কাজে জড়িয়ে আছেন। প্রধানত মালাকার গোষ্ঠীর শিল্পীই এই শোলা শিল্পটির ধারক ও বাহক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মালাকার সম্প্রদায় শুধু প্রতিমার অঙ্গসজ্জার কাজেই যুক্ত থাকেন না পুজোর প্রাক্কালে এঁরা তৈরি করেন বিচিত্র সব ছোট-বড় চাঁদমালা কদমফুল প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপকরণ।

বাড়ির মহিলারাও পুরুষদের এই কাজে সহযোগিতা করেন এবং বহু মহিলা শিল্পীও এককভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

প্রতিমার অলংকরণে শোলার সাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে ডাকের সাজ। এই ডাকের সাজের প্রবর্তন নিয়ে 'কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' গ্রন্থের লেখক মহেন্দ্রনাথ দত্ত একদা লিখেছিলেন, ''আমরা যখন শিশু তখন ডাকের গহনা উঠে নাই। মাটির গহনা হইত। সে বেশ সুন্দর ছিল। অল্প দিনের পর ডাকের গহনা উঠিল ও মাটির গহনা কমিয়া গেল।''

ডাকের সাজেও লাগে শোলার পাতলা পাত এবং তার উপরে জরি ও রাংতার চুমকি এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত জরির সুতো লাগিয়ে এই সাজটি সম্পন্ন করা হয়। ডাকের সাজের অলংকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শাড়ি, কলকা, ঝালট, হীরাপাটি, আঁচলা, সিঁথি, ঝিনকোষ, চুড়ি, হার, চাঁদমালা, কানবেণী, হাঁসুলি, গলার চিক, পায়জোড় ও মাথার মুকুট।

ডাকের সাজের কাজও কিন্তু মালাকার সম্প্রদায়ের অবদান। পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও বর্ধমানের কাটোয়ায় বর্তমানে উৎকৃষ্ট ডাকের সাজ তৈরি হয়। এই সূক্ষ্ম কাজে শুধু শিল্পীর দক্ষতাই নয়, তাঁর ধৈর্য পরিশ্রম এবং নিজস্ব মুন্সিয়ানার উপরেই এই কাজটির রূপময়তা নির্ভর করে। দুঃখের কথা, ডাকের সাজের পোষকতা কমে যাওয়ায় এই সব নিপুণ শিল্পীদের জীবনে নেমে আসছে এক অর্থনৈতিক সংকট।

অন্যদিকে ডাকের সাজের খরচ খরচা বেড়ে যাওয়ার দরুন প্রতিমার অঙ্গসজ্জায় এসেছে 'সলমা বুলেন'-এর কাজ। এও এক ধরনের ডাকের সাজ। নানান চিত্র বিচিত্রিত উজ্জ্বল রাংতার কাগজ অধিক পরিমাণে শোলার উপর সেঁটে দুর্গা প্রতিমার অঙ্গাভরণের কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। অনেক বারোয়ারি দুর্গোৎসবের কর্মকর্তাদের এই সাজের ঠাকুরই পছন্দ। কেননা তাঁদের অভিরুচির কাছে সাটিন জরির পাড় আর নাইলনের চুলের সঙ্গে সলমা বুলেন সাজ না হলে দুর্গা প্রতিমার রূপ সৌন্দর্য যেন খোলে না। তবে সলমা বুলেন এ রাজ্যে তৈরি হয় না—এটি আমদানি হয় সুরাট থেকে এবং এ কাজের শিল্পীদের কেন্দ্রীভূত বসবাস হ'লে বর্ধমানের কাটোয়া ও কালনা, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জয়নগর-মজিলপুর এলাকা। কুমোরটুলির মৃৎশিল্প কেন্দ্রের পাশাপাশি সাজসজ্জার বিপণিতেও চাহিদামাফিক এই সাজসজ্জা মিলতে পারে।

দুর্গার দশ প্রহরণের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং বিশেষ করে অসুরের ঢাল তলোয়ার মাটি দিয়ে তৈরির বদলে এখন এসেছে টিনের ও পিতলের উপর নিকেল করা চকচকে অস্ত্র। একসময়ে এ কাজটি করে থাকতেন জাতিগত বৃত্তিধারী কর্মকার সমাজ। এখন অবশ্য কর্মকার ছাড়া অন্যান্য কারিগর দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়ে চলে আসে মৃৎশিল্পীদের প্রয়োজনীয় বিপণিতে।

দুর্গোৎসবে যেমন একদিকে মূর্তি নির্মাণে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের অবদান অন্যদিকে ওই পুজোর প্রয়োজনে এই জাতিগত কুম্ভকাররাই তৈরি করে থাকেন নানাবিধ মৃৎপাত্র ও মৃৎভাণ্ড, অর্থাৎ নানা ধরনের ছোট বড় ঘট, ধুনুচি, প্রদীপ এবং বিভিন্ন আকারের হাঁড়ি-কলসি। আলোচ্য এ সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীর একত্র পরিশ্রমে প্রস্তুত এই দ্রব্যগুলির চাহিদা আজও ম্লান হয়ে

যায়নি। এছাড়া কুমোরটুলিতে কুম্ভকার রমণীরা মঙ্গলঘট, হাঁড়ি ও দেরকোর গায়ে নানান রঙে চিত্রিত নকাশি সজ্জার কাজ আজও করে থাকেন।

আজকাল বিশেষ করে সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে ছাড়াছাড়ি দুর্গামূর্তির প্রচলন হলেও একচালের মূর্তি এখনও ব্যাপকভাবে নির্মিত হয় এবং একালের এই দেবী প্রতিমার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত মূর্তির উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতিভাবে স্থাপন করা হয় বিভিন্ন দেব-দেবীর চিত্র অঙ্কিত চালচিত্র। গ্রামের দিকের শিল্পীরা অনেক সময় মূর্তি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চালচিত্র অংকনের কাজটি সমাধা করে থাকেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিল্পীরা মূর্তির উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতি স্থানটি সময়াভাবে ফাঁকা রেখে দেন। পরে পটুয়া-শিল্পীদের কাগজের উপর আঁকা চালচিত্রের ছবিটা রঙবিহীন ফাঁকা স্থানটিতে সেঁটে দেন।

আঁকিয়ে পটুয়াশিল্পীদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, চালচিত্রেরও কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে এবং সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মার্কিন চাল, বাংলা চাল, মঠগৌরী চাল, টানাচৌরি চাল, গির্জে চাল এবং সর্বসুন্দরী চাল প্রভৃতি।

এই সময়ে কাগজের ফুলের মালার বেশ চাহিদা। কাগজ বা ইদানীংকালে থার্মোকোল ডাইসে কেটে সেগুলি সুতো দিয়ে মালা গাঁথার কাজে অনেক দুঃস্থ মহিলারা অংশগ্রহণ করে থাকেন।

শহরাঞ্চলে প্রতিমা বিসর্জনের অবশ্য কোনও ঝামেলা নেই। লরি-ট্রাক এবং বাদ্যযন্ত্রীদলসহ মিছিল তো হামেশাই দেখে থাকি। গ্রামের দিকে নদী বা দিঘিতে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় দুলে পরিবারের লোকজনের যাঁরা বাঁশের ভারায কাঁধে করে এই মূর্তি বহন করে নিয়ে যেতেন।

পরিশেষে, এই উৎসবটির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধু মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা ও পূজার্চনাতেই এটা কেন্দ্রীভূত নয়, বহু বৃত্তিগত ও পেশাগত মানুষ, কারিগর ও শিল্পীদের কাছে এটি হল আনন্দের উৎসব, উপার্জনের মাধ্যমে বেঁচে বর্তে থাকার সম্ভাবনার উৎসব।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.১০.১৯৯২)

গ্রন্থপঞ্জি

অ্যাকাডেমি অব ফোকলোব : পাঁচমুডাব মৃৎশিল্প ও শিল্পী সমাজ, ১৩৭৯

কব, তপন : অসামান্য মানভূম, ১৯৯৪

কুণ্ডু, অশোককুমাব : 'অবসবেব দেওযাল চিত্র' (প্রবন্ধ), আনন্দবাজাব পত্রিকা (২৪ ১১ ৮৯)

গঙ্গোপাধ্যায, কল্যাণকুমাব : বাংলাব লোকশিল্প, ১৩৬৮

ঘোষ, দেবপ্রসাদ : পূর্বভাবতেব আদিবাসী ধাতুশিল্প (প্রবন্ধ), কৌশিকী, ফাল্গুন ১৩৭৭—'বাংলাব পট' (প্রবন্ধ), অন্যমনে, চিত্র ১৩৭৮

ঘোষ, বিনয : পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি, ১৯৫৭

চক্রবর্তী, বরুণকুমাব : লোকসংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ, ১৯৮০

চক্রবর্তী, সুধীব : চালচিত্রেব চিত্রলেখা, ১৯৯৩

ঠাকুব, অবনীন্দ্রনাথ : বাংলাব ব্রত, ১৯৬০

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গেব লোকসংস্কৃতি , ১৯৯০ পশ্চিম-বঙ্গেব লোকশিল্প, ১৯৭৬

দত্ত, গুরুসদয : বাংলাব মেযেদেব শিকা শিল্প (প্রবন্ধ) প্রবাসী, ১৩৪৬

দাস, অশোককুমাব : 'বাংলাব চিত্রশিল্প ঃ পুঁথি চিত্র, পাটা চিত্র, চালচিত্র, সবা, দশাবতাব তাস' (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গেব লোকশিল্প, ১৯৭৬

দাস, দীপঙ্কব : 'নাবীপুতুল' (প্রবন্ধ), কৌশিকী, এপ্রিল, ১৯৭৮

দাস, দীপকবঞ্জন : 'পুরুলিযাব মাল সম্প্রদায' (প্রবন্ধ), কৌশিকী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩৮০

দাস, পূর্ণচন্দ্র : কাঁথিব লোকাচাব, ১৯৭৮

দাসগুপ্ত, চিত্তবঞ্জন (সম্পাদিত) : আচার্য যোগেশচন্দ্র পুবাকৃতি ভবন পবিচিতি, ১৩৯০

নাথ, পূর্ণেন্দুনাথ : শান্তিপুব ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ১৪০৩

পাল, অনিমেষকান্তি : লোকসংস্কৃতি, ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায, অমিযকুমাব : দেখা হয নাই, ১৩৮০, বঙ্গলক্ষীব ঝাঁপি, ১৩৮৬

বন্দ্যোপাধ্যায, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাংলা, ১৩৩০

বসাক, শীলা : বাংলাব ব্রত পার্বণ, ১৯৯৮

বসু, আশিস : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা, ১৯৬২

বসু, ত্রিপুবা : লোকসংস্কৃতিব নানা দিগন্ত, ১৯৮৯

বসু, সন্তোষকুমার : ভাবতশিল্পে দেহজ শ্রম, ১৯৯০

বিশ্বাস, বিধান : 'লক্ষ্মীসরার রূপবৈচিত্র্যঃ রীতি ও প্রকরণ (প্রবন্ধ) কৌশিকী, ১৯৯৮

বেরা, শ্যামল : কোলাঘাট : লোকশিল্পকথা (প্রবন্ধ), জন-আদালত, ১৬-৩০ এপ্রিল, ২০০০

ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ১৯৮২

ভট্টাচার্য, অশোক : বাংলার চিত্রকলা, ১৯৭৫

ভট্টাচার্য, মালিনী(সম্পাদিত) : সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৯

মজুমদার, রবীন্দ্র : বাংলার লোকশিল্প, ১৩৬৩

মজুমদার, শিশির : উত্তর গ্রামচরিত, ১৩৯০

মজুমদার, শিশির(সম্পাদিত) : লোকশিল্প ও রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৭

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়, ১৯৯৯

মণ্ডল, সত্যানন্দ : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প, ১৯৮৪

মল্লিক, শ্রীহর্ষ : প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা, ১৯৮৫, বাবুইজোড়ের হাতী-ঘোড়া (প্রবন্ধ), কৌশিকী, শারদীয় ১৯৮৬

মান্না, শিবেন্দু(সম্পাদিত) : আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা প্রদর্শিকা, ১৯৮০

মিত্র, অজিতকুমার : হারানো বাঙলা, ১৯৮৫

মুখোপাধ্যায়, আদ্যনাথ : বাংলার লোকশিল্প (প্রবন্ধ) সমকালীন, কার্তিক ১৩৭৮

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ : গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, ১৯৯৯

রাজপণ্ডিত, তাপস : বড়ি ও বিচিত্র স্ত্রী-আচার (প্রবন্ধ), কৌশিকী, পৌষ-চৈত্র ১৩৮৩

রায়, অরুণকুমার : লোকায়ন চর্চার ভূমিকা, ১৯৯৩

রায়, সুধাংশুকুমার : পটশিল্পের ঘরানা (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প, ১৯৭৬

সরকার, নিখিল : বাংলার পুতুল (প্রবন্ধ) আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯.১২.১৯৫৪

সতপথী, ইন্দ্রানী দত্ত : ছৌ, ১৯৯৯

সাঁতরা, তারাপদ : হাওড়া জেলার লোকউৎসব, ১৯৬২, পুতুল : কাঠের ও মাটির খেলনা (প্রবন্ধ), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২, ১৪০৩

—মেদিনীপুরের পট ও পটুয়া সমাজ (প্রবন্ধ), পরিচয়, জানুয়ারি ১৯৭৫

—হাওড়ার পটুয়াপাড়া : প্রশস্থ ও চণ্ডীপুর (প্রবন্ধ), হোম, মার্চ ১৯৮২

সামন্ত, ববীন্দ্রনাথ ঃ শিল্পৰূপময বাঁকুড়া, ১৯৯১
সিংহ, মানিকলাল ঃ পশ্চিমবাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, ১৯৭৭
সেনগুপ্ত, গৌতম ঃ পুরুলিয়াব দীপাবলী পুতুল (প্রবন্ধ) কৌশিকী, পৌষ-চৈত্র ১৩৮৩
সেনগুপ্ত, শঙ্কব ঃ বাংলাব লোকবৃত্ত ঃ আধুনিক ভাবনা, ১৯৮৫
সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ বৃহৎবঙ্গ (১ম ও২য ঘণ্ড), ১৯৩৫
Dutta, Gurusaday : Folk Arts and Crafts of Bengal : The Collected Papers, 1990
Gangulı, Kalyan Kumar . Desıgns ın Tradıtıonal Arts of Bengal, 1963
Ghose, Benoy : Tradıtıonal Art & Crafts of West Bengal–A Socıologıcal Survey, 1981
Goswamı, Nıranjan . Catalogue of Paıntıngs of the Asutosh Museum Ms. of the Ramcarıtamanasa, 1981
Gupta, R. P. (Ed.) : Arts of Bengal and Eastern Indıa, 1982
Kramrısh, ST : 'Kantha', Journal ot Indıan Socıety of Orıental Art, June-Dec 1939
Leyden, Rudolf Von : Ganjıfa–The Playıng Cards of Indıa, 1982
Mc Cutchıon, Davıd & Bhowmık, Suhrıd : Patuas and Patua Art ın Bengal, 1999
Mode, Heinz/Chandra, Subodh : Indıan Folk Art, 1985
Mookerjee, Ajıt : Folk Art of Bengal, 1946
Mukharjı, T. N. : Art Manufacturers of Indıa, 1888
Mukherjee, A. N. : Poramatır Kaaj of Panchmura, 1971
Pal, Mrinal Kanti : Catalogue of Folk Art ın the Asutosh Museum, Part-I, 1962
Ray, Sudhansu Kumar : 'The Artısan Castes of West Bengal and their Craft', The Tribes and Castes of West Bengal, Census 1951, 1953
–The Ritual Art of Bratas of Bengal, 1961
–The folk Art of India, 1967
Sengupta, Sankar (ed.) : The Patas and the Patuas of Bengal, 1973
Skelton, Robert and Francis, Mark : Arts of Bengal–The Heritage of Bangladesh and Eastern India, 1979.

মেদিনীপুরের দেওয়ালি পুতুল

মেদিনীপুরের দেওয়ালি পুতুল
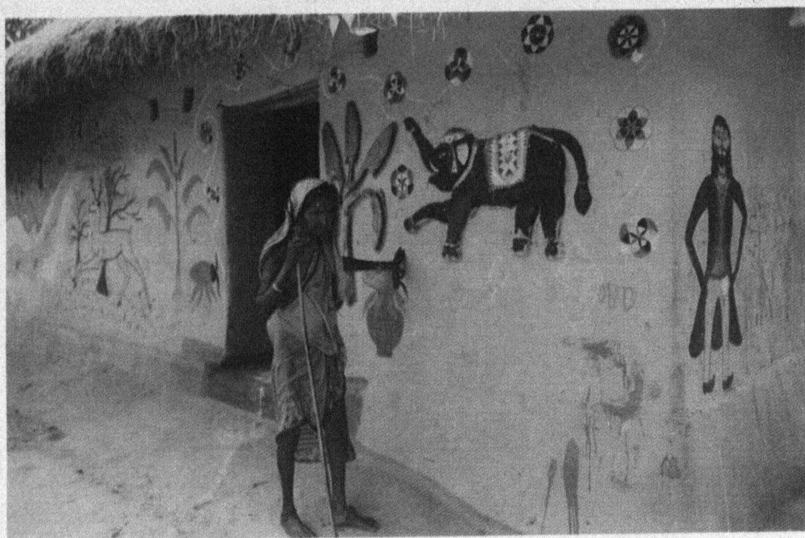
দেওয়াল চিত্র, পুরুলিয়া

চৌকো পট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

কাকদ্বীপ জাহাজ ডুবি পটের অংশ, নয়া, মেদিনীপুর

মনোহর ফাঁসুড়াপটের একাংশ, নয়া, মেদিনীপুর

পুঁথির পাটা, গড়বেতা, মেদিনীপুর (আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সংগ্রহ)

দশাবতার তাস, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

তুলসীদাসী রামায়ণ পুঁথিচিত্র, মহিষাদল, মেদিনীপুর

ময়মনসিংহ জেলার পুতুল

নকশি কাঁথা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ (গুরুসদয় মিউজিয়াম সংগ্রহ)

মজিলপুরের পুতুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
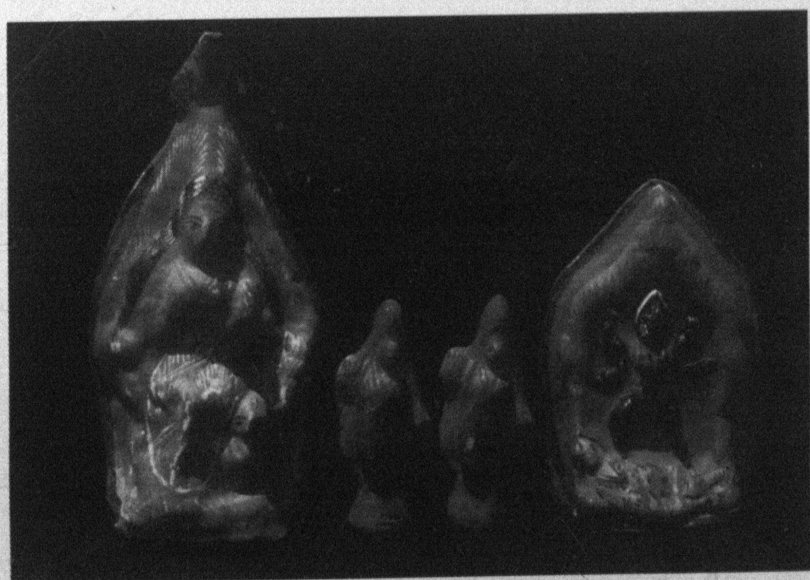
পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি পুতুল, নাড়াজোল, মেদিনীপুর

গালার প্রলেপ লাগানো পুতুল, পাঁচরোল, মেদিনীপুর
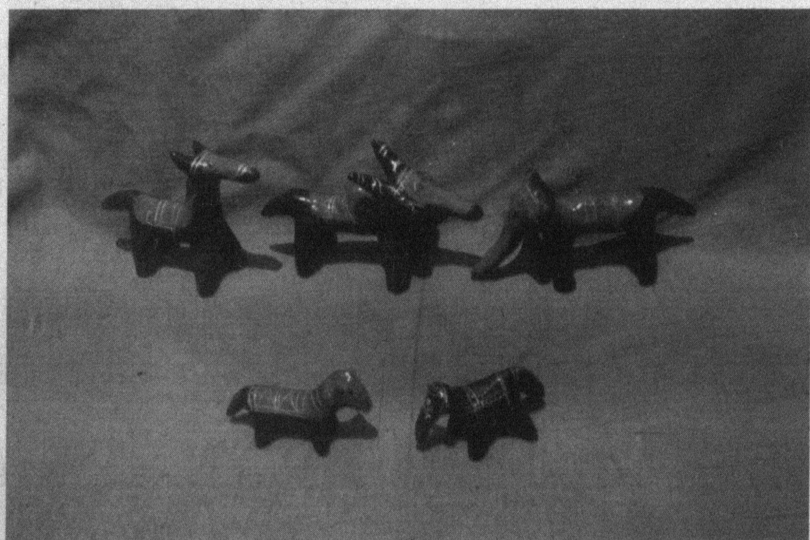
গালার প্রলেপ লাগানো পুতুল, পাঁচরোল, মেদিনীপুর
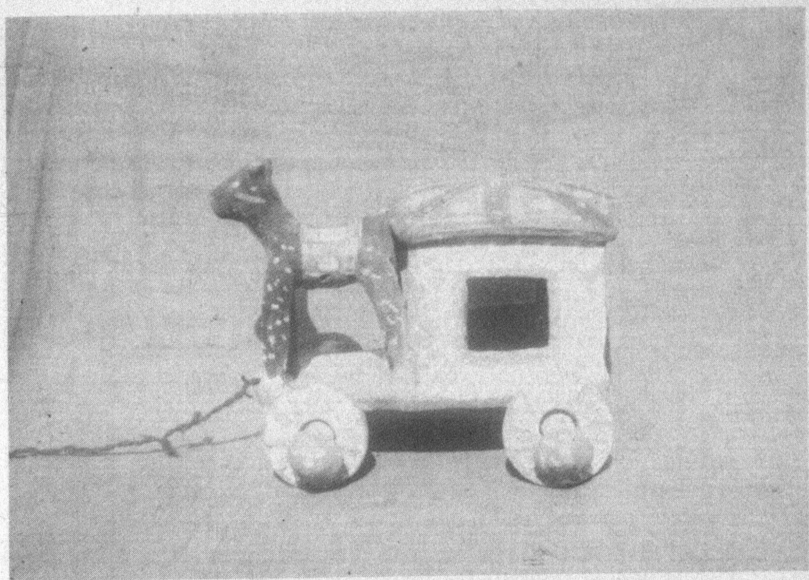
খেলনা ঘোড়ার গাড়ি, মজিলপুর, দঃ ২৪ পরগনা
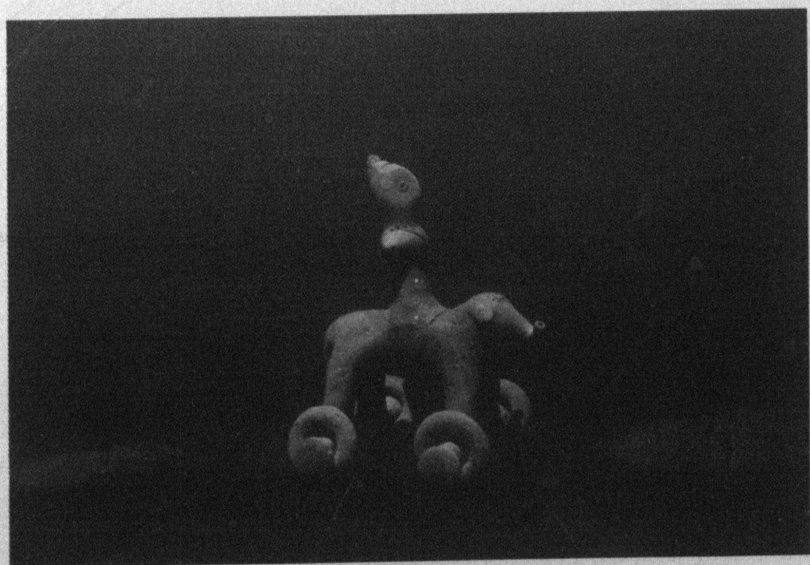
হাতি সওয়ারি খেলনা পুতুল, পাতিহাল, হাওড়া

হাওড়া ও পুরুলিয়ার কাঠের পুতুল

ধরমপুর (বিনপুর) ও বেলেতোড়ের (বাঁকুড়া) কাঠের পুতুল

নতুনগ্রামের কাঠের পেঁচা, বর্ধমান
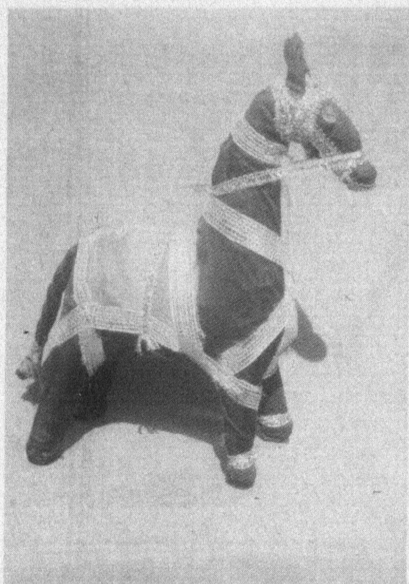
দুলদুল ঘোড়া

(ডানদিকে) ঝাড়গ্রামের ঘোড়া, মেদিনীপুর

নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, বর্ধমান

বনবিবিপুতুল, মজিলপুর, দঃ ২৪ পরগনা

আহ্লাদি পুতুল, রাজনগর, বীরভূম

উত্তর দিনাজপুরের ভদ্রকালীর মুখোশ
(রঘুনাথ গোস্বামী সংগ্রহ)
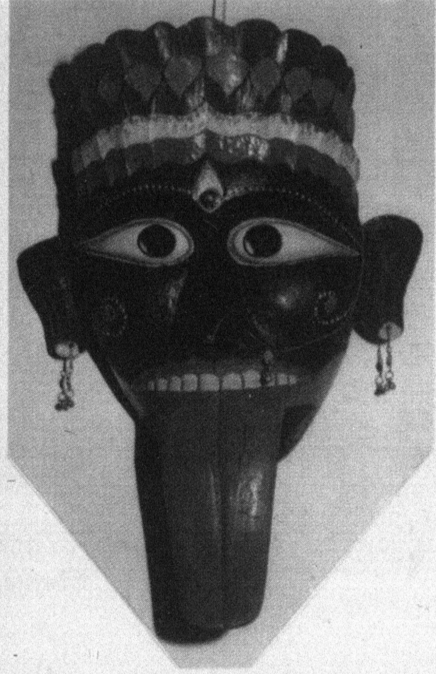
মালদহের মশালকালীর মুখোশ
(রঘুনাথ গোস্বামী সংগ্রহ)

ছৌ নাচের মুখোশ, পুরুলিয়া

তুলসীমঞ্চ, কাউথা, মেদিনীপুর
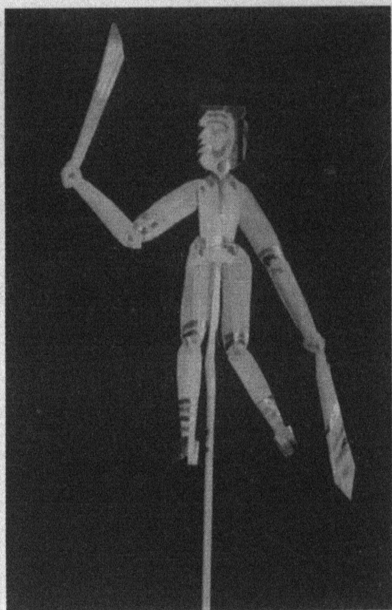
(ডানদিকে) তালপাতার সেপাই
(রঘুনাথ গোস্বামী সংগ্রহ)
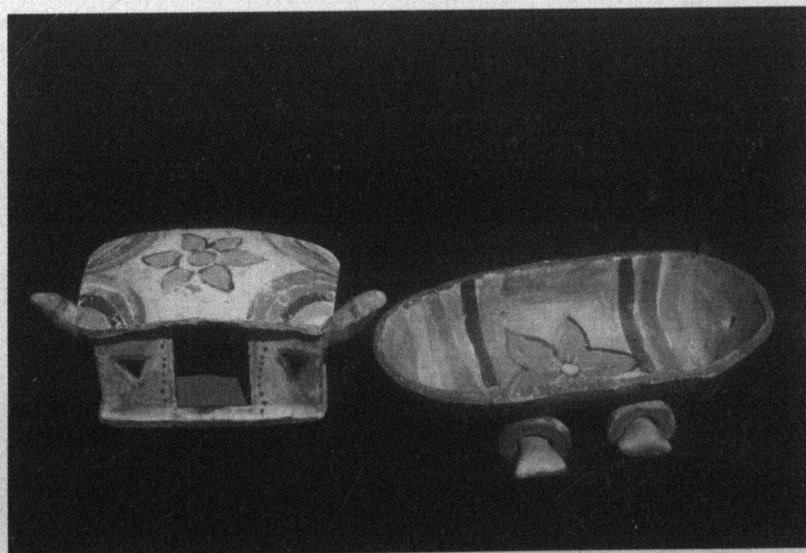
পাতিহালের নৌকো ও পালকি পুতুল, হাওড়া

মজিলপুরের পুতুল, দঃ ২৪ পরগনা

(ডানদিকে) ঢোকরা শিল্পকর্ম (প্রত্নতত্ত্ব অধিকার মিউজিয়াম, পঃ বঃ সরকার)

পোড়ামাটির ঘোড়া পুতুল, মালদহ
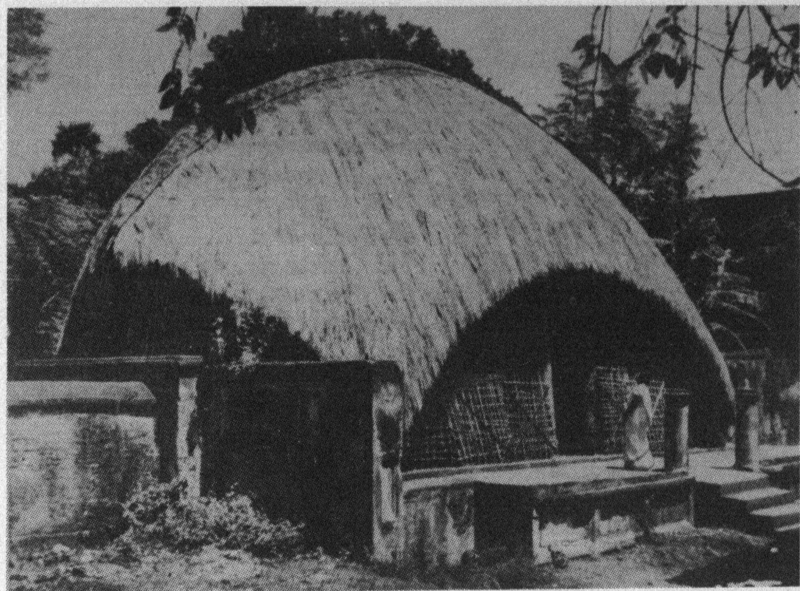
দোচালা চণ্ডীমণ্ডপ, আঁটপুর, হুগলি

চারচালা নাটমণ্ডপ, নৈহাটি, মেদিনীপুর

চারচালা কুটির, ধেড়ুয়া, মেদিনীপুর
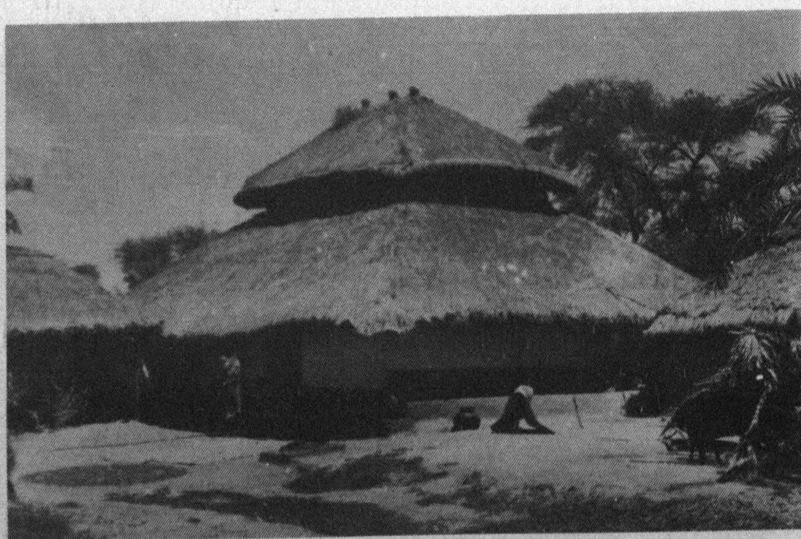
আটচালা কুটির, বয়লাশোল, মেদিনীপুর

আটচালা কুটির, মনোহরপুর, মেদিনীপুর

বারোচালা কুটির, নাড়াজোল, মেদিনীপুর

গোলা ও আটচালা বাড়ি, গড়বেতা, মেদিনীপুর
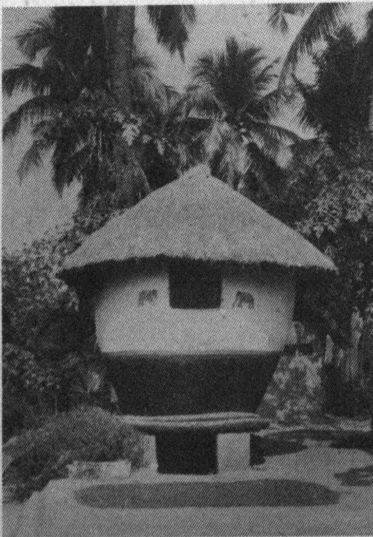
(বাঁদিকে) খড়ে ছাওয়া ধানের গোলা,
মনোহরপুর, মেদিনীপুর

(ডানদিকে) ধানের গোলা,
ব্রাহ্মণগ্রাম, মেদিনীপুর
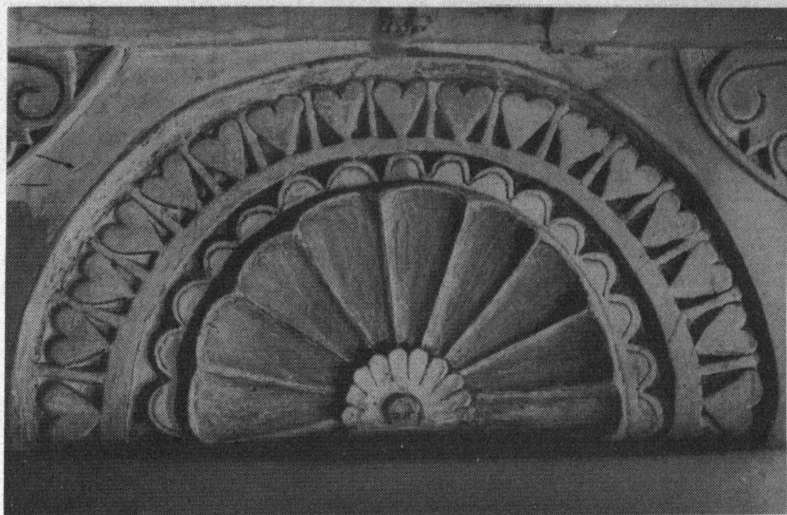
উলুটির অলংকরণ, মানিকোড়, দঃ দিনাজপুর

উলুটির অলংকরণ, মানিকোড়, দঃ দিনাজপুর
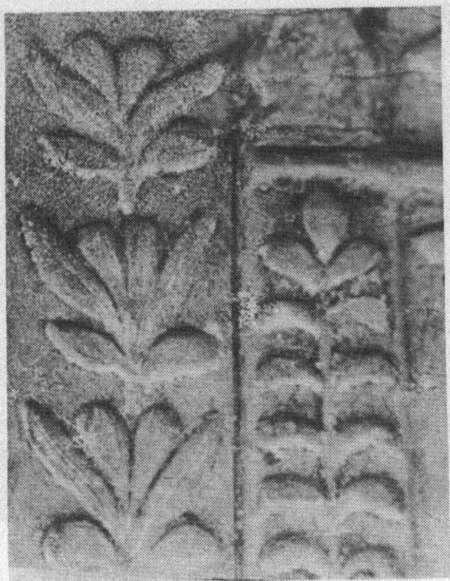
উলুটির অলংকরণ, গড়বেতা, মেদিনীপুর

উলুটির অলংকরণ, মুকুন্দপুর, হাওড়া

সাঁওতাল জন্মকথা পট, নয়া, মেদিনীপুর
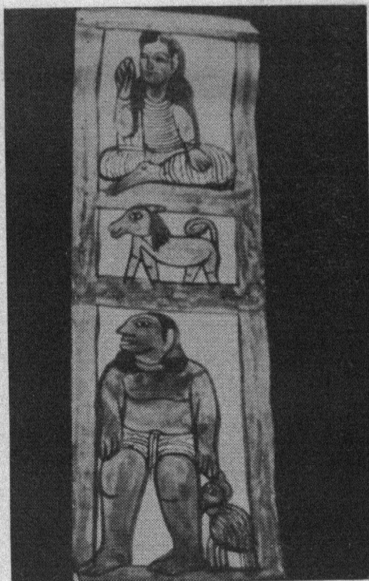
(ডানদিকে) আদিবাসীদের পুনর্জন্মের পট, নয়া, মেদিনীপুর

চক্ষুদান পট (আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ)

(ডানদিকে) গাজিপট, নয়া, মেদিনীপুর

চৈতন্যলীলা পট, বীরভূম

হাটসেরান্দির দুর্গা পট, বীরভূম

চণ্ডী সরা চিত্রণ

দুর্গা মেড়ের ওপর চালচিত্রের অংশ বিশেষ

পলিয়াড়ার রথের গায়ে চিত্রাঙ্কন (অমূল্য প্রত্নশালা সংগ্রহ)

কানুপাটের রথের গায়ে চিত্রাঙ্কন, হাওড়া

নকশি কাঁথা, খুলনা, বাংলাদেশ (আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সংগ্রহ)
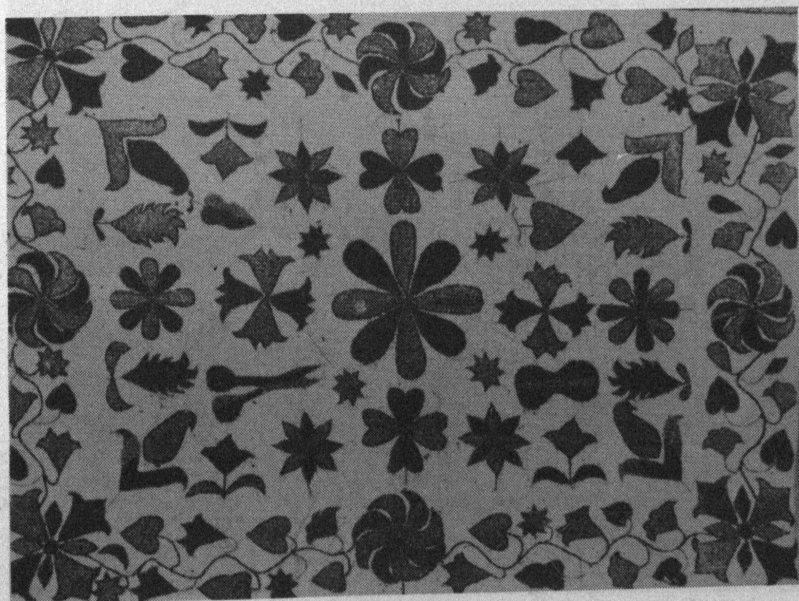
নকশি কাঁথা, বীরভূম
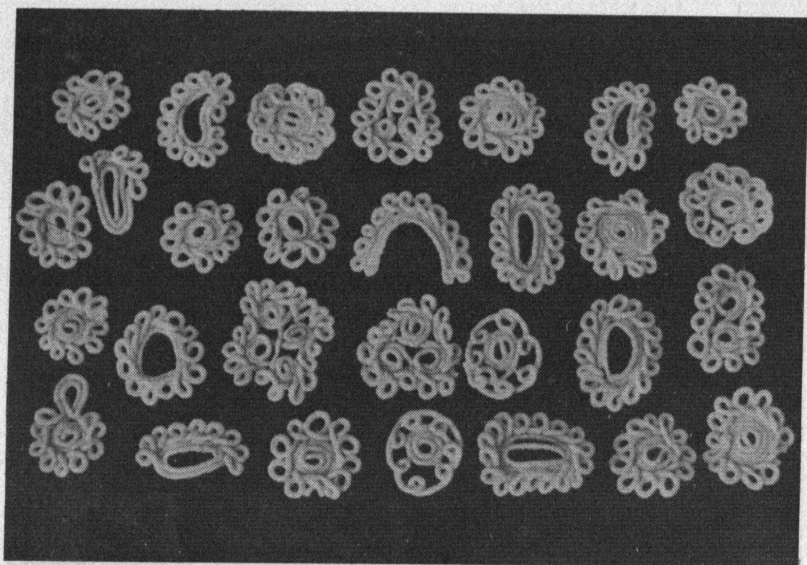
সুতাহাটা এলাকার প্রথাগত গয়না বড়ি
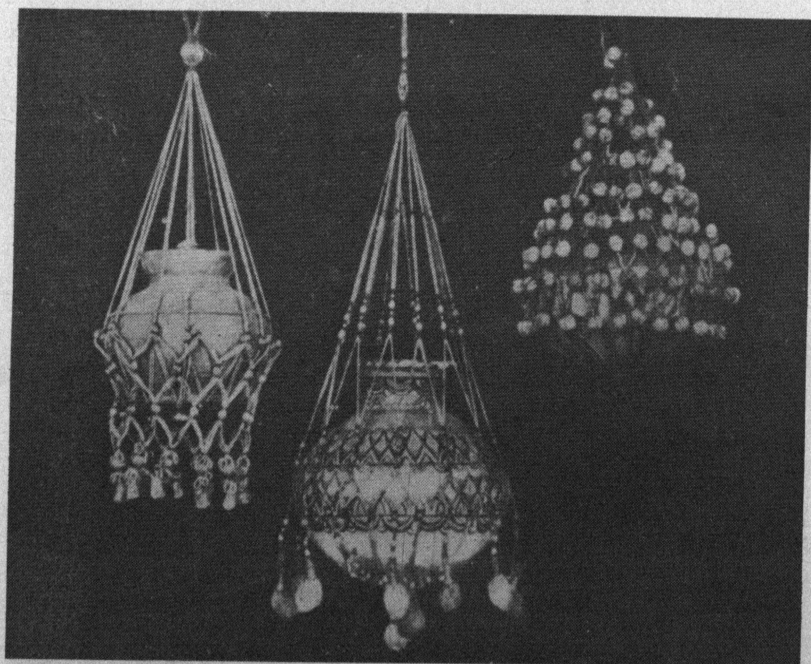
অলংকৃত একহারা শিকে (প্রবাসী পত্রিকা, ১৩৪৬ থেকে গৃহীত)
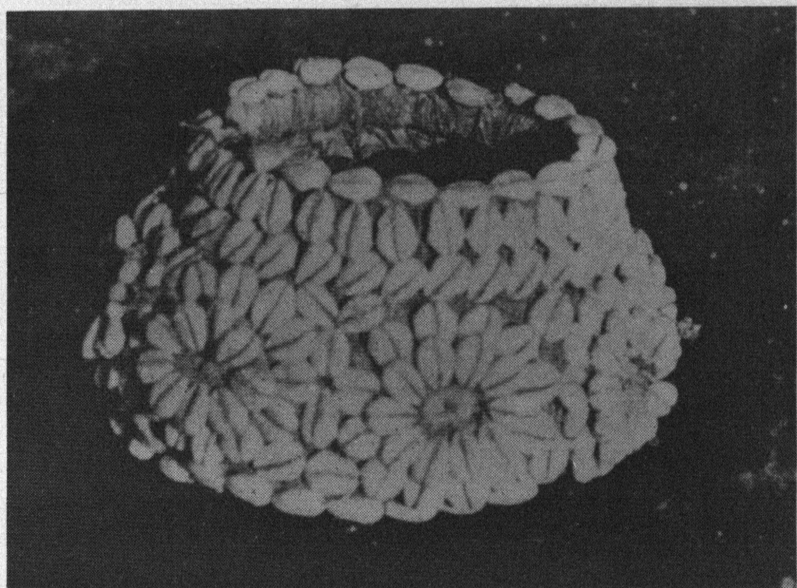
কড়ি বসানো সিঁদুর চুপড়ি
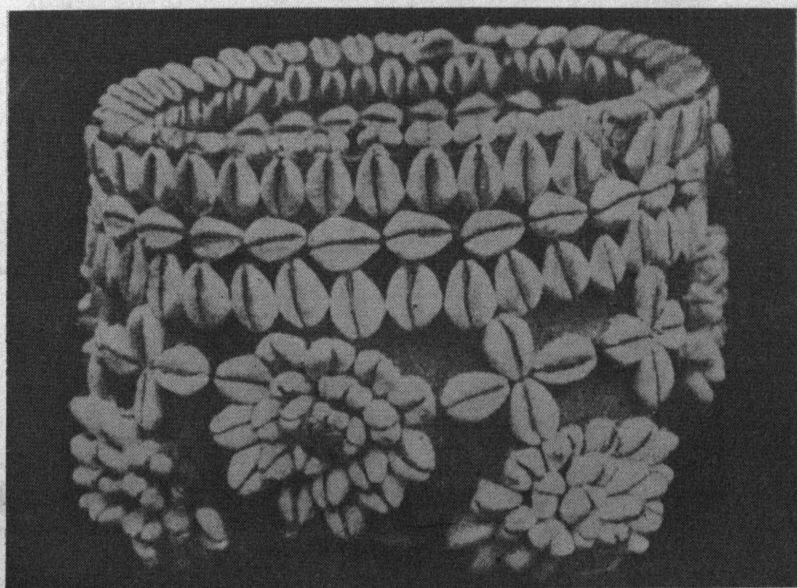
কড়ি বসানো সিঁদুর চুপড়ি (আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ)
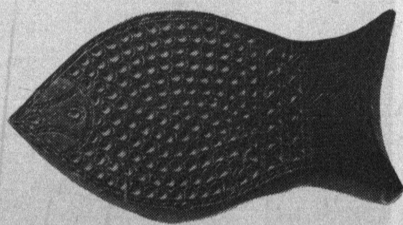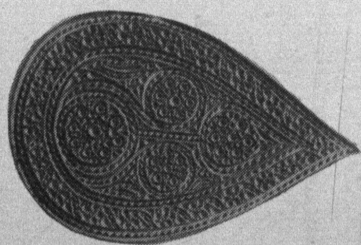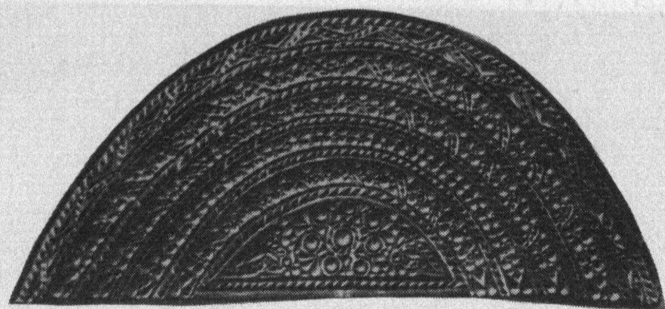
চন্দ্রপুলির নানা ধরনের ছাঁচ

মিষ্টান্নের ছাঁচে মাছের অলংকরণ (গুরুসদয় মিউজিয়াম সংগ্রহ)

মিষ্টান্নের ছাঁচে জোড়া ময়ূরের অলংকরণ (গুরুসদয় মিউজিয়াম সংগ্রহ)

হাতে টেপা পুতুল, নিজবালিয়া, হাওড়া

রায়গঞ্জের পুতুল, উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জের পুতুল, উত্তর দিনাজপুর (ডানদিকে) পাতিহালের হাতে টেপা পুতুল, হাওড়া

(নিচে) রায়গঞ্জের পুতুল, উত্তর দিনাজপুর

মালদহের পুতুল
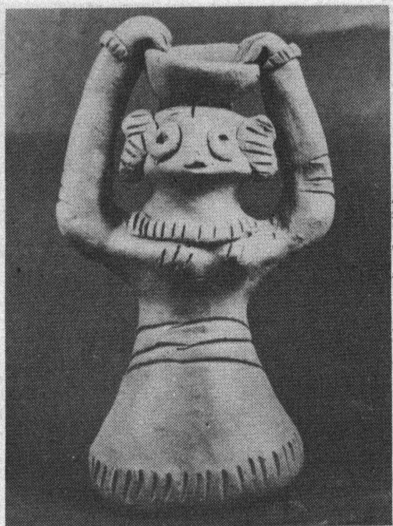
(ডানদিকে) রায়গঞ্জের পুতুল, উত্তর দিনাজপুর

(নিচে) রেল পুতুল, পাঁচমুড়ো, বাঁকুড়া

(ডানদিকে) মেটেল্যার পুতুল, বাঁকুড়া

গোয়ালিনী পুতুল, কাঁদি, মুর্শিদাবাদ
(আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ)

(ডানদিকে) বেনীবন্ধনরত পুতুল,
কাঁঠালিয়া, মুর্শিদাবাদ
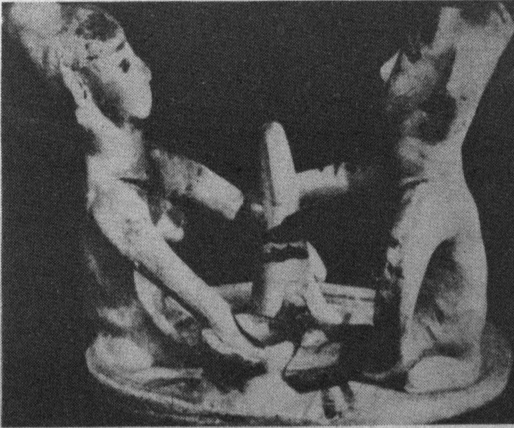
(নিচে) যাঁতায় শস্য পেশাইরত পুতুল,
কাঁঠালিয়া, মুর্শিদাবাদ

(ডানদিকে) মেটেল্যার পুতুল, বাঁকুড়া
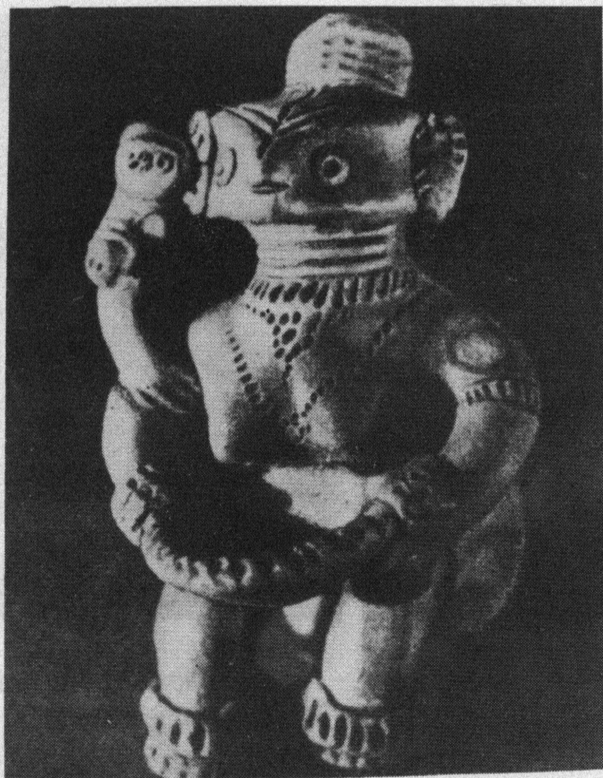
ময়মনসিংহের মা পুতুল, বাংলাদেশ (গুরুসদয় মিউজিয়াম সংগ্রহ)

কুম্ভকার শিল্পীদের ছাঁচে তোলা রানী পুতুল
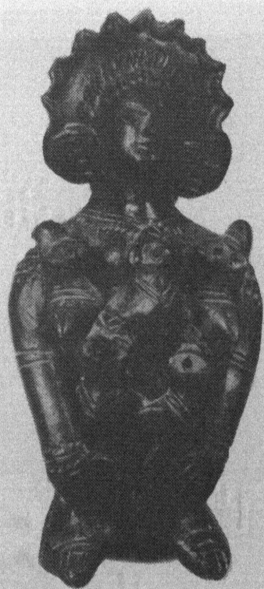
পাঁচমুড়োর শিল্পীদের কৃত ষষ্ঠীপুতুল, বাঁকুড়া

চাকা লাগানো ঘোড়া পুতুল, কাঞ্চনপল্লী, উঃ দিনাজপুর
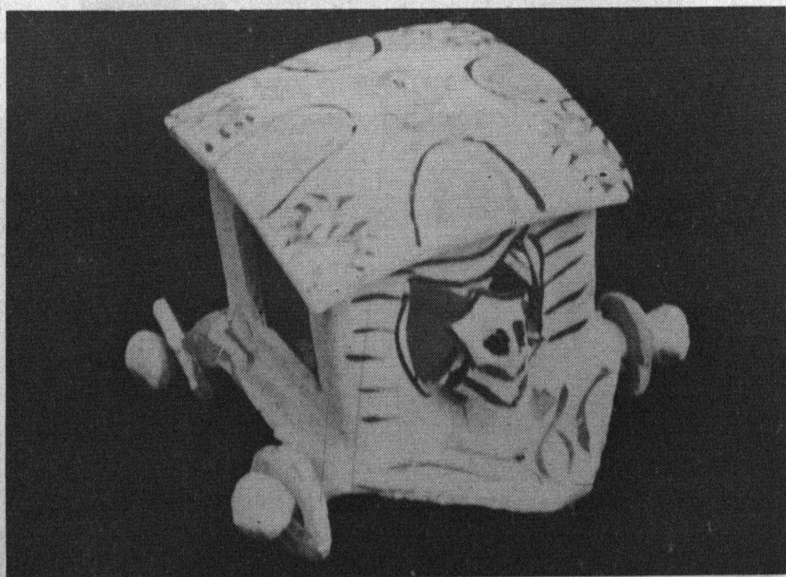
চাকা লাগানো খেলনা গাড়ি, তাঁতিবেড়ে, হাওড়া

পাঁচরোলের গালার পুতুল-শিল্পী পুতুলকে গরম করছেন

গরম করা পুতুলের ওপর গালার প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে
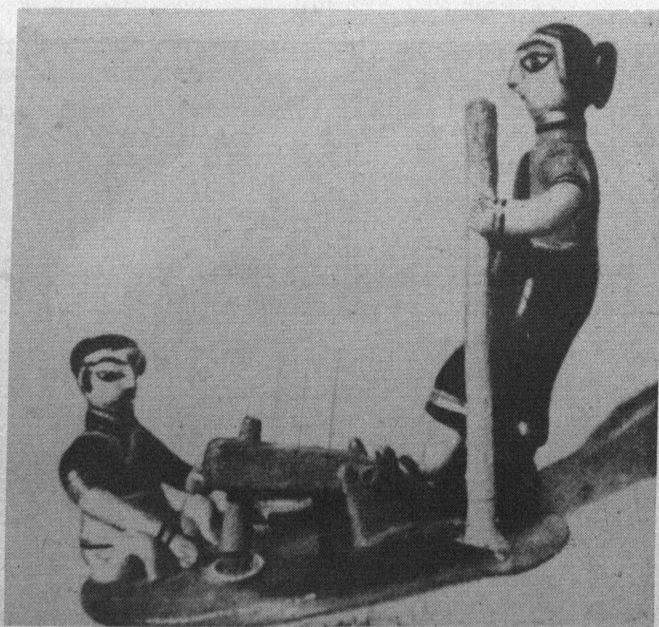
ইলামবাজারের (বীরভূম) গালার পুতুল ঃ ঘোড়সওয়ার ও ঢেঁকিতে ধান ভানা

ইলামবাজারের গালার পুতুল ঃ মা ও ছেলে

বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) মনসার ঝাড় (আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সংগ্রহ)
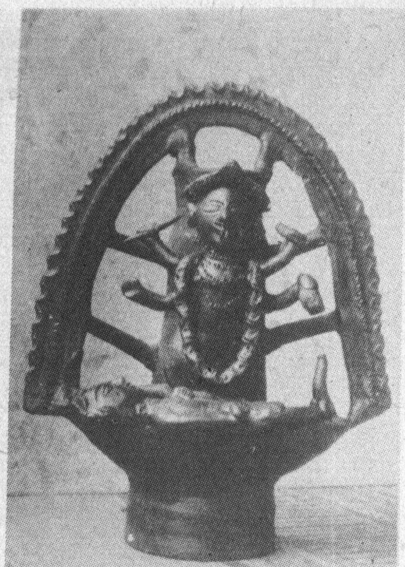
পাঁচমুড়োর নানা আকৃতির মনসার ঝাড়/চালি, বাঁকুড়া
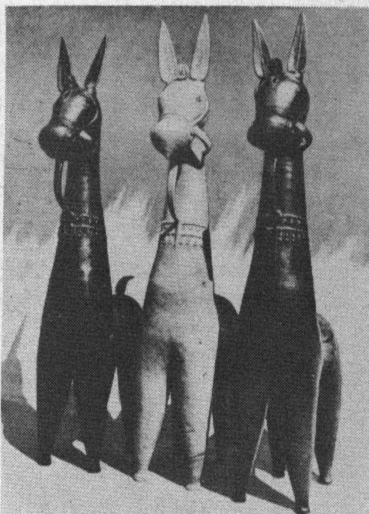
বাঁকুড়ার পাঁচমুড়োর ঘোড়া
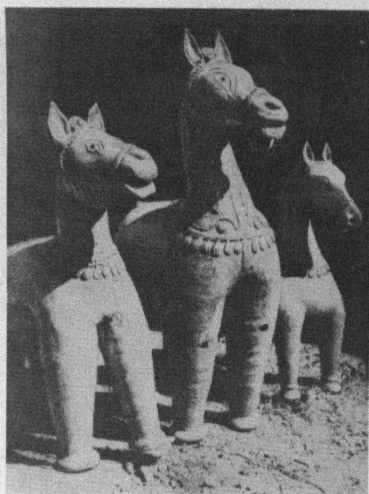
(ডানদিকে) বাঁকুড়ার সোনামুখির ঘোড়া
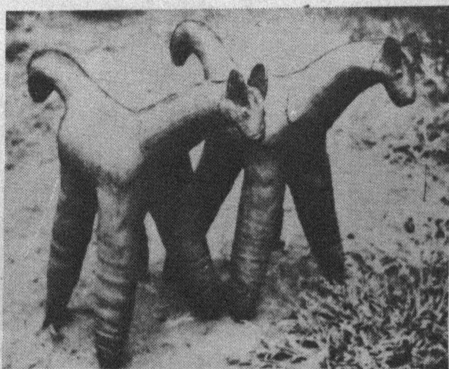
(নিচে) বাঁকুড়ার মুরলুর ঘোড়া
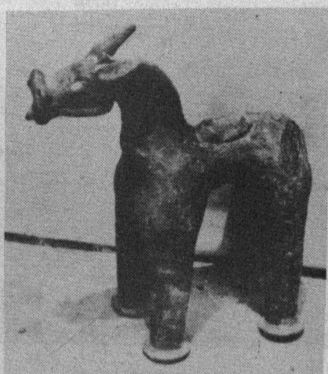
(ডানদিকে) মেদিনীপুরের মির্জাবাজারের ঘোড়া
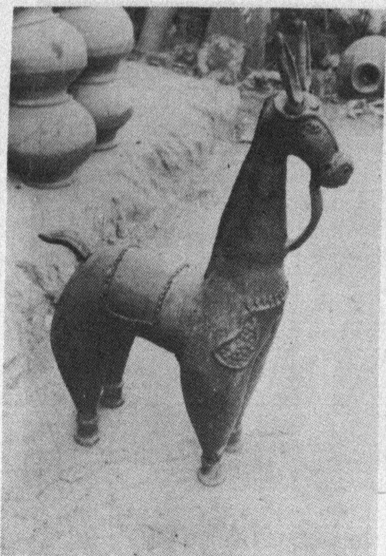
মেদিনীপুরের বেলিয়া গ্রামের ঘোড়া

(ডানদিকে) রায়গঞ্জের ঘোড়সওয়ার পুতুল, উঃ দিনাজপুর

(নিচে) ঝাড়গ্রামের ঘোড়া
(ঝাড়গ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র মিউজিয়াম সংগ্রহ)

পাঁচমুড়োর ঘোড়সওয়ার পুতুল, বাঁকুড়া
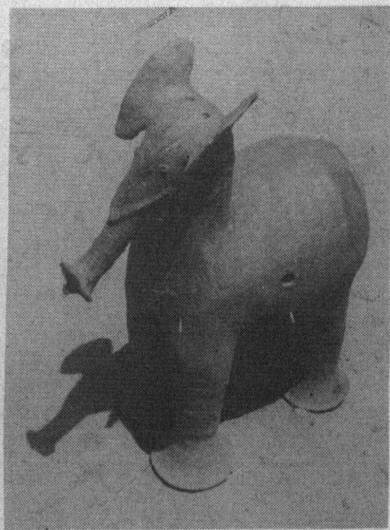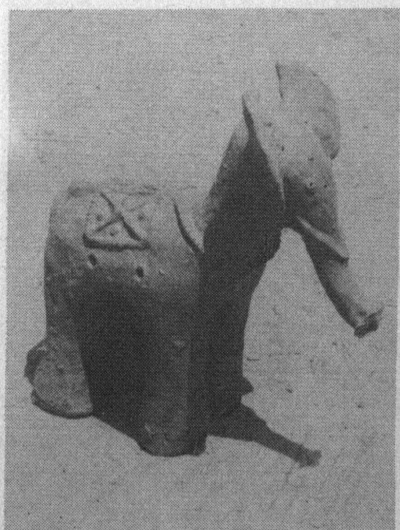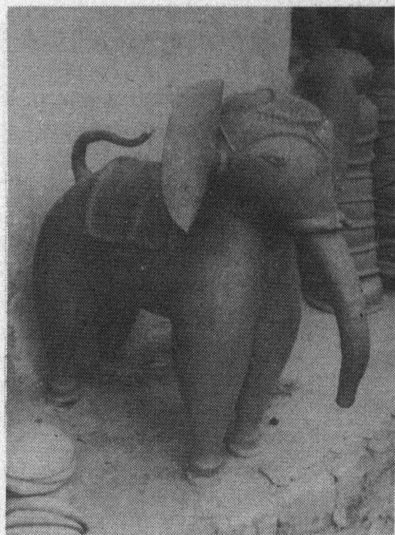
মেদিনীপুরের বেলিয়াগ্রামের নানা আকৃতির হাতি

পাঁচমুড়োর শিল্পীদের কৃত চাকে ঘোড়ার দেহকাণ্ড নির্মাণ

দশাবতার তাসের সূত্রধর কারিগর (বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া) তাস তৈরি রত

তুলসীমঞ্চ, খসরবন, মেদিনীপুর (ডানদিকে) তুলসীমঞ্চ, রঘুনাথবাড়ি, মেদিনীপুর

(নিচে) ধেড়ুয়া কুমোর পাড়ার তৈরি তুলসীমঞ্চ, মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের দেওয়ালি পুতুল

বেলিয়া কুমোর পাড়ার শিল্পী হরিপদ দাস ও তাঁর তৈরি তুলসীমঞ্চ

প্রাচীন এক ভগ্ন পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চে উৎকীর্ণ জৈন মূর্তি (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা সংগ্রহ)

লক্ষ্মী-গণেশ ঘট, তরঙ্গাখালি, মেদিনীপুর
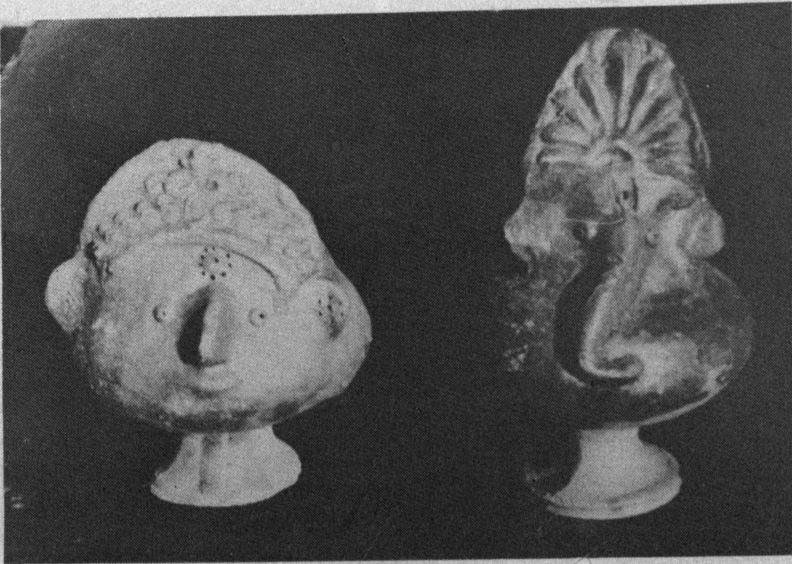
লক্ষ্মী-গণেশ ঘট, মাড়বেড়িয়া, মেদিনীপুর

লক্ষ্মী-গণেশ ঘট, তমলুক, মেদিনীপুর
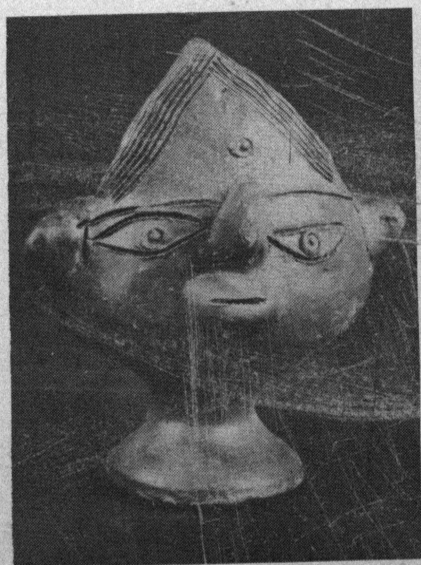
লক্ষ্মী-গণেশ ঘট, তরঙ্গাখালি, মেদিনীপুর

ভেলার ওপর শোলার তৈরি মন্দির,
বলরামপুর, মেদিনীপুর

(ডানদিকে) শোলার মনসা মূর্তি
(আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ)
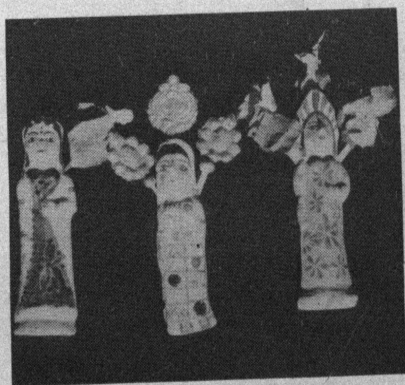
(নিচে) পুরুলিয়ার টুসু পুতুল
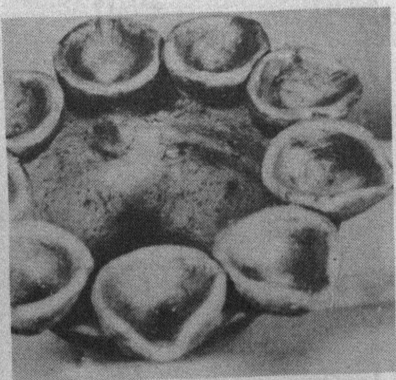
(ডানদিকে) টুসু খোলা, সোনামুখি, বাঁকুড়া
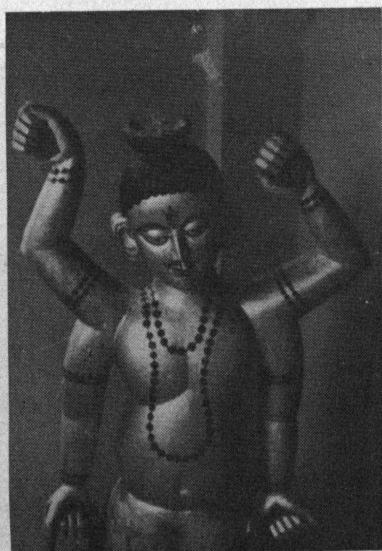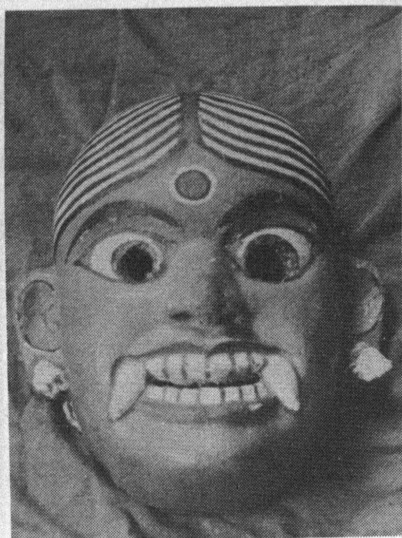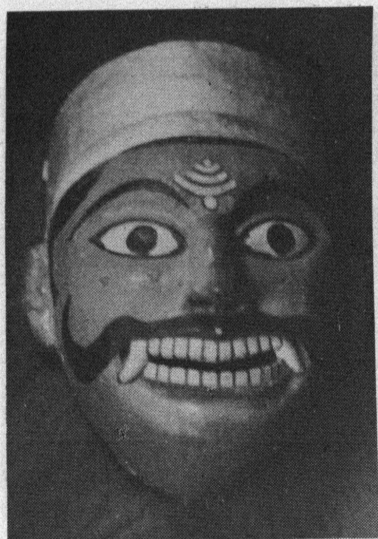
চিলকিগড়ে অনুষ্ঠিত (মেদিনীপুর) ছৌনৃত্যে ব্যবহৃত কাঠের মুখোস (ঝাড়গ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র মিউজিয়াম সংগ্রহ)
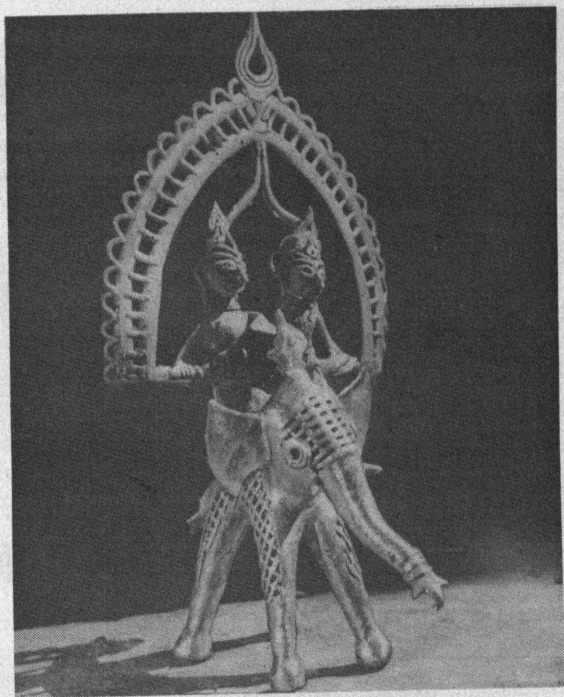
ঢোকরা শিল্পীদের তৈরি পিতলের লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি
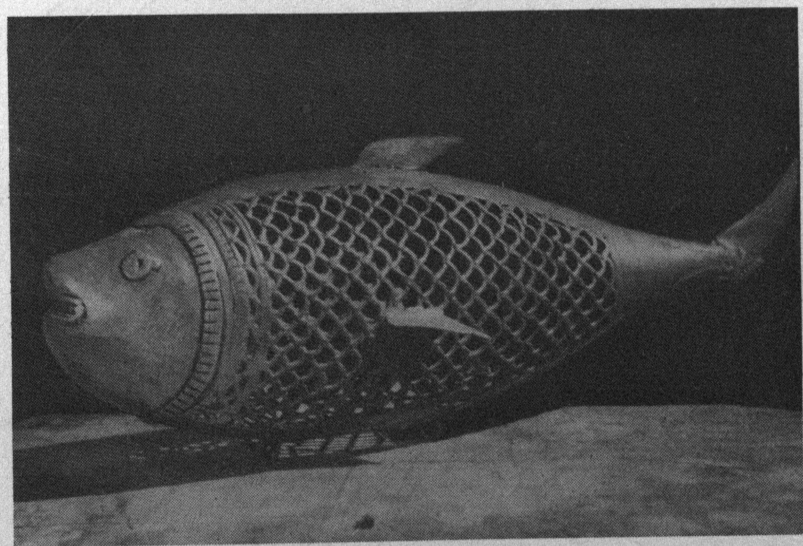
ঢোকরা শিল্পীদের কৃত পিতলের মাছ

ঢোকরা শিল্পী মোমছাঁচ দিয়ে শিল্পদ্রব্য নির্মাণরত, দ্বারিয়াপুর, বর্ধমান
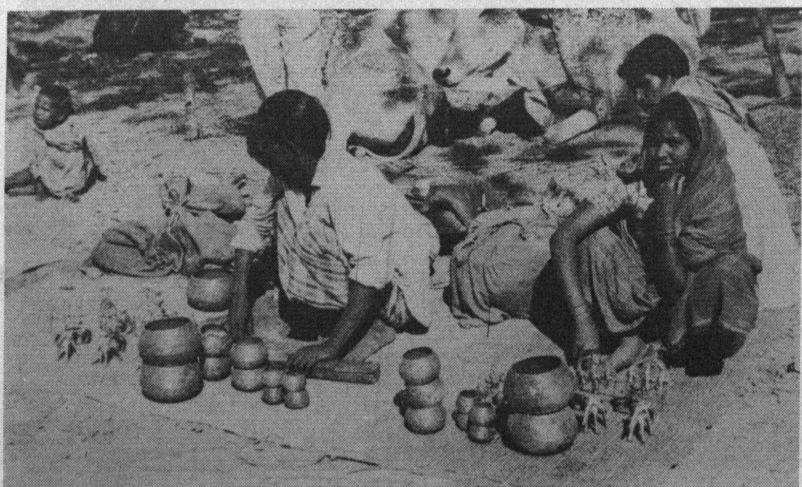
ঢোকরা কারিগররা বগড়ির দোল মেলায় বিক্রির জন্য তাদের শিল্পদ্রব্য এনেছেন।

অনুক্রমণিকা